

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন

সম্পাদনায়

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন



সম্পাদনায় : ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন

সম্পাদনায়

ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

সংকলন

ড. মো. বজলুর রহমান

মো. হাসান হাফিজুর রহমান



বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি.

প্রকাশ সংখ্যা

২,০০০ কপি

প্রকাশনায়

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুদ্রণে

রীতা আর্ট প্রেস

১৩/ক/১/১, কে. এম. দাস লেন

টিকাটুলী, ঢাকা-১২০৩

Citation: Akhond, M.A.Y. (Ed.). 2026. *Safe Vegetable and Fruit Production*. Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur-1701. 176pp.

সূচিপত্র

ভূমিকা	৪
একনজরে বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটির গঠন অনুযায়ী সবজি ও ফলের চাষাবাদ এলাকা	৫
ড. মো. বজলুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর	
নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জমি নির্বাচন, মাটির প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য রক্ষা	৯
ড. মো. বজলুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর	
নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জাত ও বীজের গুরুত্ব	১৪
ড. মো. বজলুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর	
নিরাপদ ফসল উৎপাদনে বালাই ব্যবস্থাপনা	১৭
ড. মো. বজলুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মহাপরিচালকের দপ্তর	
নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনে করণীয়	২১
ড. মো. মশিউর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ	
সবজির চারা উৎপাদন কলাকৌশল	২৫
ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
কুমড়া জাতীয় সবজির নিরাপদ উৎপাদন কলাকৌশল	২৯
ড. বাহাউদ্দিন আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
সোলানেসি পরিবারের সবজির (বেগুন, টমেটো, মিষ্টিমরিচ) নিরাপদ উৎপাদন কৌশল	৩৬
ড. লিমু আক্তার, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
নিরাপদ মরিচ উৎপাদন কলাকৌশল	৫০
ড. মোহাম্মদ নুরে ইউছুফ, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র	
নিরাপদ শিম জাতীয় সবজি উৎপাদন কলাকৌশল	৬৫
ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
নিরাপদ টেঁড়স উৎপাদন কলাকৌশল	৭৪
ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান সেলীম, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
ব্রাসিকেসি বা ক্রুসিফেরি পরিবারের সবজির নিরাপদ উৎপাদন কলাকৌশল	৭৯
ড. মো. এমরাউল ইসলাম, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
নিরাপদ শাক উৎপাদন কৌশল	৮৬
মো. হাসিনুল ইসলাম, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সবজি বিভাগ	
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠাপটে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে প্রধান প্রধান ফল উৎপাদন পদ্ধতি	৯১
ড. মো. মশিউর রহমান, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ফল বিভাগ	
আম	৯১
লিচু	১১৪
কলা	১২০
লেবু	১২৮
মাল্টা	১৩২
আনারস	১৩৮
ড. মো. শরফ উদ্দিন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র	
পেয়ারা	১৪৭
কুল	১৬১
ড্রাগনফল	১৬৬
ফসল পঞ্জিকা	১৭৬



মহাপরিচালক

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট



ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে দানাদার শস্যের পাশাপাশি বছরব্যাপী অধিক পরিমাণে সবজি, ফলসহ অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। সুস্থ শরীর ও সবল মনের জন্য পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। আর এই পুষ্টির বড় একটি অংশ আসে আমাদেরও দেশে উৎপাদিত সবজি ও ফল থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা যা খাচ্ছি তা কি পুরোপুরি নিরাপদ? অধিক জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে এবং অধিক ফলন তথা লাভের আশায় উৎপাদক পর্যায়ে ফসলে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক সার, বিষাক্ত কীটনাশক, উদ্ভিদ বৃদ্ধি ও হরমোন ও বিভিন্ন ধরনের পচনরোধী রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদিত সবজি ও ফলের পুষ্টির আড়ালে থাকা এসব রাসায়নিকের বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ আমাদের অজান্তেই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে ফলে আমাদের স্বাস্থ্য পড়ছে ঝুঁকির মুখে। মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে, ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে, প্রতিনিয়ত ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, এমনকি মরণব্যাপীতে আক্রান্ত হচ্ছে। স্বল্প আয়ের মানুষ চিকিৎসা খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে এবং কেউ কেউ সর্বশান্ত হচ্ছে। জনস্বাস্থ্যের এই ঝুঁকি কমাতে মাঠ পর্যায়ে ফসল সংগ্রহ থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন কেবল পদ্ধতি নয়, এটি একটি সুস্থ সমাজ ও সবল জাতি গঠনের অঙ্গীকার। এই ঝুঁকি থেকে বাঁচতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে উৎপাদন পর্যায় থেকেই আমাদের সচেতন হতে হবে। উৎপাদক পর্যায়ে সহজে পালনীয় সাধারণ কিছু নিয়মাবলী অনুসরণ করে নিজের জমিতে বছরব্যাপী বিষমুক্ত, নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন করা সম্ভব। বিষমুক্ত নিরাপদ খাবার উৎপাদন তথা সুস্থ ও সবল জাতি গঠনের লক্ষ্যেই এই নির্দেশিকাটি সহজ ভাষায় সাজানো হয়েছে। উৎপাদক, ভোক্তা, কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র, কৃষি উদ্যোক্তা তথা কৃষির সাথে জড়িত সকলের জন্য প্রকাশনাটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। পরিশেষে, প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ

একনজরে বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটির গঠন অনুযায়ী সবজি ও ফলের চাষাবাদ এলাকা

ড. মো. বজলুর রহমান

সবজি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং মাটির বৈচিত্র্যের কারণে একেক অঞ্চলে একেক ধরনের সবজি ভালো জন্মে। মূলত মাটির গঠন ও পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাংলাদেশকে কয়েকটি প্রধান কৃষি অঞ্চলে ভাগ করা যায়।

জলবায়ু ও মাটির প্রকৃতি অনুযায়ী সবজি চাষের প্রধান এলাকাগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

১. পলল ও পলিমাটি অঞ্চল (প্লাবন সমভূমি): দেশের অধিকাংশ এলাকা এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার মাটি উর্বর দোআঁশ ও পলিমাটি সমৃদ্ধ।

- ✿ প্রধান এলাকা: বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী এবং মধুমতী-পদ্মা বিধৌত এলাকা।
- ✿ চাষযোগ্য সবজি: আলু, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলা, লালশাক, পালংশাক, বেগুন, বরবটি এবং টমেটো।

২. বেলে-দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ অঞ্চল (হিমালয়ান সমভূমি): পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুর জেলার মাটি বহুলাংশে বেলে-দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ প্রকৃতির ও দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই জেলাগুলোতে পলিমাটি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে প্রচুর পরিমাণে উন্নত মানের সবজি উৎপাদিত হয়।

উত্তরাঞ্চলের জেলা গুলোতে উৎপাদিত প্রধান প্রধান সবজিগুলোর তালিকা:

শীতকালীন সবজি: এই অঞ্চলগুলো মূলত শীতকালীন সবজির জন্য বিখ্যাত।

- ✿ ফুলকপি ও বাঁধাকপি: ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুরের বিভিন্ন গ্রাম (যেমন: ঠাকুরগাঁওয়ের চন্ডিপুর) কপি চাষের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত।
- ✿ আলু: দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রচুর পরিমাণে আলু উৎপাদিত হয়, যা দেশের চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করে।
- ✿ টমেটো ও শসা: আগাম এবং নিয়মিত দুই মৌসুমেই এই সবজিগুলো চাষ করা হয়।
- ✿ বেগুন: বিভিন্ন উন্নত ও স্থানীয় জাতের বেগুন এখানে দুই মৌসুমেই প্রচুর উৎপন্ন হয়।
- ✿ মুলা ও শিম: শীতের শুরুতে এই সবজিগুলো প্রচুর পরিমাণে বাজারে আসে।
- ✿ অন্যান্য: লাউ, গাজর, পালংশাক, লালশাক এবং ধনেপাতা।

গ্রীষ্মকালীন সবজি: গ্রীষ্মকালেও এই জেলাগুলোতে নানা জাতের সবজি চাষ হয়।

- ✿ করলা ও উচ্ছে: এই অঞ্চলের করলা মানের দিক থেকে খুব ভালো হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।
- ✿ পটল ও কাঁকরোল: বিশেষ করে দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়।
- ✿ ঢেড়স ও বরবটি: বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে প্রচুর উৎপাদিত হয়।
- ✿ মিষ্টি কুমড়া ও চাল কুমড়া: এই সবজিগুলো সারা বছরই কম-বেশি চাষ হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

মসলা জাতীয় ফসল

- ✿ মরিচ: বগুড়া, পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে বাণিজ্যিকভাবে মরিচ উৎপাদন হয়।
- ✿ আদা ও হলুদ: পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এর উঁচু জমিতে ও পাহাড়ী অঞ্চলে আদা ও হলুদের ভালো ফলন পাওয়া যায়।
- ✿ পেঁয়াজ ও রসুন: দিনাজপুরের কিছু অঞ্চলে রবি মৌসুমে পেঁয়াজ ও রসুনের চাষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক ও উচ্চমূল্যের সবজি: শীতকাল দীর্ঘ হওয়ায় বর্তমানে এই জেলাগুলোতে কিছু নতুন ও লাভজনক সবজি চাষ শুরু হয়েছে:

✿ **ক্লেয়াশ:** দিনাজপুরের খানসামা ও ঠাকুরগাঁওয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ক্লেয়াশ চাষে ব্যাপক সফলতা দেখা যাচ্ছে।

✿ **মিষ্টিমরিচ ক্যাপসিকাম:** আধুনিক পদ্ধতিতে সীমিত আকারে চাষ শুরু হয়েছে।

৩. বরেন্দ্র ও মধুপুর গড় অঞ্চল (লাল মাটি): এখানকার মাটি কিছুটা শুষ্ক, অম্লীয় এবং লালচে বর্ণের। পানি ধারণ ক্ষমতা কম হলেও আধুনিক সেচ ব্যবহার করে প্রচুর সবজি উৎপাদন হচ্ছে।

✿ **প্রধান এলাকা:** রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর (বরেন্দ্র অঞ্চল) এবং গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী (মধুপুর গড়)।

✿ **চাষযোগ্য সবজি:** করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙে, কাঁকরোল, কুমড়া, এবং শীতকালীন সবজি যেমন শিম ও টমেটো। নরসিংদী এলাকা বেগুন ও লতিরাজ কচুর জন্য বিখ্যাত।

৪. উপকূলীয় ও লবণাক্ত অঞ্চল: দক্ষিণাঞ্চলের এই এলাকায় মাটিতে লবণের ভাগ বেশি থাকে। এখানে ঘেরের পাড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সবজি চাষ হয়।

✿ **প্রধান এলাকা:** খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, পটুয়াখালী ও ভোলা।

✿ **চাষযোগ্য সবজি:** মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ (সবজি হিসেবেও ব্যবহৃত), চিচিঙ্গা এবং লবণসহিষ্ণু কিছু শাকসবজি। এখানে বর্তমানে ঘেরের পাড়ে সারা বছর টমেটো ও করলার চাষ বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

৫. পাহাড়ি অঞ্চল: পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি কাঁকরযুক্ত এবং ঢালু। এখানে মূলত 'জুম' চাষ এবং পাহাড়ের ঢালে বাগান পদ্ধতিতে চাষ হয়।

✿ **প্রধান এলাকা:** রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।

✿ **চাষযোগ্য সবজি:** কাঁকরোল, বরবটি, খাইস্যা, পাহাড়ি বেগুন, আদা, হলুদ, এবং মিষ্টি কুমড়া।

৬. হাওর ও জলাভূমি অঞ্চল: শীতকালে পানি সরে গেলে এ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়। বর্ষাকালে যেসব এলাকা দীর্ঘ সময় পানির নিচে থাকে, সেখানে মাটির পরিবর্তে পানির ওপর 'ধাপ' বা ভাসমান বেডে সবজি চাষ হয়।

✿ **প্রধান এলাকা:** নেত্রকোনা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, পিরোজপুর (নাজিরপুর), বরিশাল (বানারীপাড়া) এবং গোপালগঞ্জ।

✿ **চাষযোগ্য সবজি:** লাউ, বেগুন, মিষ্টিকুমরা, টমেটো, মরিচ, লালশাক, কলমি শাক, ঢেঁড়স, শসা, এবং করলা।

বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষের প্রধান অঞ্চলসমূহ: বাণিজ্যিকভাবে সবজি চাষের প্রধান অঞ্চলসমূহের জেলা ভিত্তিক উৎপাদিত সবজির তালিকা:

- ✿ যশোর ও ঝিনাইদহ: বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, পটল (সবজির রাজধানী বলা হয়)।
- ✿ নরসিংদী: বেগুন, শিম, করলা, কাঁকরোল, লতিরাজ কচু।
- ✿ রংপুর ও বগুড়া: আলু, মরিচ, টমেটো, মুলা ও শীতকালীন হরেক রকম সবজি।
- ✿ দিনাজপুর: টমেটো, আলু, শিম।
- ✿ পঞ্চগড়: আলু, মরিচ, মুলা, বরবটি।
- ✿ ঠাকুরগাঁও: আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বরবটি।
- ✿ কুমিল্লা: মুলা, শিম, টমেটো, বাঁধাকপি, বরবটি।
- ✿ সিলেট: শিম, লেবু, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, নাগা মরিচ।
- ✿ চট্টগ্রাম: শিম, বেগুন, মুলা।

ফল

বাংলাদেশের জলবায়ু এবং মাটির গঠনের কারণে এখানে বিভিন্ন ধরনের ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হয়। নিচে বাংলাদেশের মাটির গঠন ও জলবায়ু অনুযায়ী ফল চাষাবাদের প্রধান এলাকা এবং উৎপাদিত ফলের তালিকা দেওয়া হলো:

১. উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল (বরেন্দ্র ও পলিমাটি এলাকা): এই অঞ্চলের উঁচু জমি এবং গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক আবহাওয়া লিচু ও আম চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

- ✿ জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, দিনাজপুর ও পাবনা।
- ✿ প্রধান ফল:
 - আম: ল্যাংড়া, গোপালভোগ, ফজলি, খিরসাপাত (হিমসাগর), আম্রপালি (বারি আম-৩)।
 - লিচু: বোম্বাই, বেদানা, চায়না-৩ (দিনাজপুরের লিচু দেশসেরা)।
 - অন্যান্য: বড়ই (কুল), পেয়ারা, তরমুজ।

২. মধুপুর ও ভাওয়াল গড় অঞ্চল (লাল মাটি): এখানকার উঁচু লাল মাটি এবং আর্দ্র জলবায়ু আনারস ও কাঁঠাল চাষের জন্য বিখ্যাত।

- ✿ জেলাসমূহ: গাজীপুর, টাঙ্গাইল (মধুপুর), নরসিংদী ও ময়মনসিংহ।
- ✿ প্রধান ফল:
 - কাঁঠাল: এটি বাংলাদেশের জাতীয় ফল এবং এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
 - আনারস: জলভূবি জাতের আনারস।
 - অন্যান্য: লটকন (নরসিংদীর লটকন বিখ্যাত), পেয়ারা, কলা।

৩. পাহাড়ি অঞ্চল (পার্বত্য জেলাসমূহ): পার্বত্য অঞ্চলের ঢালু জমি এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফল এবং বিভিন্ন গ্রীষ্মমন্ডলীয় ফলের জন্য উপযুক্ত।

- ✿ জেলাসমূহ: রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান।
- ✿ প্রধান ফল:
 - আনারস: জায়ান্ট কিউ বা ক্যালেন্ডার জাতের আনারস।
 - লেবুজাতীয়: কমলা, মাল্টা, বাতাবি লেবু।
 - অন্যান্য: কলা, পেঁপে, কাজু বাদাম, কফি ও ড্রাগন ফল।

৪. দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (উপকূলীয় ও পলিমাটি এলাকা): এখানকার উর্বর ও মাঝারি উঁচু পলিমাটি এলাকাকে 'সবজি ও ফলের ভান্ডার' বলা হয়।

- ✿ জেলাসমূহ: যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা ও বরিশাল।
- ✿ প্রধান ফল:
 - পেয়ারা: বরিশালের ভাসমান পেয়ারা বাজার বিশ্ববিখ্যাত।
 - কলা: সাগর কলা ও সবরি কলা।
 - অন্যান্য: আমড়া ও কামরাঙা।

৫. উপকূলীয় ও দ্বীপ অঞ্চল (লবণাক্ত এলাকা): এখানকার লবণাক্ত মাটিতে নারিকেল ও সুপারি সবচেয়ে ভালো হয়।

- ✿ জেলাসমূহ: ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী।
- ✿ প্রধান ফল:
 - নারিকেল ও সুপারি: এই অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফল।
 - অন্যান্য: আমড়া, জাম, তাল ও খেজুর।

একনজরে উল্লেখযোগ্য ফলের উৎপাদন প্রধান এলাকা

আম: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, সাতক্ষীরা। লিচু: দিনাজপুর, পাবনা (ঈশ্বরদী), নাটোর। কাঁঠাল: গাজীপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল। আনারস: টাঙ্গাইল (মধুপুর), সিলেট, রাঙ্গামাটি। পেয়ারা: বরিশাল (ঝালকাঠি), পিরোজপুর, চুয়াডাঙ্গা। কমলা ও মাল্টা: সিলেট, মৌলভীবাজার, পার্বত্য চট্টগ্রাম, পিরোজপুর। লটকন: নরসিংদী। নারিকেল: বাগেরহাট, ভোলা, লক্ষ্মীপুর।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে অ্যাপ এর ব্যবহার

বাংলাদেশে কৃষকদের ডিজিটাল সেবা দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে বেশ কিছু অ্যাপ রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে 'খামারি' (Khamari) অ্যাপটি মূলত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একটি স্মার্ট কৃষি সেবা।

যে কেউ অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্লে-স্টোরে গিয়ে “Khamari” অথবা “Smart Krishi Khamari” লিখে সার্চ করলে অ্যাপটি পেয়ে যাবেন।

- ✿ সরাসরি প্লে-স্টোর ঠিকানা: Smart Krishi - Khamari App (দ্রষ্টব্য: অনেক সময় উন্নয়ন কাজের জন্য নাম কিছুটা পরিবর্তিত হতে পারে)।
- ✿ ওয়েব ঠিকানা: khamari.gov.bd

এই অ্যাপে যা যা পাওয়া যাবে:

- ✿ জমির মাটির মান: নির্দিষ্ট এলাকার মাটির ধরন এবং পুষ্টিগুণ সম্পর্কে তথ্য।
- ✿ ফসল নির্বাচন: মাটির অবস্থা বুঝে কোন ফসল বা সবজি চাষ করা যাবে তার পরামর্শ।
- ✿ সার সুপারিশ: কতটুকু জমিতে কতটুকু সার দিতে হবে তার স্বয়ংক্রিয় হিসাব।
- ✿ আবহাওয়ার পূর্বাভাস: কৃষি কাজের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়ার তথ্য হত্যাাদি।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কৃষি অ্যাপ:

- ✿ কৃষি বাতায়ন: কৃষি বিষয়ক সব তথ্যের ভান্ডার।
- ✿ পশু পালন (Livestock): প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভিন্ন সেবা।
- ✿ বালাইনাশক নির্দেশিকা: ফসলের রোগ ও পোকা দমনের জন্য।
- ✿ সরাসরি এসআরডিআই (SRDI) ওয়েবসাইট: frs.srdi.gov.bd এর মাধ্যমে সারের মাত্রা জানা যায়। এখানে আপনার উপজেলা ও ফসলের নাম দিলে মাটির পুষ্টিমান অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ সারের ডোজ কার্ড তৈরি হয়ে যাবে।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জমি নির্বাচন, মাটির প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য রক্ষা

ড. মো. বজলুর রহমান

নিরাপদ ফল ও সবজি উৎপাদনের প্রথম শর্ত হলো জমি নির্বাচন, মাটির প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য রক্ষা। একটি আদর্শ উঁচু-সুনিষ্কাশিত, রৌদ্রোজ্জ্বল, বিশুদ্ধ সেচ পানির উৎসসহ, ড্রেনেজ সুবিধা সম্বলিত, দূষণমুক্ত, রাসায়নিকবর্জ্য মুক্ত, অধিক জৈবপদার্থযুক্ত দোআঁশ বা পলি-দোআঁশ প্রকৃতির জমি নির্বাচন করতে হবে। অধিক অম্লীয় বা ক্ষারীয়, মহাসড়কের পাশে যেখানে ধূলিকণা ও ধোঁয়ায় থাকা সিসা ফসলের গায়ে লাগবে এবং শিল্প ও কল-কারখানার বর্জ্য মেশে এমন জমি পরিহার করতে হবে।

মাটির অম্লতা: মাটির অম্লতা বা এসিডিটি বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের খাদ্য উপাদান গ্রহণে সমস্যা হয় এবং ফলন কমে যায়। নিচে এসিডিক মাটি চেনার উপায় এবং এটি সংশোধনের জন্য লাইমিং (চুন প্রয়োগ) পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

এসিডিক বা অম্লীয় মাটি চেনার উপায়: মাটির অম্লত্ব সরাসরি পরীক্ষা ছাড়া পুরোপুরি বোঝা কঠিন, তবে কিছু লক্ষণ দেখে ধারণা করা যায়:

- ✿ pH স্কেলের মান: মাটির pH মান যদি ৭ এর নিচে হয়, তবে তা এসিডিক মাটি। pH ৪.৫ - ৫.৫ হলে তা অত্যন্ত অম্লীয়।
- ✿ লিটমাস পেপার পরীক্ষা: এক গ্লাস পানিতে অল্প মাটি গুলে তাতে নীল লিটমাস পেপার ডুবালে যদি তা লাল হয়ে যায়, তবে মাটি অম্লীয়।
- ✿ গাছের লক্ষণ: অম্লীয় মাটিতে গাছের শিকড় ঠিকমতো বাড়ে না, পাতা হলদে হয়ে যায় এবং ফসলের ফলন আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায়। বিশেষ করে শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে গুটি (Nodule) তৈরি হয় না।
- ✿ শ্যাওলার আধিক্য: অনেক সময় এসিডিক মাটিতে শ্যাওলা বা ফার্ন জাতীয় আগাছা বেশি জন্মে।

লাইমিং এবং এর উপকারিতা: লাইমিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অম্লীয় মাটিতে চুন (ক্যালসিয়াম কার্বোনেট) মিশিয়ে এর অম্লতা কমানো হয়। এর উপকারিতা গুলো:

- ✿ মাটির pH বাড়িয়ে ফসল উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করে।
- ✿ ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের প্রাপ্যতা বাড়ায়।
- ✿ মাটির উপকারী অণুজীবের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ✿ অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের বিষক্রিয়া থেকে গাছকে রক্ষা করে।

লাইমিং বা চুন প্রয়োগ পদ্ধতি: চুন প্রয়োগের সবচেয়ে ভালো সময় হলো ফসল চাষের ১-২ মাস আগে। সাধারণত জমিতে জো (জোয়াল) থাকা অবস্থায় বা শেষ চাষের সময় চুন প্রয়োগ করা হয়।

চুনের পরিমাণ: এটি মাটির pH এবং গঠনের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত:

- ✿ মাঝারি অম্লীয় মাটিতে: প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি চুন।
- ✿ অধিক অম্লীয় (উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকা) মাটিতে: প্রতি শতাংশে ৩-৪ কেজি চুন (ডলোমাইট চুন হলে ভালো)।

চুন প্রয়োগের ধাপসমূহ:

- ✿ চুন নির্বাচন: পাথুরে চুন (Quick Lime), গুঁড়ো চুন বা ডলোমাইট চুন ব্যবহার করা যেতে পারে। ডলোমাইট চুন মাটির ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিও পূরণ করে।
- ✿ ছিটিয়ে দেওয়া: চুন পুরো জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে দিন। বাতাস থাকলে সতর্ক থাকতে হবে যাতে চুন উড়ে না যায়।

- ✿ মাটির সাথে মেশানো: চুন ছিটানোর পর লাঙল বা কোদাল দিয়ে মাটির ১০-১৫ সেমি গভীর পর্যন্ত ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ✿ দেওয়ার সময়: চুন প্রয়োগের অন্তত ১৫-২০ দিন পর সার প্রয়োগ বা বীজ বপন করতে হবে। চুন ও ইউরিয়া সার একসাথে দিলে সারের কার্যকারিতা নষ্ট হয়।

গাছের খাদ্যোপাদান: উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য মূলত তিনটি উৎস মাটি, পানি ও বাতাস থেকে খাদ্যোপাদান গ্রহণ করে থাকে। উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান গুলোকে মূলত ২ ভাগে ভাগ করা হয়:

১. **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট:** কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার এগুলো বেশী পরিমাণে লাগে।
২. **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট:** লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন, কপার, জিঙ্ক, মলিবডেনাম, ক্লোরিন, নিকেল এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে লাগে কিন্তু আবশ্যিক।

মাটির উর্বরতা কমে গেলে উপযোগ হিসেবে রাসায়নিক সার ও জৈব সার মাটিতে প্রয়োগ করে উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান গুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব কম্পোস্টকে বলা হয় "মাটির প্রাণ"। রাসায়নিক সারের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে মাটি যখন তার উর্বরতা হারায়, তখন জৈব কম্পোস্টই মাটিকে পুনরায় জীবিত করে তুলতে পারে।

জৈব সার উৎপাদন

জৈব সার হল একধরনের কার্বন (C) সমৃদ্ধ সার যা প্রাকৃতিক ভাবে উৎপন্ন হয়। এই সার এমন এক প্রকার উপাদান যা মাটি ও উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ ও বৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য প্রয়োগ করা হয়। জৈব সারে রয়েছে খনিজ উৎস, সকল প্রাণীর বর্জ্য, তরল কম্পোস্ট, গুয়ানো, উদ্ভিদ নির্ভর সার যেমন: কম্পোস্ট, বায়োসলিড। এছাড়াও অন্যান্য অজৈব ও অরাসায়নিক উপাদান রয়েছে যা জৈব কৃষির মূলনীতি মেনে চলে, যা বাণিজ্যিক জৈব কৃষিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। জৈব সার হচ্ছে যেসব সার কোন জীবের দেহ থেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ উদ্ভিদ বা প্রাণির ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায়। যেমন: গোবর সার, সবুজ সার, খৈল ইত্যাদি। গাছের প্রায় সব খাদ্য উপাদানই জৈব সারে থাকে।

- ✿ প্রথমে জেনে নিতে হবে কোন ধরনের ফসলের জন্য কোন ধরনের জৈব সার ভালো
- ✿ মনে রাখতে হবে, জৈব সারের ভুল ব্যবহার দূষণের অন্যতম মূল কারণ
- ✿ জৈব সার অবশ্যই ভালোভাবে পচনের পর ব্যবহার করতে হবে কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করা যাবে না
- ✿ যে কোন জৈব সার ব্যবহারের কমপক্ষে ১৫-২০ দিন পর জমিতে চারা রোপন করতে হবে
- ✿ খোলা রৌদ্রোজ্জ্বল স্থানে জৈবসার স্তুপ করে রাখা যাবে না এতে সারের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে। স্তুপ করে তার উপরে ছাউনী দিলে জৈবসারের গুণাগুণ ভালো থাকে
- ✿ গোবরের পাশাপাশি, কেঁচো সার, মুরগির বিষ্ঠা, খৈল এবং ট্রাইকো-কম্পোস্ট জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম
- ✿ মুরগির বিষ্ঠা, খৈল এবং ট্রাইকো কম্পোস্ট ব্যবহারের মাধ্যমে মাটিবাহিত রোগ দমন করা সম্ভব।
- ✿ জৈব সার প্রয়োগের বিভিন্ন তথ্য রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে
- ✿ জৈব সার অবশ্যই ফসলি জমি থেকে দূরে আলাদা জায়গায় তৈরী করতে হবে
- ✿ বন্যার পানি উঠে এমন জায়গা এবং পানির উৎস থেকে দূরে জৈব সার প্রস্তুত করতে হবে।

জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

জৈবসার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মূল ধারণা হলো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশবান্ধব উপায়ে কৃষিকাজ করা। জৈবসারের মধ্যে রয়েছে গোবর সার, কম্পোস্ট সার, এবং সবুজ সারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব সার তৈরি ও ব্যবহার করা।

জৈব সারের প্রকারভেদ

গোবর সার: গবাদি পশুর মল-মূত্র পচিয়ে এই সার তৈরি করা হয়। এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে এবং ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে।

কম্পোস্ট সার: বিভিন্ন জৈব বর্জ্য যেমন- গাছের পাতা, রান্নাঘরের উচ্ছিষ্ট, খড় ইত্যাদি পচিয়ে এই সার তৈরি করা হয়।

সবুজ সার: কিছু বিশেষ ধরণের ফসল (যেমন- শিম জাতীয় উদ্ভিদ) জমিতে চাষ করে, তা Green Manure হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই ফসলগুলি মাটিতে মেশানো হলে, তা মাটির উর্বরতা বাড়ায়।

কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট): কেঁচো ব্যবহার করে জৈব সার তৈরি করা হয়, যা উদ্ভিদের জন্য খুবই উপকারী।

অন্যান্য: হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, ছাই, খৈল এবং অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকেও সার তৈরি করা যায়।

জৈব সার ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু টিপস

উপযুক্ত কাঁচামাল নির্বাচন: গোবর, কম্পোস্টের জন্য পাতা, খড় ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ: পচন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিশ্চিত করতে হবে।

নিয়মিত মিশ্রণ: পচনের সময় সার ভালোভাবে মিশ্রিত করতে হবে যাতে দ্রুত পচন ঘটে।

পর্যাপ্ত সময় দেয়া: জৈব সার পচতে সাধারণত কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস সময় লাগে। তাই পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

ফসল অনুযায়ী সার ব্যবহার করা: বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন ধরণের সারের প্রয়োজন হতে পারে। তাই ফসলের ধরণ অনুযায়ী জৈব সার উৎপাদন করতে হবে।

জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপায়ে কৃষিকাজ করা সম্ভব। এটি শুধু মাটির স্বাস্থ্যই ভালো রাখে না, বরং টেকসই কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেও সাহায্য করে।

মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব কম্পোস্টের গুরুত্ব ও ব্যবহার

- ✿ **মাটির গঠন উন্নত করা:** জৈব কম্পোস্ট বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বাড়ায় এবং শক্ত এঁটেল মাটিকে বুরবুরে করে বায়ু চলাচলের সুবিধা করে দেয়।
- ✿ **পুষ্টির ভান্ডার:** এতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় প্রধান উপাদান (N, P, K) ছাড়াও গৌণ পুষ্টি উপাদান (সালফার, জিংক, বোরন ইত্যাদি) বিদ্যমান থাকে।
- ✿ **উপকারী অণুজীবের বৃদ্ধি:** মাটিতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়া এবং কেঁচোর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যা মাটিকে প্রাকৃতিকভাবে উর্বর রাখে।
- ✿ **pH নিয়ন্ত্রণ:** এটি মাটির অতিরিক্ত অম্লতা বা ক্ষারত্ব প্রশমন করতে সাহায্য করে (বাফারিং ক্ষমতা)।

- ✿ **পরিবেশ সুরক্ষা:** রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরতা কমায় এবং মাটির আর্দ্রতা ধরে রেখে সেচের খরচ বাঁচায়। পরিবেশ দূষণ কমায় এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

জৈব কম্পোস্ট তৈরির প্রক্রিয়া (সহজ পদ্ধতি): বাড়িতে বা খামারে খুব সহজে 'গর্ত পদ্ধতি' বা 'স্তূপ পদ্ধতিতে' কম্পোস্ট তৈরি করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ:

- ✿ **সবুজ অংশ (নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ):** ঘাস, লতাপাতা, সবজির খোসা, পচা ফল, কুচুরিপানা।
- ✿ **বাদামী অংশ (কার্বন সমৃদ্ধ):** খড়কুটো, শুকনা পাতা, করাতকলের গুঁড়ো বা কাগজের টুকরো।
- ✿ **পশু বর্জ্য:** গোবর বা মুরগির বিষ্ঠা (এটি পচন ত্বরান্বিত করে)।

ধাপসমূহ:

১. **জায়গা নির্বাচন:** ছায়াযুক্ত এবং উঁচু স্থান বেছে নিতে হবে যেখানে বৃষ্টির পানি জমবে না।
২. **স্তর তৈরি করা:** নিচে প্রথমে শুকনা লতাপাতা বা খড়ের একটি স্তর দিতে হবে।
 - ✿ তার ওপর গোবর বা হাঁস-মুরগির বিষ্ঠার একটি স্তর দিতে হবে।
 - ✿ এর ওপর রান্নাঘরের সবজির উচ্ছিষ্ট বা সবুজ ঘাসের স্তর দিতে হবে।
৩. **আর্দ্রতা রক্ষা:** প্রতিটি স্তরে হালকা পানি ছিটিয়ে মিশ্রণটি ভেজা রাখতে হবে, কিন্তু খুব বেশি পানি দিয়ে কাদা করা যাবে না।
৪. **ঢেকে রাখা:** স্তপটি পলিথিন বা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এতে ভেতরের তাপ বাড়বে এবং উপকরণ গুরোর পচন দ্রুত হবে।
৫. **উল্টে দেওয়া:** প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর মিশ্রণটি কোদাল দিয়ে ওপর-নিচ করে দিতে হবে। এতে বাতাস চলাচল করবে।

কম্পোস্ট সম্পূর্ণ তৈরী হতে সাধারণত ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। কম্পোস্টের রং কালচে বা গাঢ় বাদামী হলে এবং বনের মাটির মতো গন্ধ বের হলে বুঝতে হবে কম্পোস্ট ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে।

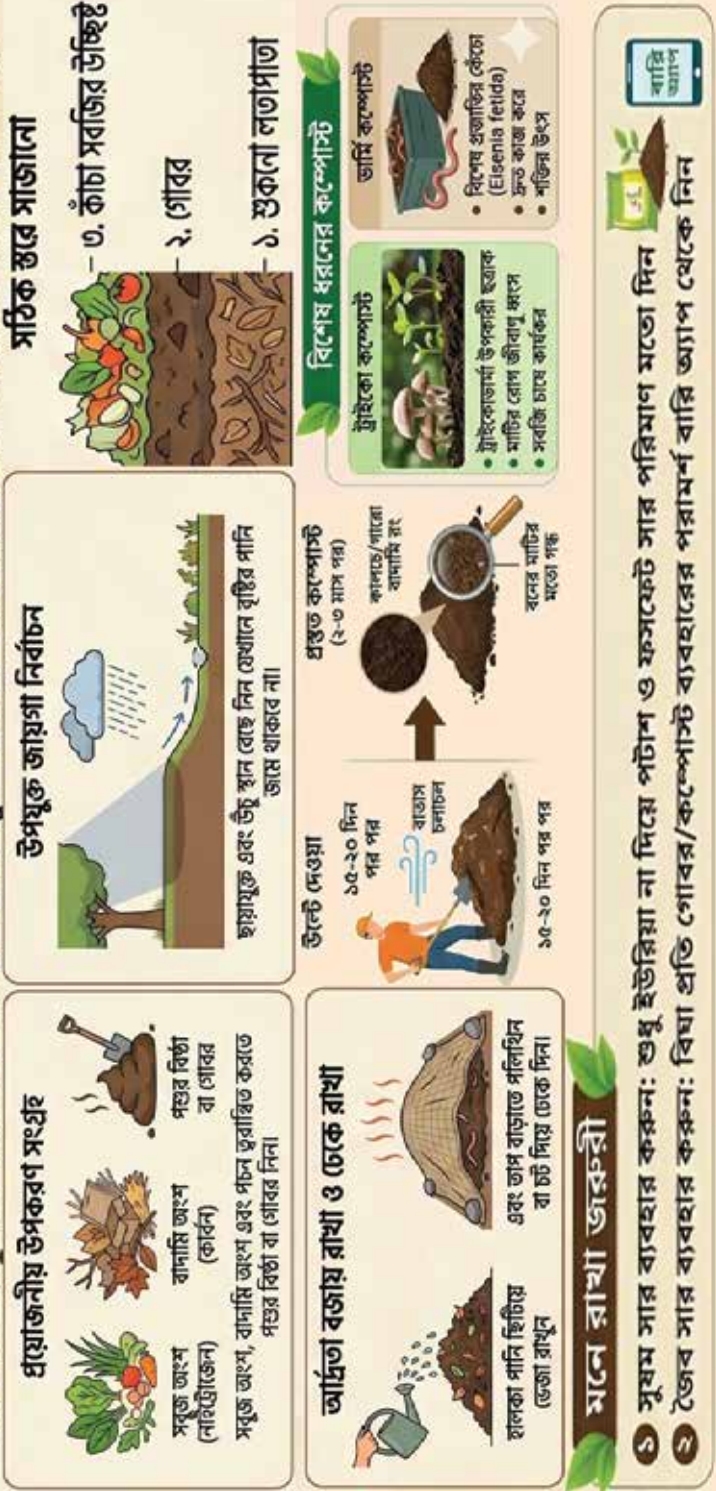
জৈব কম্পোস্ট ছাড়াও বর্তমানে ট্রাইকো-কম্পোস্ট, কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি-কম্পোস্ট ব্যবহার করা হয়। ট্রাইকোডার্মা (Trichoderma) নামক এক প্রকার উপকারী ছত্রাক ব্যবহার করে দ্রুত ট্রাইকো-কম্পোস্ট যা কম্পোস্ট তৈরি করা হয়। এটি মাটির রোগজীবাণু ধ্বংস করতে সাহায্য করে এবং সবজি চাষের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। কেঁচো কম্পোস্ট বা ভার্মি-কম্পোস্ট (Vermi-compost) তৈরি করতে বিশেষ প্রজাতির কেঁচো যেমন: *Eisenia fetida* ব্যবহার করা হয়। এটি সাধারণ কম্পোস্টের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং দ্রুত কাজ করে।

মনে রাখা জরুরি:

- ✿ **সুঘম সার:** শুধু ইউরিয়া ব্যবহার না করে পটাশ, ফসফেট ও অন্যান্য সার পরিমাণমতো দিতে হবে।
- ✿ **জৈব সার:** রাসায়নিক সারের পাশাপাশি বিঘাপ্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ গোবর বা কম্পোস্ট সার ব্যবহারের পরামর্শ অ্যাপ থেকেই পাবেন।

কম্পোস্ট তৈরির সহজ প্রক্রিয়া ও নির্দেশিকা

এই ইনফোগ্রাফিকটি বাড়িতে বা খামারে 'গর্ত' বা 'স্তূপ' পদ্ধতিতে উন্নত মানের জৈব সার তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করে।



ইনফোগ্রাফিক: মো. হাসিনুল ইসলাম

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে জাত ও বীজের গুরুত্ব

ড. মো. বজলুর রহমান

ফসল চাষের সাফল্যের অন্তত ৫০-৬০% নির্ভর করে সঠিক জাত নির্বাচন এবং মানসম্মত বীজের ওপর। জাত যদি ভালো না হয়, তবে সঠিক পরিচর্যা করেও কাজিফত ফলন পাওয়া সম্ভব নয়।

নিচে সর্বাঙ্গি ও ফলের জাত নির্বাচন এবং বীজ সংগ্রহের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হলো:

ফসল উৎপাদনে বীজের গুরুত্ব

কৃষি উৎপাদনে ভালো বীজের গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো বীজ হলো ফসলের মূল বিনিয়োগ। তাই বীজ যদি উন্নত মানের না হয়, তবে সার, সেচ বা অন্যান্য পরিচর্যা দিয়েও কাজিফত ফলন পাওয়া সম্ভব নয়। ভালো বীজ একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কমায়, অন্যদিকে কৃষকের লভ্যাংশ নিশ্চিত করে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

কৃষি উৎপাদনে ভালো বীজের গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হলো:

১. অধিক ফলন নিশ্চিতকরণ: উন্নত মানের বা প্রত্যাযিত বীজ ব্যবহার করলে সাধারণ বীজের তুলনায় ১৫% থেকে ২০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পেতে পারে। ভালো বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশি থাকে, ফলে জমিতে চারাগাছের সংখ্যা সঠিক থাকে।

২. রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা: ভালো বীজ সাধারণত রোগমুক্ত এবং শোধান করা থাকে। উন্নত জাতের বীজগুলো প্রতিকূল আবহাওয়া, খরা, লবণাক্ততা এবং কিছু পোকামাকড় প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়, যা কৃষকের ঝুঁকি কমায়।

৩. বীজের বিশুদ্ধতা ও গুণগত মান: ভালো বীজে অন্য কোনো জাতের বীজ বা আগাছার বীজ মিশ্রিত থাকে না। এতে উৎপাদিত ফসলের মান বজায় থাকে এবং বাজারে ওই ফসলের ভালো দাম পাওয়া যায়।

৪. গাছ ও ফসলের সমজাতীয়তা: ভালো বীজ থেকে জন্মানো গাছগুলো একই সাথে বড় হয় এবং একই সময়ে ফসল পাকে। এতে ফসল সংগ্রহ করা সহজ হয় এবং যান্ত্রিক চাষাবাদের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত সহায়ক।

৫. খরচ ও শ্রমের সাশ্রয়: নিম্নমানের বীজে অনেক সময় চারা গজায় না, ফলে পুনরায় বীজ বপন করতে হয় যা খরচ বাড়িয়ে দেয়। ভালো বীজ ব্যবহার করলে একবারেই সুস্থ-সবল চারা পাওয়া যায়, যা সার ও পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে।

৬. অঙ্কুরোদগমের হার: ভালো বীজের অঙ্কুরোদগমের হার সাধারণত ৮০% থেকে ৯০% এর উপরে থাকে। ফলে অল্প বীজে বেশি জমিতে চাষ করা সম্ভব হয় এবং বীজের অপচয় রোধ হয়। পুনরায় বীজ বপন বা চারা রোপণের ঝুঁকি কম থাকে।

সারকথা: “ভালো বীজে ভালো ফসল” —এই প্রবাদটি কৃষির চিরন্তন সত্য। একটি সুস্থ ও সবল বীজ মানেই একটি সমৃদ্ধ ফসলের নিশ্চয়তা। তাই লাভজনক কৃষির জন্য কৃষকদের সর্বদা প্রত্যাযিত এবং উন্নত মানের বীজ নিশ্চিত করতে হবে।

ভালো বীজের গুণাগুণ এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপকারিতা একে অপরের পরিপূরক।

একটি বীজকে ‘উন্নত’ বা ‘ভালো’ বলতে গেলে তাতে নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন:

❁ **জৈবিক বিশুদ্ধতা:** বীজের মধ্যে অন্য কোনো জাতের বীজের মিশ্রণ থাকবে না। অর্থাৎ, এটি হবে শতভাগ সুনির্দিষ্ট জাতের।

- ❖ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা: ভালো বীজের চারা গজানোর ক্ষমতা অন্তত ৮০% থেকে ৯০% পর্যন্ত থাকে।
- ❖ সজীবতা ও পুষ্টতা: বীজগুলো হবে নিরোগ, ভরাট এবং ওজনে ভারী। অপুষ্ট বা কুঁচকানো বীজ ভালো বীজের লক্ষণ নয়।
- ❖ নির্দিষ্ট আর্দ্রতা: বীজের গুণমান বজায় রাখতে এতে আর্দ্রতার পরিমাণ ৮% থেকে ১০% এর মধ্যে রাখতে হবে।
- ❖ রোগমুক্ত অবস্থা: ভালো বীজে কোনো ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া বা পোকামাকড়ের ডিম বা লার্ভা থাকে না।
- ❖ স্বাভাবিক রঙ ও উজ্জ্বলতা: প্রতিটি বীজের রঙ হবে উজ্জ্বল এবং সেই জাতের স্বাভাবিক রঙের মতো।

জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

জাত নির্বাচনের সময় আপনার এলাকার মাটি ও আবহাওয়া বিবেচনায় রাখতে হবে:

- ❖ মৌসুম ভিত্তিক জাত: শীতকালীন (যেমন: বাঁধাকপি, ফুলকপি) না কি গ্রীষ্মকালীন (যেমন: ঝিঙে, চিচিঙ্গা) তা নিশ্চিত করুন।
- ❖ উচ্চ ফলনশীল (HYV) ও হাইব্রিড: বারি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাত অথবা বাণিজ্যিক চাষের জন্য হাইব্রিড জাত বেশি লাভজনক। তবে নিজস্ব বীজের জন্য উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত ভালো। হাইব্রিড জাত হতে বীজ সংরক্ষণ করলে পরবর্তীতে ভাল ফলন পাওয়া যাবে না।
- ❖ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: আপনার এলাকায় নির্দিষ্ট কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব থাকলে (যেমন- টমেটোর ঢলে পড়া রোগ) ওই রোগ প্রতিরোধী জাত বেছে নিন।
- ❖ বাজার চাহিদা: বাজারে কোন ধরনের সবজির দাম বেশি (যেমন- লম্বা বেগুন না গোল বেগুন) তা যাচাই করুন।

প্রধান সবজির কিছু উন্নত জাত

ফসলের নাম	জনপ্রিয় ও উন্নত জাত
বেগুন	বারি বেগুন-১, বারি বেগুন-৮, ১০, ১১, ১২, তাল বেগুন, সুফলা (হাইব্রিড), বারি হাইব্রিড বেগুন-৬।
টমেটো	বারি টমেটো-২ (রতন), বারি টমেটো-১৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮, ১১ মিন্টু (হাই-ব্রিড), ডেল্টা (হাইব্রিড)।
আলু	বারি আলু-৭ (ডায়মন্ড), বারি আলু-২৫ (এস্টেরিক্স), বারি আলু-৬২, বারি আলু-৭২, বারি আলু-৮৬।
মরিচ	বারি মরিচ-১, ২ ও ৩, বগুড়ার স্থানীয় জাত, বিজলী (হাইব্রিড)।
সিম	বারি সিম-১, ২, ইপসা সিম-১ ও ২ (সারা বছর হয়)।

বীজের উৎস (কোথায় পাবেন?): ভালো মানের বীজের জন্য নিম্নলিখিত উৎসগুলো নির্ভরযোগ্য:

- ✿ বিএডিসি (BADC): বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের বীজ ডিলার বা বিক্রয় কেন্দ্র। এদের বীজের মান সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত।
- ✿ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BARI): সরাসরি বারি (BARI) থেকে নতুন উদ্ভাবিত উন্নত জাতের বীজ পাওয়া যায়।
- ✿ মানসম্পন্ন প্রাইভেট কোম্পানি: লালতীর (Lal Teer), এসিআই (ACI), সুপ্রিম সীড বা গেটকো-র প্যাকেটজাত বীজ।
- ✿ অনলাইন বীজ ব্যাংক: কৃষি বাতায়ন বা সরকারি বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে বীজের অর্ডার দেওয়া যায়।

বীজ সংগ্রহের কৌশল (নিজস্ব পদ্ধতিতে): আপনি যদি পরের বছরের জন্য বীজ রাখতে চান, তবে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলুন:

১. সেরা গাছ নির্বাচন: ক্ষেতের সবচেয়ে সুস্থ ও নিরোগ গাছটি চিহ্নিত করুন।
২. সঠিক পরিপক্বতা: সবজি বা ফল পুরোপুরি পাকার পর (গাছে থাকা অবস্থায়) বীজ সংগ্রহ করুন। যেমন- টেঁড়স শুকিয়ে খয়েরি হলে বা মরিচ পুরোপুরি লাল হলে।
৩. বীজ নিষ্কাশন ও ধোয়া: বীজ বের করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আঠালো অংশ দূর করুন।
৪. শুকানো: বীজ রোদে ৩-৪ দিন ভালোভাবে শুকান। বীজের আর্দ্রতা ৮-১০% এর নিচে থাকলে তা দীর্ঘদিন ভালো থাকে (দাঁত দিয়ে কামড় দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝবেন শুকানো ঠিক হয়েছে)।
৫. সংরক্ষণ: প্লাস্টিকের মুখবন্ধ পাত্র বা টিনের কৌটায় বীজ রাখুন যেন বাতাস না ঢোকে। ভেতরে কয়েকটা নিম পাতা বা শুকনা মরিচ দিলে পোকা ধরে না।

বীজ পরীক্ষার সহজ উপায়: বীজ বোনার আগে এটি ভালো কি না তা পরীক্ষা করে নিন:

- ✿ পদ্ধতি: একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাতে কিছু বীজ ছেড়ে দিন। যেগুলো নিচে ডুবে যাবে সেগুলো ভালো বীজ। আর যেগুলো ভেসে থাকবে সেগুলো নষ্ট বা অন্তঃসারশূন্য।
- ✿ সম্ভব হলে বীজ গজানোর পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

নিরাপদ ফসল উৎপাদনে বালাই ব্যবস্থাপনা

ড. মো. বজলুর রহমান

ফসল চাষের একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো রোগ ও পোকা (বালাই) দমন। আধুনিক কৃষিতে শুধু রাসায়নিক বিষ না ছিটিয়ে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) বা পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। নিচে বালাই দমনের প্রধান পদ্ধতিগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. দমনের চারটি প্রধান ধাপ (IPM কৌশল): বালাই দমনের পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়:

ক. যান্ত্রিক পদ্ধতি (Mechanical Control) সবচেয়ে সহজ এবং কম খরচের পদ্ধতি:

- ✿ হাত দিয়ে দমন: গাছের পাতা উল্টে পোকার ডিমের গাদা বা কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- ✿ আলোর ফাঁদ (Light Trap): রাতে খেতের পাশে আলোর উৎস রেখে নিচে সাবান-জল রাখা। মাজার পোকা ও গাঙ্গী পোকা এতে আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়।
- ✿ পার্চিং (Parching): খেতে ডালপালা পুঁতে দেওয়া যাতে পাখি বসে পোকা খেতে পারে।

খ. জৈবিক পদ্ধতি (Biological Control): শত্রু পোকা দমনে বন্ধু পোকা ব্যবহার:

- ✿ ফেরোমন ফাঁদ (Pheromone Trap): স্ত্রী পোকার ঘ্রাণযুক্ত লুর ব্যবহার করে পুরুষ পোকাকে ফাঁদে ফেলে মারা। এটি বিশেষ করে বেগুন ও কুমড়া জাতীয় ফসলের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।
- ✿ উপকারী পোকা: লেডিবার্ড বিটল বা ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকা ধ্বংস করা।

গ. চাষাবাদের কৌশল পরিবর্তন (Cultural Control):

- ✿ সুস্থ বীজ: রোগমুক্ত প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহার করা।
- ✿ পর্যায়ক্রমিক চাষ (Crop Rotation): একই জমিতে বারবার একই ফসল না ফলিয়ে ভিন্ন ফসল চাষ করা।
- ✿ সঠিক দূরত্ব: চারা থেকে চারার সঠিক দূরত্ব বজায় রাখা যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস পায়।

ঘ. রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical Control): যখন অন্য কোনো পদ্ধতিতে পোকা-মাকড় দমন হয় না, তখন শেষ উপায় হিসেবে কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে।

২. নিরাপদ বালাইনাশক ব্যবহারের নিয়ম: যদি রাসায়নিক বিষ ব্যবহার করতেই হয়, তবে নিচের ৫টি নিয়ম অবশ্যই মানবেন:

১. সঠিক নির্বাচন: পোকা বা রোগ বুঝে সঠিক ওষুধ কিনুন (যেমন পোকার জন্য কীটনাশক, ছত্রাকের জন্য ছত্রাকনাশক)।
২. সঠিক সময়: কড়া রোদে ওষুধ দেবেন না। খুব সকালে বা বিকেলে স্প্রে করা সবচেয়ে ভালো।
৩. সঠিক মাত্রা: প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশনার বেশি ওষুধ দেবেন না।
৪. নিরাপত্তা: মুখে মাস্ক এবং হাতে গ্লাভস ব্যবহার করুন। স্প্রে করার সময় বাতাসের অনুকূলে থাকুন।
৫. অপেক্ষা কাল (Pre-Harvest Interval): বিষ স্প্রে করার পর অন্তত ৭ থেকে ১৫ দিন (ওষুধের ধরণভেদে) ওই ফসল বাজারজাত বা ভক্ষণ করবেন না।

৩. বাড়িতে তৈরি বালাইনাশক: নিম তেল বা মেহগনি ফলের রস: জৈব পদ্ধতিতে চাষ করতে চাইলে নিম তেল বা মেহগনি ফলের রস ব্যবহার করা যেতে পারে। ১ লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল এবং অল্প একটু ডিটারজেন্ট মিশিয়ে স্প্রে করলে অধিকাংশ পোকা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

বোর্দো পেস্ট বা বোর্দো মিশ্রণ (Bordeaux Mixture): কৃষিতে বহুল ব্যবহৃত অত্যন্ত কার্যকর একটি ছত্রাকনাশক হলো বোর্দো পেস্ট বা বোর্দো মিশ্রণ (Bordeaux Mixture)। এটি প্রধানত তুঁতে (কপার সালফেট) এবং কলিচুন দিয়ে তৈরি করা হয়, যা গাছের বিভিন্ন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এক লিটার বোর্দো পেস্ট তৈরির সহজ অনুপাত ও পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো: প্রয়োজনীয় উপাদান: কপার সালফেট বা তুঁতে: ৫ গ্রাম কলিচুন: ৬ গ্রাম বিগুন্ধ পানি: ১ লিটার তৈরি করার নিয়ম: (১) প্রথমে ১ লিটার পানিকে দুটি আলাদা পাত্রে সমান দুই ভাগে (৫০০ মিলি করে) ভাগ করে নিন। (২) একটি পাত্রে তুঁতে এবং অন্য পাত্রে কলিচুন ভালোভাবে গুলে নিন। লোহা বা ধাতব পাত্র ব্যবহার করা যাবে না, মাটির বা পাস্টিকের পাত্র ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো। (৩) এবার চুন গোলানো পানির মধ্যে তুঁতের পানি ধীরে ধীরে ঢালুন এবং অনবরত নাড়তে থাকুন। (৪) পেস্ট বা মিশ্রণটি তৈরি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা গাছে স্প্রে করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। সতর্কতা: কখনোই তুঁতের দ্রবণে চুন মেশানো যাবে না, এতে মিশ্রণের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। সবসময় চুনের দ্রবণে তুঁতের দ্রবণ মেশাতে হয়।

বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে উপযোগী জৈব বালাইনাশকের তালিকা, প্রয়োগ পদ্ধতি ও কার্যকারিতা সম্পর্কিত একটি বিস্তারিত সারণি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

জৈব বালাইনাশক	উৎপত্তি/উপাদান	প্রয়োগ পদ্ধতি	টার্গেট পোকা/রোগ	কার্যকারিতা
নিম তেল (Neem Oil)	নিম বীজ	পানিতে মিশিয়ে স্প্রে	বোরার, পাতা বলসানো পোকা, সাদা মাছি পোকা	পোকার খাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে ও বৃদ্ধি বাধা দেয়
ট্রাইকোডার্মা (<i>Trichoderma spp.</i>)	ছত্রাক	মাটিতে বা বীজে প্রয়োগ	মাটিবাহিত রোগ যেমন শিকড় পচা, ঢলে পড়া	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, প্রতিযোগিতা ও প্যারাসিটিজম
বেভেরিয়া ব্যাসিয়ানা (<i>Beauveria bassiana</i>)	উপকারী ছত্রাক	পানিতে মিশিয়ে স্প্রে	শোষক পোকা, থ্রিপস, জাবপোকা	পোকাকে সংক্রমিত করে মৃত্যু ঘটায়
ব্যাসিলাস থুরিঞ্জিয়েনসিস (Bt)	ব্যাকটেরিয়া	স্প্রে হিসেবে পাতায় প্রয়োগ	লেপিডোপ্টেরান পোকার শূককীট (বোরার)	পোকার অস্ত্রে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে পোকার মৃত্যু ঘটায়
নিম খৈল বা নিম এক্সট্রাক্ট	নিম গাছ, নিম খৈল ফল, পাতা, বর্জ্য	মাটিতে বা গাছের গোড়ায়	মাটির পোকা ও নেমাটোড	পোকা ও কৃমির খাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে ও বৃদ্ধি বাধা দেয়
পেঁয়াজ-রসুনের নির্যাস	পেঁয়াজ ও রসুন	পানিতে মিশিয়ে স্প্রে	জাবপোকা, ফ্লি বিটল	পোকা তাড়ায়, প্রতিকারে সহায়ক হয়
হাতের তৈরি জৈব বালাইনাশক (Fermented Plant Extract)	নিম, আদা, রসুন, মরিচ, ধনে, গাছপালা, ইত্যাদি	৭-১০ দিন ফারমেন্ট করে স্প্রে	বিভিন্ন শোষক পোকা ও কাঁটাই পোকা	পোকা ও কৃমির খাওয়ার ক্ষমতা হ্রাস করে ও বৃদ্ধি বাধা দেয়
পোকামাকড় আকর্ষণকারী ফাঁদ (Pheromone Trap)	কৃত্রিম ফেরোমন (কৃত্রিম গন্ধ উৎপাদক পদার্থ)	ক্ষেতজুড়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন	ফল ও শাকসবজির বোরার	নির্দিষ্ট পোকা আকর্ষণ করে ফাঁদে ফেলে
আঠালো ফাঁদ (Sticky Trap)	রঙিন আঠালো কাগজ	গাছের উপর ঝুলিয়ে	সাদা মাছি, থ্রিপস	আকর্ষণ করে আটকে রাখে
বায়ো-ইনসেক্টিসাইড (বায়োকন্ট্রোল এজেন্ট)	লিভিং অর্গানিজম (প্যারাসিটয়েড, প্রিডেটর)	ছেড়ে দেওয়া	যেমনঃ ladybird beetle, জাবপোকা	প্রকৃতিকভাবে দমন করে, পুনরুৎপাদন করে

বালাই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইটিএল (ETL) এবং প্রিডেটর (Predator) শব্দ দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো মূলত সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) এর মূল ভিত্তি, যা পরিবেশ রক্ষা করে ফসলের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

নিচে এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

* ইটিএল (ETL - Economic Threshold Level)

ইটিএল-এর পূর্ণরূপ হলো **Economic Threshold Level**, বাংলায় একে বলা হয় 'অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমা'।

এটি পোকা দমনের এমন একটি পর্যায় বা সংখ্যা, যখন রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। এর আগে পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব বা যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করলেই চলে।

✿ **কেন এটি জানা জরুরি?** জমিতে দু-একটি পোকা দেখলেই বিষ দেওয়া উচিত নয়। এতে খরচ বাড়ে এবং উপকারী পোকা মারা যায়। পোকার সংখ্যা যখন ইটিএল-এ পৌঁছায়, তখন বিষ না দিলে ফসলের ক্ষতি ওষুধের খরচের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

✿ **উদাহরণ:** * **বেগুনের ক্ষেত্রে:** যদি ৫-১০% ডগা বা ফল পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবেই কীটনাশক স্প্রে করার কথা ভাবা হয়। এর নিচে থাকলে শুধু আক্রান্ত ডগা কেটে ফেললেই চলে।

সহজ কথায়: ইটিএল হলো একটি 'সংকেত', যা কৃষককে বলে দেয় যে এখন আর দেরি করা যাবে না, দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

* **প্রিডেটর (Predator) বা শিকারি বন্ধু পোকা:** প্রকৃতিতে কিছু পোকা আছে যারা আমাদের ফসলের শত্রু পোকাদের খেয়ে বেঁচে থাকে। এদেরই প্রিডেটর বা শিকারি বন্ধু পোকা বলা হয়। এরা কোনো বিষ ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে ক্ষতিকর পোকা-মাকড় দমন করে।

প্রধান কিছু প্রিডেটর পোকা:

- ✿ **লেডি বার্ড বিটল (Ladybird Beetle):** এটি দেখতে লালচে বা কমলা রঙের এবং পিঠে কালো ফোঁটা থাকে। এটি জাব পোকা (Aphid) এবং শোষক পোকা খেয়ে শেষ করে দেয়।
- ✿ **মাকড়সা (Spider):** খেতের বিভিন্ন উড়ন্ত পোকা ও গাঙ্গী পোকা এদের জালে আটকে মারা পড়ে।
- ✿ **সিরফিড ফ্লাই (Syrphid Fly):** এদের লার্ভা প্রচুর পরিমাণে জাব পোকা ও ত্রিপস পোকা খায়।
- ✿ **ড্রাগন ফ্লাই (ফড়িং):** এরা উড়ন্ত মাজরা পোকা বা লেদা পোকার মথ শিকার করে।
- ✿ **ট্রাইকোগ্রামা (Trichogramma):** এটি এক প্রকার ক্ষুদ্র বোলতা যা ক্ষতিকর পোকার ডিমের ভেতরে নিজের ডিম পেড়ে ওই পোকাকে বংশবিস্তার করতে দেয় না।

* **ইটিএল এবং প্রিডেটর-এর মধ্যে সম্পর্ক:** আপনি যদি জমিতে প্রিডেটর বা বন্ধু পোকার সংখ্যা বাড়াতে পারেন, তবে ক্ষতিকর পোকা সহজে ইটিএল (ক্ষতি সীমা) পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

✿ **সংরক্ষণ পদ্ধতি:** জমিতে বিষ প্রয়োগ করলে বন্ধু পোকাগুলো সবার আগে মারা যায়। তাই বিষ প্রয়োগের আগে দেখতে হবে খেতে বন্ধু পোকা (যেমন মাকড়সা বা লেডি বার্ড বিটল) বেশি আছে কি না। যদি বন্ধু পোকা বেশি থাকে, তবে অনেক সময় বিষ ছাড়াই পোকা দমন হয়ে যায়।

* কৃষক হিসেবে আপনার করণীয়

১. **পর্যবেক্ষণ:** নিয়মিত ক্ষেত ঘুরে দেখুন পোকার সংখ্যা বাড়ছে কি না। ২. **পাখি বসার ব্যবস্থা (পার্চিং):** খেতে ডাল পুঁতে দিন। পাখি সেখানে বসে পোকা ধরবে। এটি একটি প্রাকৃতিক প্রিডেটর পদ্ধতি। ৩. **আলোক ফাঁদ:** এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন খেতে কী ধরণের পোকা আছে এবং তাদের সংখ্যা ইটিএল-এর উপরে কি না। ৪. **বন্ধু পোকা চেনা:** বন্ধু পোকা ও শত্রু পোকা চিনতে শিখুন যেন ভুলে উপকারী পোকা মেরে না ফেলেন।

নির্যাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বসত বাড়ি এলাকায় সারাবছর সবজি ও ফল উৎপাদনের কয়েকটি মডেল উদ্ভাবন করেছে। বছরব্যাপি সবজি উৎপাদনের একটি আদর্শ মডেল নিম্নে দেওয়া হলো:



সম্ভাব্য ফসলের তালিকা

উন্মুক্ত স্থান

: মূলা, বাঁধাকপি, টমেটো + পালংশাক, ব্রোকলি, ফুলকপি, গাজর + ধনিয়াপাতা, ডাটা, বেগুন, ঢেড়স, গিমাফল, লালশাক, পুইশাক এবং সবুজ ডাটা শাক।

বেড়া/মাচা

: উচ্ছে, করলা, বরবটি, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চিচিংগা।

ঘরের চাল

: লাউ, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া।

অফলা গাছ

: চুপরি আলু/গাছআলু, ধুন্দুল, শিম, বরবটি, ঝিঙা, উচ্ছে।

আংশিক ছায়াযুক্ত স্থান

: গুলকচু, পাতাকচু, হলুদ, আদা, বারোমাসি মরিচ।

স্যাঁতস্যাঁতে স্থান

: পানিকচু, লতিকচু।

বাড়ির সীমানা

: পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, মাল্টা, ড্রাগনফল।

বাড়ির পিছনের পরিত্যক্ত স্থান

: বারোমাসি সজিনা, কাচকলা, আম, কাঁঠাল।

পুকুর পাড়

: লাউ, মিষ্টিকুমড়া, পেঁপে, পেয়ারা, মাল্টা, নেপিয়র ঘাস।

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনে করণীয়

ড. মো. মশিউর রহমান

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অনুসরণ করা জরুরি, যাতে ফলভোগীদের জন্য তা স্বাস্থ্যকর, বিষমুক্ত এবং নিরাপদ হয়। নিচে নিরাপদ সবজি ফল উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপসমূহ ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো:

উপযুক্ত জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতি

- ❖ দূষণমুক্ত, রাসায়নিকবর্জ্য মুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে
- ❖ আগাছা পরিষ্কার করে সঠিকভাবে জমি চাষ করতে হবে।

গুণগতমানসম্পন্ন ও রোগমুক্ত চারা/বীজ নির্বাচন

- ❖ জাত ও এলাকায় উপযোগী উচ্চফলনশীল ও প্রতিরোধক্ষম জাত বাছাই করা অপরিহার্য
- ❖ সরকার স্বীকৃত ডিলার বা নার্সারি থেকে বীজ/চারা সংগ্রহ করতে হবে।

সুষম ও নিরাপদ সার প্রয়োগ

- ❖ জৈব সার ও কম্পোস্ট ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে
- ❖ মাটির পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুসারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে
- ❖ ভারী ধাতু বা দূষিত উৎসের সার বর্জন করতে হবে।

সুষম সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

- ❖ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার
- ❖ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

সঠিক সময়ে ও নিরাপদ কীটনাশক/বালাইনাশক ব্যবহার

- ❖ অনুমোদিত, স্বল্প বিষাক্ত ও দ্রুত-বিভাজ্য কীটনাশক ব্যবহার
- ❖ IPM (Integrated Pest Management) ও বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার
- ❖ PHI (Pre-Harvest Interval) মেনে চলা অর্থাৎ সংগ্রহের আগে যথাযথ সময় দেওয়া

ফল সংগ্রহের সঠিক সময় নির্ধারণ

- ❖ পরিপক্ক কিন্তু অতিপক্ক নয় এমন অবস্থায় সংগ্রহ
- ❖ রোদে শুকানো বা কেমিক্যাল ব্যবহারে ত্বরান্বিত পাকানো পরিহার করা

সংগ্রহোত্তর পরিচ্ছন্নতা ও হ্যান্ডলিং

- ❖ পরিষ্কার পাত্র ও গ্লাভস ব্যবহার করা
- ❖ ক্ষতযুক্ত ফল আলাদা করা
- ❖ চাহিদা অনুযায়ী ধোয়া, ছাঁটাই ও গ্রেডিং

প্যাকেজিং ও পরিবহন ব্যবস্থা

- ✿ স্বাস্থ্যসম্মত প্যাকেজিং ব্যবহার
- ✿ ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ ও পরিবহন

ট্রেসেবিলিটি বা উৎস শনাক্তকরণ ব্যবস্থা

- ✿ উৎপাদক ও উৎপাদনের স্থান সম্পর্কে সঠিক রেকর্ড রাখা

GAP (Good Agricultural Practices) ও প্রশিক্ষণ অনুসরণ

- ✿ কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ
- ✿ GAP, HACCP বা ISO এর মত মান ব্যবস্থাপনা অনুসরণ

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সংবেদনশীল বিষয়। যথাযথ নিয়ম না মানলে খাদ্যে ক্ষতিকর কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ থেকে যেতে পারে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অনুসরণ করা আবশ্যিক।

নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদনে কীটনাশক ব্যবহারে অনুসরণীয় ধাপসমূহ

১. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management) IPM অনুসরণ

IPM বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা হলো কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্প ও পরিবেশবান্ধব একটি কৌশল, যার মাধ্যমে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে অন্যান্য পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করা হয়। এ পদ্ধতির প্রধান প্রধান কৌশল হলো:

- ✿ রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল জাত নির্বাচন করা
- ✿ প্রাকৃতিক শত্রু (পোকামাকড়ের প্রাকৃতিক শত্রু প্রাণী) সংরক্ষণ করা
- ✿ জৈব কীটনাশক, ফেরোমোন ট্র্যাপ, আলো ফাঁদ, হাত দিয়ে পোকা ধরা, শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা
- ✿ বিষমুক্ত বা নিরাপদ জৈব পদ্ধতির চর্চাকে উৎসাহিত করা
- ✿ শেষ উপায় হিসাবে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা
- ✿ রাসায়নিক কীটনাশকের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি ব্যবহার

২. নিবন্ধিত ও অনুমোদিত কীটনাশক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

- ✿ কৃষি মন্ত্রণালয়/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ও নিবন্ধিত কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে
- ✿ অবৈধ/ভেজাল কীটনাশক বিক্রি বন্ধে বাজার তদারকি জোরদার করতে হবে

৩. সঠিক কীটনাশক নির্বাচন

- ✿ নির্দিষ্ট পোকা বা রোগের জন্য নিবন্ধিত এবং অনুমোদিত কীটনাশক নির্বাচন করতে হবে
- ✿ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরামর্শ বা সুপারিশ মোতাবেক কীটনাশক নির্বাচন করতে হবে

- ✿ ফসল সুরক্ষায় এমনভাবে রাসায়নিক নির্বাচন করতে হবে যা পরিবেশের ওপর নেতিবাচক এবং উপকারী পোকামাকড়ের উপর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করতে পারে।

৪. সঠিক মাত্রায়, সময়, স্থান ও আবহাওয়ার পরিস্থিতি মেনে কীটনাশক স্প্রে করা

- ✿ ব্যবহারের পূর্বে কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, মাত্রা, সময়, পদ্ধতি ও ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে হবে
- ✿ বোতল বা কন্টেইনারের লেবেলে দেওয়া মাত্রা অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে (নির্দিষ্ট মাত্রার কম বা অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না)
- ✿ কীটনাশক প্রয়োগের উপযুক্ত সময়ে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে (সাধারণত সকাল বা বিকেল)
- ✿ ফুল ফোটার সময় বা ফোটা অবস্থায় কীটনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকা (মৌমাছি রক্ষার্থে)
- ✿ অধিক বাতাস প্রবাহিত হলে কীটনাশক স্প্রে করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- ✿ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে কীটনাশক স্প্রে করা থেকে বিরত থাকতে হবে
- ✿ বসতবাড়ি, পুকুর বা পানির উৎসের সন্নিকটে কীটনাশক স্প্রে করা থেকে বিরত থাকতে হবে

৫. পূর্ব সংগ্রহ বিরতি সময় (PHI) ও জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করা

- ✿ কৃষকদের Pre-Harvest Interval (PHI) সম্পর্কে অবগত করা এবং প্রয়োগ সময় ও সংগ্রহ সময় লিখে রাখার নির্দেশনা দেওয়া
- ✿ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি বা PHI অর্থাৎ কীটনাশক প্রয়োগের পর কতদিন পর ফসল সংগ্রহ করা যাবে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। উদাহরণ: কোনো কীটনাশকের PHI যদি ৭ দিন হয়, তবে প্রয়োগের অন্তত ৭ দিন পরে ফসল তুলতে হবে
- ✿ নিরাপদ এবং জৈব বালাইনাশক প্রয়োগকে উৎসাহিত করে রাসায়নিক বালাইনাশকের ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।

৬. ব্যক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ

- ✿ স্প্রে করার সময় ব্যক্তিগত সুরক্ষা উপকরণ যেমন: গ্লাভস, মাস্ক, চশমা, বুট ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে
- ✿ ব্যবহার শেষে শরীর ও জামাকাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে

৭. ফাঁকা কীটনাশকের বোতল ও প্যাকেট যথাযথভাবে ধ্বংস করা

- ✿ কীটনাশকের খালি পাত্র বা বোতল পুকুর, নদী বা কোলা মাঠে ফেলা যাবে না
- ✿ কীটনাশকের খালি পাত্র বা বোতল পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে

৮. কীটনাশকের রেকর্ড রাখা ও অবশিষ্টাংশ (MRL) পরীক্ষা করা

- ✿ কোন কীটনাশক, কত তারিখে, কত পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়েছে তার তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে
- ✿ সবজি বা ফল সংগ্রহের পূর্বে নির্দিষ্ট সময় পার না হলে খাদ্যে বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ থেকে যেতে পারে তাই কোন সন্দেহ দেখা দিলে প্রয়োজনে পরীক্ষাগারে খাদ্যে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ বা Maximum Residue Limit (MRL) পরীক্ষা করতে হবে।

৯. ভোক্তার সচেতনতা বৃদ্ধি ও লেবেলিং ব্যবস্থা করা

- ✿ ভোক্তাকে “নিরাপদ খাদ্য” সম্পর্কে সচেতন করতে হবে
- ✿ সবজি ও ফলে উৎপাদন পদ্ধতি ও ফার্মের নাম উল্লেখ করে লেবেলিং চালু করতে হবে

১০. নীতি ও আইন বাস্তবায়ন জোরদার করা

- ✿ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩, কৃষি কীটনাশক আইন ২০১৮ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে
- ✿ ভেজাল কীটনাশক ও PHI লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জরিমাণা ও শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে হবে

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন এ জন্য কীটনাশক ব্যবহারে সচেতনতা ও কীটনাশক প্রয়োগকে নিয়মের মধ্যে আনতে হবে। কারণ এটি জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ রক্ষা এবং কৃষকের আর্থিক নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত। IPM পদ্ধতি অনুসরণ, সঠিক পরিমাণে কীটনাশক প্রয়োগ, পূর্ব সংগ্রহ বিরতি মানা এবং প্রশিক্ষিত হ্যান্ডলিং-এর মাধ্যমে বিষমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।

সবজির চারা উৎপাদন কলাকৌশল

ড. মো. উবায়দুল্লাহ কায়ছার

নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য মুখ্য সবল ও নিরাপদ চাড়া উৎপাদন অপরিহার্য। চারা উৎপাদন করে যে সব সবজি চাষ করা হয় তার মধ্যে বাধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, ব্রকলি, বেগুন, টমেটো, ক্যাপসিকাম, লাউ ও মিষ্টিকুমড়া উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আগাম শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সময়ে সবজি চাষের জন্য চারা উৎপাদন ক্রমশ প্রসার লাভ করছে। উৎকৃষ্ট চারা উৎপাদনের জন্য প্রচুর দক্ষতা এবং নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা।

বীজতলার স্থান নির্ধারণ: বীজতলা তৈরীর স্থান নির্বাচনের জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। যেমন-

- ✿ বীজতলার জমি অপেক্ষাকৃত উচু হওয়া প্রয়োজন যাতে বৃষ্টির বা বন্যার পানি দ্রুত নিষ্কাশন করা যায়।
- ✿ ছায়াবিহীন, পরিষ্কার এবং বাতাস চলাচলের উপযোগী স্থানে বীজতলা করা প্রয়োজন।
- ✿ পানির উৎসের কাছাকাছি যেমন: বাড়ী, খামার বা অফিসের কাছাকাছি হওয়া উচিত।
- ✿ বীজতলার মাটি বেলে দো-আঁশ বা দো-আঁশ এবং উর্বর হওয়া উচিত। বেলেমাটি বেশী হলে কাদা মাটি, গোবর বা কম্পোষ্ট মিশিয়ে অথবা অতিরিক্ত কাদা মাটি হলে বালু, কম্পোষ্ট বা গোবর মিশিয়ে মাটির জল ধারণ ও নিষ্কাশনের উপযোগী করে বীজতলার মাটি উন্নত করা যায়।

বীজতলা তৈরী

- ✿ একক বীজতলা বা হাপোর সাধারণতঃ এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে। প্রয়োজনে বড় জমিকে ভাগ করে এভাবে একাধিক বীজতলা তৈরী করা যেতে পারে।
- ✿ পাশাপাশি দুটি বীজতলার মধ্যে কমপক্ষে ৬০ সেন্টিমিটার ফাঁকা রাখতে হবে।
- ✿ বীজ বপনের কয়েকদিন আগে বীজতলার মাটি ২০-২৫ সেন্টিমিটার গভীর করে খুবখুঁরা ও ঢেলা মুক্ত করে তৈরী করতে হবে। বীজতলা সাধারণতঃ ১০-১৫ সেন্টিমিটার উঁচু করে তৈরী করতে হবে।
- ✿ মাটি, বালি ও পঁচা গোবর সার বা কম্পোষ্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরী করতে হয়। মাটি উর্বর হলে রাসায়নিক সার না দেয়াই ভালো। উর্বরতা কম হলে বীজ বপনের এক সপ্তাহ আগে প্রতি বীজতলায় ১০০ গ্রাম টিএসপি সার মিশাতে হবে।

বীজতলার মাটি শোধন: বীজ বপনের পূর্বে বীজতলার মাটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শোধন করা যায়। এতে অনেক মাটিবাহিত রোগ, পোকামাকড় আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়। যেমন- সৌরতাপ ব্যবহার করে (কালো পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে), জলীয় বাষ্প ব্যবহার করে, কাঠের গুড়া পুড়িয়ে ও পোন্ডি রিফিউজ ব্যবহার করে।

উল্লেখিত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সবচাইতে সহজ ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো সৌরতাপ ব্যবহার করে বীজতলার মাটি শোধন করা। এক্ষেত্রে

- ✿ বীজ বপনের ১২-১৫ দিন পূর্বে বীজতলার মাটি যথাযথভাবে তৈরী করে ভালভাবে পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- ✿ পরে পলিথিন দিয়ে বায়ু নিরোধক করে ঢেকে রাখতে হবে। এতে সারা দিনের সূর্যালোকে পলিথিনের ভিতরে বীজতলার মাটির তাপমাত্রা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে ও অনেকাংশে মাটিবাহিত রোগজীবাণু দমন করবে।

নিরাপদ সর্বাঙ্গ ও ফল উৎপাদন

- ✿ এছাড়াও অনেক ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও আগাছা দমন হয়।
- ✿ পোল্ট্রি রিফিউজ ব্যবহার করেও বীজতলায় মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধির সাথে সাথে আংশিকভাবে বীজতলার মাটি শোধনের প্রক্রিয়া বর্তমানে দেশের অনেক সবজি উৎপাদন এলাকায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বীজ শোধন: বীজতলায় বপনের পূর্বে সবজি বীজ কয়েকটি পদ্ধতিতে শোধন করা যায়।

- ✿ এগুলোর মধ্যে গুড়ো রাসায়নিক ঔষধ দ্বারা বীজ শোধন পদ্ধতি বর্তমানে সর্বাধিক প্রচলিত ও কম ঝামেলাপূর্ণ। প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ বা ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।
- ✿ বীজ শোধনের ফলে বিভিন্ন সবজির এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রমণ রোধ সম্ভব হয়।
- ✿ বীজ শোধনকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিষাক্ত বিধায় শোধিত বীজ, শোধন সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে।

বীজ পরীক্ষাকরণ: শাক সবজির বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে, নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন সবজির উচ্চ ফলন আশা করা যায় না। বীজের উৎকৃষ্টতা নির্ভর করে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ও সতেজতার উপর।

বীজ বপন

- ✿ বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম।
- ✿ সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৪ সেমি) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরী করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ✿ ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়।
- ✿ শুকনা মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেচ দেয়া মাটির জো অবস্থা এলে বীজ বপন করতে হয়।
- ✿ যে সমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করেনা, সেগুলোকে সাধারণতঃ বোনার পূর্বে পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘন্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে এক রাতি ভিজিয়ে বপন করতে হয় (যেমন লাউ, চিচিংগা, মিষ্টি কুমড়া, করলা, উচ্ছে ও ঝিঙা)।

চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি

- ✿ প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসাবে সবজির চারা কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে, গামলায়, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়।
- ✿ কোন কোন সময় কুমড়া, সীম জাতীয় সবজির চারা রোপন করার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু এসব সবজি রোপন জনিত আঘাত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ছোট আকারের পলিথিনের ব্যাগে বা উপরে উল্লিখিত অন্যান্য মাধ্যমে এদের চারা উৎপাদন করা উচিত যাতে শেকড় ও মাটি সহ চারা রোপন করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে চারা রোপন করতে হবে।

বীজতলায় আচ্ছাদন

- ✿ আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়।
- ✿ আচ্ছাদন বিভিন্ন ভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলার প্রস্থ বরাবর ৫০ সে. মি. পর পর পুতে নৌকার হৈ এর আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে ঢেকে চারা রক্ষা করা যায়।

চারার যত্ন

- ✿ চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- ✿ পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘ সময় বেশী ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারার রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।
- ✿ চারার শেকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন এটি বরং উপকারী।
- ✿ চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মত দূরত্ব ও পরিমানে চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপন করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরকরণ

- ✿ জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় সবজি চারা রোপনের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে।
- ✿ দেখা গেছে ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি, বেগুন ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়।
- ✿ চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সুচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় লাগাতে হয়।
- ✿ বাঁশের সুচালো কাঠি বা কাঠের তৈরী সুচালো ফ্রেম দ্বারা সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়।
- ✿ লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় চারার রোগ দমন

- ✿ বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে বীজ এবং পরে কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে।
- ✿ অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না।
- ✿ গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে।
- ✿ একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণত মরে না, কিন্তু এদের শেকড় দুর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে বলে ড্যাম্পিং অফ। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী। ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলার মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশী হয়।

নিরোপদ সবজি ও ফল উৎপাদন

- ✿ এ জন্য বীজতলার মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিশোধক হিসাবে মাটিতে ক্যাপটান, কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫, ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালকরে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপণ করতে হবে।
- ✿ এছাড়াও কার্টের গুড়া পুড়িয়ে, সৌরতাপ ব্যবহার করে, পোল্ট্রি রিফিউজ ও সরিষার খৈল ব্যবহার করেও ড্যাম্পিং অফ থেকে চারাকে রক্ষা করা যায়।

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধণ

- ✿ রোপনের পর মাঠের প্রতিকূল পরিবেশ যেমন ঠাণ্ডা আবহাওয়া বা উচ্চতাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, শুষ্ক বাতাস এবং রোপনের ধকল ও রোপনকালীন সময়ে চারা নাড়াচারায় সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়।
- ✿ যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িক ভাবে কমিয়ে যেমন বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা যায়।

চারা রোপন

- ✿ বীজতলায় বীজ বপনের নির্দিষ্ট দিন পর চারা মূল জমিতে রোপন করতে হয়। সবজির প্রকার ভেদে চারার বয়স ভিন্নতর হবে।
- ✿ কপি জাতীয় সবজি, টমেটো, মরিচ, বেগুন ইত্যাদির চারা ২০-৩০ দিন বয়সে রোপন করতে হয়।
- ✿ চারা উঠানোর পূর্বে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। যত্ন করে যতদূর সম্ভব শেকড় ও কিছু মাটি সহ চারা উঠাতে হবে।
- ✿ মূল জমিতে চারা লাগানোর পরপরই গোড়ায় পানি সেচ দিতে হবে।
- ✿ চারা সাধারণত বিকেল বেলায় লাগানো উচিত। চারা লাগানোর কয়েকদিন পর পর্যন্ত গাছে নিয়মিত পানি দিতে হবে।



Damping off (*Pythium*, *Rhizoctonia*, *Phytophthora*, etc.)



কুমড়া জাতীয় সবজির নিরাপদ উৎপাদন কলাকৌশল

ড. বাহাউদ্দিন আহমেদ

কুমড়া জাতীয় সবজির পরিবারকে ইংরেজিতে কিউকারবিটেসি (Cucurbitace) বলে। এই পরিবারের অর্ন্তভুক্ত প্রায় ১৫-১৬ টি সবজি বর্তমানে বাংলাদেশে চাষাবাদ হচ্ছে। এই পরিবারের উল্লেখযোগ্য সবজিগুলো হলো- লাউ, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, করলা, শসা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, পটল, কাঁকরোল, তরমুজ ইত্যাদি। বাংলাদেশের জন্য কুমড়া পরিবারের সবজি সমূহ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। খরিপ মৌসুমের সবজির চাহিদায় এক বৃহৎ অংশ এই পরিবার থেকে আসে। গুলো জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর এবং বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে চাষ হয়। তবে বর্তমানে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ফসলে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ থেকে যাচ্ছে, যা মানবদেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। নিরাপদ চাষাবাদের ভিত্তি হলো ভাল জাত নির্বাচন। প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উচ্চ ফলনশীল জাত নির্বাচন করলে রোগবালাই কম হয় এবং কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজনও কমে যায়। দ্বিতীয়ত, জমি প্রস্তুতের সময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন পচানো গোবর ও কম্পোস্ট ব্যবহার করতে হবে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করতে হবে। চাষের ১-১.৫ মাসের মধ্যেই ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রমণ শুরু করে। এজন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে প্রাথমিক অবস্থায় পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বালাই দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) অনুসরণ করতে হবে। এতে প্রাকৃতিক শত্রু, জৈব কীটনাশক এবং যান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয়ে ক্ষতিকর পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন হলে অনুমোদিত ও অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত কীটনাশক নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে এবং শেষ প্রয়োগের পর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ সময় মেনে ফসল তুলতে হবে।

চাষাবাদের শেষ ধাপে ফসল সংগ্রহ, পরিষ্কারকরণ, গ্রেডিং এবং বাজারজাতকরণেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। পরিশেষে, চাষীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা দরকার যাতে তারা নিরাপদ চাষাবাদের নিয়ম মেনে চলতে পারেন। নিরাপদ উৎপাদন শুধু চাষির জন্য নয়, বরং আমাদের সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, ভোক্তার স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং টেকসই কৃষির পথ প্রশস্ত করে। অতএব, সচেতন চাষি ও সচেতন সমাজ মিলে গড়তে পারে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা।

জলবায়ু

কুমড়া পরিবারের সব সবজিই উষ্ণ মন্ডলের ফসল। এদের চাষের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা আবশ্যিক। কোনটাই হিমাক্ষের নীচে বেঁচে থাকতে পারে না এবং ১০° সেঃ নীচে সবগুলোরই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তবে আমাদের দেশে লাউ শীতকালে ভালো হয়। চাষের জন্য উঁচু, পানি নিষ্কাশনে সুব্যবস্থা আছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এছাড়া জমিটি অবশ্যই মহাসড়ক বা ভারী যানবাহন চলাচল করে এমন সড়ক হতে কমপক্ষে ৫০ মিটার দূরে হতে হবে, তবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষাবাদের সময় সে দূরত্ব না মানলেও চলবে। আবার কলকারখানা বর্জ্য নিষ্কাশনের পথ থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ পরিহার করতে পারলে রোগ-বালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব কমানো যাবে। হালকা বেলে থেকে ভারী কাদামাটি পর্যন্ত সব মাটিতেই এই পরিবারের সবজিগুলো জন্মান।

জাত নির্বাচন: বিএআরআই ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক জাত নির্বাচন করা উচিত। তবে কৃষকরা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা আছে এমন জাতও চাষ করা যেতে পারে।

বংশ বিস্তার: পটল ও কাঁকরোল বাদ দিয়ে অন্যান্য সকল কুমড়া জাতীয় ফসলের বীজ দিয়ে বংশ বিস্তার করা হয়। পটল ও কাঁকরোল এর ক্ষেত্রে কন্দমূল (stem root) এবং পরিপক্ক কাণ্ডকে বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য কুমড়া জাতীয় সবজির বীজ সরাসরি জমিতে বা মাদায় রোপন করতে হবে। তবে পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরী করাই উত্তম। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে। এক গ্রাম বীজ এ প্রায় ৬-১০ টি বীজ থাকে, সেই হিসাবে প্রতি হেক্টরে ৫০০-১০০০ গ্রাম এবং প্রতি শতকে ২-৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

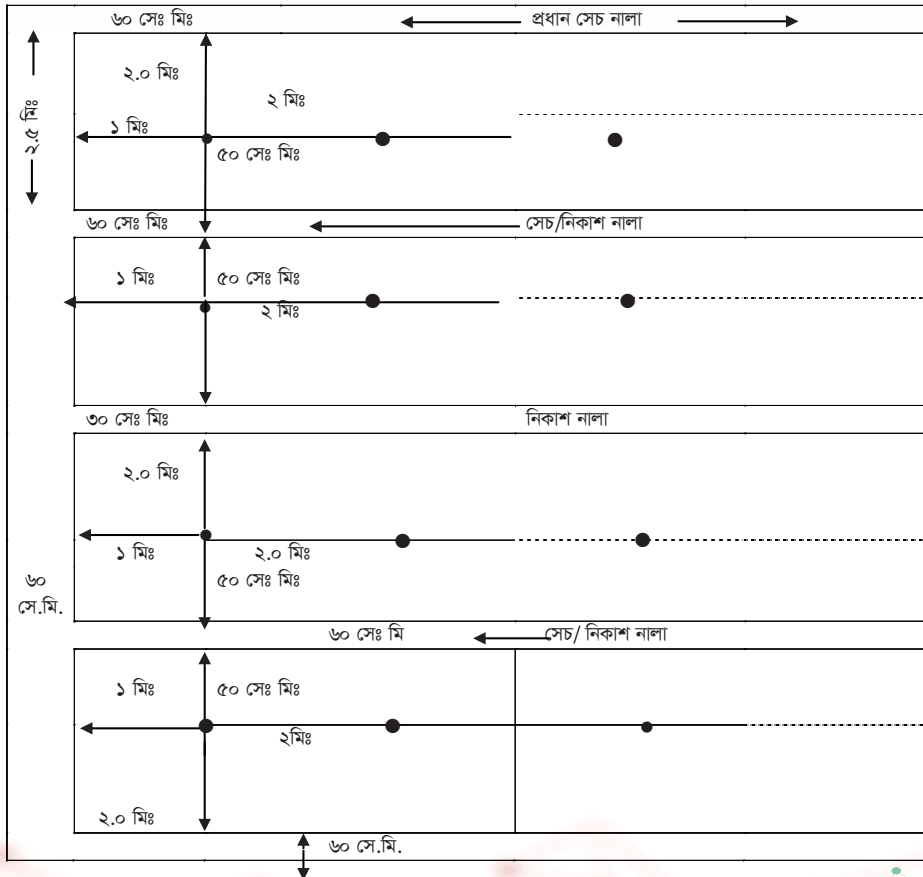
বেড তৈরি এবং বেড থেকে বেডের দূরত্ব: বেডের উচ্চতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ২.০-২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ নালা থাকবে এবং প্রতি দুবেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্ত শুধু নিকাশ নালা থাকবে। মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীর ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি। বেডের যে দিকে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে।



চারা উৎপাদনকালে ৬০ মেশ নেট দিয়ে ভাইরাস রোগের বাহক পোকা প্রতিরোধ

চারা রোপণ: রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে চারাগুলো ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

চারা লাগানোর পর মাদায় পানি দিতে হবে। চারার বয়স ১৫-২০ দিন অথবা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। প্রতি পিটে একটি সুস্থ সবল চারা রোপন করতে হবে।



সার এবং মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা: এই পরিবারের সবজি উৎপাদনে মাটি বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে উপযুক্ত সার ও মাটির উপযোগ নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করতে হবে।

বিষা প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ

সার	পরিমাণ/ কেজি	রোপণের ৭ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০ দিন পর	চারা রোপণের ৪৫ দিন পর	চারা রোপণের ৬০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১৫০০	সব	-	-	-	-
ইউরিয়া	৪০	-	১০	১০	১০	১০
টিএসপি	৪০	সব	-	-	-	-
এমওপি	৩০	১০	৫	৫	৫	৫
জিপসাম	১০	সব	-	-	-	-
বোরিক এসিড	১	সব	-	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	১	সব	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১	সব	-	-	-	-

সারের প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ গোবর/কম্পোস্ট, ভার্মিকম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, বোরিক এসিড, জিঙ্ক সালফেট এবং ১০ কেজি এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া এবং এমওপি সার চারা রোপণের ১৫, ৩০, ৪৫ ও ৬০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ দেওয়া: কুমড়া জাতীয় ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারণ ব্যাহত হবে এবং যেসব ফল ধরেছে সেগুলোও আস্তে আস্তে ঝরে যাবে। তবে সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। ভূগর্ভস্থ পানির বেলায় আর্সেনিক ও নাইট্রেট নাইট্রোজেন দূষণ পরিমাপ জরুরি, আর ভূ-উপরিস্থ পানির বেলায় সকল ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর অনুজীব বা শহরের বর্জ্য স্থাপনা, হাসপাতাল, শিল্প ও ডাম্পিং বর্জ্য ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।

বাউনি দেওয়া: অধিক ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

মালচিং: সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়গুলো বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ করে গাছের গোড়ার মাটি আলাগা করে দিতে হবে।

আগাছা দমন: কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির আগাছা আলাদা করে ‘মোজাইক ভাইরাস’ রোগের আবাস স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে গাছে এসবের অভাব পড়ে। ফলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। তাই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

শোষক শাখা অপসারণ: গাছের গোড়ার দিকে ছোট ছোট ডালপালা হয়। এগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজেই গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত ডালপালাগুলো ধারালো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন: কুমড়া জাতীয় সবজির পরাগায়ন প্রধানতঃ মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশী ফল ধরার জন্য হেক্টর প্রতি তিনটি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা প্রয়োজন। কৃত্রিম পরাগায়নের নিয়ম হলো ফুল ফোটার পর পুরুষ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ফুলের পাপড়ি অপসারণ করা হয় এবং ফুলের পরাগধানী (যার মধ্যে পরাগরেণু থাকে) আন্তে করে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে (যেটি গর্ভাশয়ের পিছনে পাপড়ির মাঝখানে থাকে) ঘষে দেয়া হয়।

ফসল তোলা (ভক্ষণযোগ্য পরিপক্বতা সনাক্তকরণ): ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৫ মাস ব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্বতা নিম্নরূপে যাচাই করা হয়ঃ

- ❁ ফল পরাগায়নের ৮-১৩ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
- ❁ ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে।

ফল সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি: ফল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণের পূর্বে যথাযথ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এতে করে ফলের গুণমান, সংরক্ষণক্ষমতা এবং বাজারমূল্য বজায় থাকে।

সাধারণতঃ কচি অবস্থায় গাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করতে হয়, যখন ফলটি খাওয়ার জন্য উপযোগী হয়। প্রতি সপ্তাহে ৩-৪ বার গাছ থেকে ফল/ফসল সংগ্রহ করা উত্তম। প্রতিটি ফল বোঁটাসহ কাটা উচিত, যাতে সংরক্ষণের সময় ফলটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পচে না যায়। ফল সংগ্রহে ধারালো চাকু, কাঁচি বা সিকেকটার ব্যবহার করা উত্তম, যাতে ডগা ও গাছের ক্ষতি না হয়।

সংগ্রহের সময়: ভোর বা বিকেল অর্থাৎ দিনের ঠান্ডা সময়ে ফল সংগ্রহ করা সবচেয়ে ভালো। ফল সংগ্রহের পরপরই তা ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা স্থানে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেন ফল কোন ভাবেই মাটির সংস্পর্শে না আসে। সেজন্য মাটিতে ত্রিপল বা চাটাই বিছিয়ে তার উপর ফল রাখতে হবে। ফল ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক পাত্রে বা বুড়িতে রাখা যেতে পারে, যাতে বাতাস চলাচল বজায় থাকে। প্রয়োজনে আর্দ্রতা ধরে রাখতে ফলের ওপর ভেজা কাপড় ঢেকে দেওয়া যেতে পারে।

ধোয়া ও বাছাই (গ্রেডিং): বাজারজাত করার পূর্বে ফল ধুয়ে পরীক্ষার করতে হবে এবং আকার, রং ও গুণমান অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হবে। রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, অতি কচি, অধিক পাকা কিংবা ভিন্ন রংয়ের ফলগুলো বেছে ফেলা উচিত।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

- ❁ সবজি উৎপাদনে দেশের বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।
- ❁ দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ না করা। যদি একান্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কারিগরি সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।
- ❁ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি (Pre-Harvest Interval) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ❁ যে সকল কৃষক/শ্রমিক/কর্মী রাসায়নিক দ্রব্যের হ্যান্ডেলিং এবং প্রয়োগ করবে তাদেরকে উপযুক্ত পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

বালাই ব্যবস্থাপনা

পোকা মাকড়

১। ফলের মাছি পোকা

ক্ষতির ধরণ: স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো ফলের শাস খায়, ফল পচে যায় এবং অকালে ঝরে পড়ে।

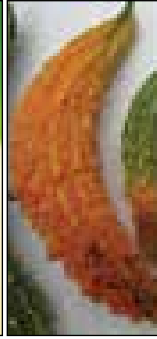
দমন ব্যবস্থাপনা: দুই ধাপে এ পোকা কার্যকারভাবে দমন করা যায়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ: মাছি পোকায় আক্রান্ত ফল দ্রুত পচে যায় এবং গাছ হতে মাটিতে ঝরে পড়ে। এই ফল কোন ক্রমেই জমির আশেপাশে ফেলে রাখা উচিত নয়। আক্রান্ত ফলসমূহ সংগ্রহ করে (যেহেতু এ পোকায় কীড়া সমূহ মাটির ১০-১২ সেমি গভীরে পুত্তলিতে পরিণত হয়) কমপক্ষে ৩০ সেমি গভীর গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে অথবা হাত বা পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে।

সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার: কিউলিওর নামক সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে পুরুষ মাছি পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। ফাঁদপ্রতি ১টি ফেরোমন লিওর ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সেমি নিচে একটি সরু তার দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রতি ২.৫ শতক জমির জন্য ১টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রতি বিঘায় ১০-১২ টি ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। প্রকার ভেদে বিষটোপ ফাঁদে পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ মাছি উভয় পোকা আকৃষ্ট হয় এবং ফাঁদে পড়ে মারা যায়। ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে তা খেতলিয়ে ০.২৫ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি পাউডার এবং ১০০ মিলি পানি মিশিয়ে ছোট একটি মাটির পাত্রে রেখে ৩ টি খুঁটির সাহায্যে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিষটোপের পাত্রটি মাটি থেকে ০.৫ মিটার উপরে থাকে। বিষটোপ তৈরির পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে তা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে তৈরি বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়।



ফলের মাছি পোকা



মাছি পোকা আক্রান্ত ফল



সেক্স ফেরোমন ফাঁদ



বিষটোপ ফাঁদ

২। পামকিন বিটল

ক্ষতির ধরণ: পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতা খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে, বড় গাছ মেরে ফেলতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা: আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অরোগোল্ড -৮৫



পামকিন বিটল



আক্রান্ত ফুল

ড্রিউপি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২-৫ গ্রাম রাগবি -১০ জি মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

৩। এপিল্যাকনা বিটল

ক্ষতির ধরণ: পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতা গুলো বিবর্ণের মত দেখায়, পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং গাছ পাতা শূণ্য হতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা: প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম অরোগোল্ড ৮৫ ডচ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



এপিল্যাকনা বিটল

৪। জাব পোকা

ক্ষতির ধরণ: জাব পোকা দলবদ্ধ ভাবে পাতার রস চুষে খায় ফলে বাড়ন্ত ডগা ও পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে, পাতা বিকৃত হয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পাতা নীচের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা: আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে রিপকর্ড প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগ

১। সাদা গুঁড়া রোগ বা পাউডারী মিলডিউ

ক্ষতির ধরণ: পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায়। কোন একটি লতার পাতায় আক্রমণ বেশী হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: জমির আশে পাশের হাঁতিশুড় জাতীয় আগাছা দমন করা। জমিতে রোগ দেখা মাত্রই মেটালেক্সিন + মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-রিডেমিল গোল্ড) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ৭-১০ দিন পর পর গাছে ২- ৩ বার স্প্রে করতে হবে।



পাউডারী মিলডিউ আক্রান্ত পাতা

২। ডাউনী মিলডিউ

ক্ষতির ধরণ: ডাউনী মিলডিউ রোগ হলে গাছের পাতা ধূসর রং ধারণ করে পাতায় সাদা সাদা পাউডার দেখা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা: পাউডারী মিলডিউ রোগ দমনের অনুরূপ।

৩। ভাইরাস

জাব পোকা (এফিড) ও সাদা মাছি (হোয়াইট ফ্লাই) ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে। এসব বাহক পোকা দমনে জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজন হলে ম্যালাথিওন গ্রুপের কীটনাশক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করার মাধ্যমে এই পোকা তথা ভাইরাস রোগের প্রাদুর্ভাব সীমিত রাখা যায়।

৪। শিকড় এর গীট রোগ

রোগের লক্ষণ: এ রোগ চারা অবস্থা থেকেই শুরু হয়। মাটিতে অবস্থানকারী কৃমির আক্রমণের ফলে আক্রান্ত স্থানের কোষসমূহ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও ঐ স্থান স্ফীত হয়ে নট বা গিটের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার ব্যবস্থা: লতা/চারা লাগানোর সময় প্রতি মাদায় ১৫-২০ গ্রাম হারে রাগবি ১০ জি প্রয়োগ করে লতা লাগাতে হবে।

সবজি চাষের কর্ম পরিবেশ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

কৃষক এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিরাপদ ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। গৃহপালিত বা খামারের প্রাণি যাতে উৎপাদন, হ্যান্ডলিং, প্যাকিং ও মজুদ এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।



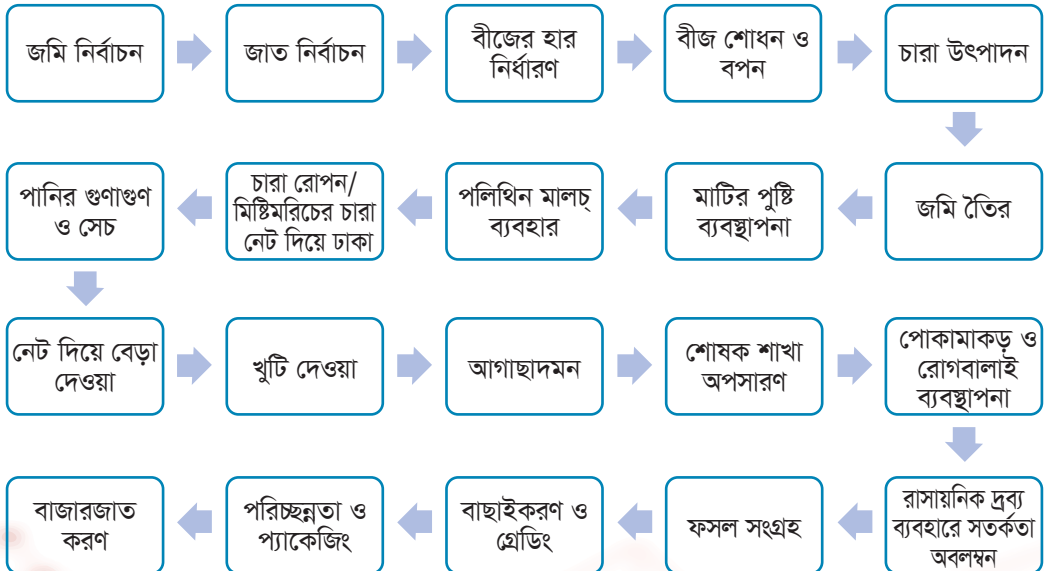
শিকড় এর গীট রোগ

সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারের সবজির (বেগুন, টমেটো, মিষ্টিমরিচ) নিরাপদ উৎপাদন কৌশল

ড. লিমু আক্তার

সোলানেসি (Solanaceae) পরিবারভুক্ত সবজি যেমন বেগুন, টমেটো ও মিষ্টিমরিচ বাংলাদেশের কৃষি ও পুষ্টি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব সবজি সারা বছর চাষযোগ্য, বাজারে চাহিদা বেশি এবং কৃষকের আয়ের প্রধান উৎসগুলোর একটি। তবে রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ ও অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের কারণে নিরাপদ উৎপাদন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। নিরাপদ উৎপাদন কৌশলের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবেশ, কৃষক ও ভোক্তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে মানসম্মত সবজি উৎপাদন নিশ্চিত করা। এর প্রথম ধাপ হলো সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ বা চারা ব্যবহার। প্রত্যয়নপ্রাপ্ত উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ এবং বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগের ঝুঁকি কমানো যায়। পাশাপাশি উপযুক্ত জাত নির্বাচন করলে রোগ সহনশীলতা ও ফলন বৃদ্ধি পায়। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা নিরাপদ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জৈব সার যেমন গোবর, কম্পোস্ট ও সবুজ সার ব্যবহারে মাটির উর্বরতা বাড়ে এবং রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা কমে। সুষম সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। একই সঙ্গে সঠিক সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা গাছকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। পোকামাকড় ও রোগ দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) অনুসরণ করা নিরাপদ উৎপাদনের অন্যতম ভিত্তি। এতে ফেরোমন ফাঁদ, আলোক ফাঁদ, উপকারী পোকা সংরক্ষণ, যান্ত্রিক দমন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কম বিষাক্ত কীটনাশক সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করা হয়। কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকাল (PHI) মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পরিবহনেও নিরাপত্তা বজায় রাখা প্রয়োজন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে সংগ্রহ, রাসায়নিকমুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ এবং সঠিকভাবে বাজারজাতকরণ করলে ভোক্তা নিরাপদ সবজি পায়। সব মিলিয়ে, আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব কৌশল অনুসরণ করে সোলানেসি পরিবারের সবজির নিরাপদ উৎপাদন কৃষির টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

সোলানেসি পরিবারের সবজি চাষে নিরাপদ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ: ধাপে ধাপে নির্দেশিকা



নিরাপদ বেগুন উৎপাদন কলাকৌশল

বেগুন (*Solanum melongena*) বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর সবজি, তবে অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ছে। তাই নিরাপদ বেগুন উৎপাদনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় অনুসরণ জরুরি। রোগ ও পোকা প্রতিরোধক্ষম উচ্চ ফলনশীল জাত যেমন বারি বেগুন-১০, বারি হাইব্রিড বেগুন-৪, ৬ এবং বারি বিটি বেগুন-৪ নির্বাচন করলে কীটনাশকের ব্যবহার কমে। জমি প্রস্তুতে পর্যাপ্ত জৈব সার ও বীজ শোধনের মাধ্যমে সুস্থ চারা উৎপাদন করতে হবে। ফল ছিদ্রকারী পোকা দমনে ফেরোমন ফাঁদ ও সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় ব্যবহার ও নিরাপদ সময় মেনে ফসল সংগ্রহ করলে নিরাপদ বেগুন উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব।

জলবায়ু: বেগুন একটি উষ্ণ মৌসুমের সবজি এবং শীতের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাপমাত্রা ১৭° সে-এর নিচে নেমে গেলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং নিম্ন তাপমাত্রায় ফুলের ডিম্বাশয়ের অস্বাভাবিক বিকাশের ফলে বিকৃত ফল দেখা যায়। বেগুনের ফল বৃদ্ধির জন্য ২০-৩০° সে তাপমাত্রা সর্বোত্তম। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য অত্যধিক হলে ফল ধারণ ও ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো বর্ষা ও গ্রীষ্ম মৌসুমে তুলনামূলকভাবে ভালো ফলন দেয়।

জমির অবস্থান: বেগুন চাষের জন্য উঁচু ও পানি নিষ্কাশনে সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করা জরুরি। জমিটি মহাসড়ক বা যানবাহন চলাচলকারী সড়ক থেকে অন্তত ৫০ মিটার দূরে হওয়া উচিত এবং কলকারখানার বর্জ্য নিষ্কাশন পথ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। জমির চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ নিরাপদ চাষাবাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মাটির গুণাগুণ: হালকা বেলে থেকে ভারী এঁটেল দোআঁশ মাটি পর্যন্ত সব মাটিতেই বেগুন জন্মানো যায়, তবে জৈব পদার্থসমৃদ্ধ পলি-দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। মাটি গভীর, উর্বর ও সুনিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং পিএইচ ৬.০-৭.০ এর মধ্যে থাকা উত্তম। উচ্চ পিএইচ জমিতে জৈব বা সবুজ সার প্রয়োগ করে চাষ উপযোগী করা যায়।

জমির নকশা বা লে আউট: জমির একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা তৈরি করে সারি, পিট ও ড্রেনের অবস্থান নির্ধারণ করা উচিত।

জাত নির্বাচন: জাত নির্বাচনে বিএআরআই ও অনুমোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নত ও বাজারচাহিদাসম্পন্ন জাত নির্বাচন করা প্রয়োজন।

বীজের হার: এক গ্রাম বেগুন বীজে প্রায় ২৫০টি বীজ থাকে। প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৭০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। বপনের আগে প্রোভেন্স বা কারবেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করলে রোগের ঝুঁকি কমে। শীতকালীন চাষে সেপ্টেম্বর এবং গ্রীষ্মকালীন চাষে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: উঁচু ও সুনিক্ষিপ্ত বীজতলায় বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে চারা পলিব্যাগ বা ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে। ২৫-৩০ দিন বয়সী সুস্থ চারা বিকেলে নির্ধারিত দূরত্বে রোপণ করে হালকা সেচ দিলে বেগুনের ভালো ফলন ও গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়।

সুষম সার ব্যবহার: মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বিএআরসি হতে প্রকাশিত সার সুপারিশমালা-২০২৪ এর সাথে সমন্বয় করে সারের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

বেগুন চাষে সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (কেজি/হেক্টর)

সার	পরিমাণ	রোপণের	চারা রোপণের	চারা রোপণের	চারা রোপণের	চারা রোপণের
		৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ	১৫-২০ দিন পর	৫০-৫৫ দিন পর	৯০-১০০ দিন পর	১২০-১৩০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	সব	-	-	-	-
ভার্মিকম্পোস্ট	২ টন	সব	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	-	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি
টিএসপি	৩০০ কেজি	সব	-	-	-	-
এমওপি	২৫০ কেজি	৭০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	-
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-	-
বোরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	৫ কেজি	সব	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫ কেজি	সব	-	-	-	-

নিরাপদ বেগুন উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

বেগুনের ভাল ও গুণগতমানসম্পন্ন ফলন নিশ্চিত করতে সঠিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা জরুরি। গাছের স্থায়িত্ব ও রোগবালাই প্রতিরোধে খুঁটি দেওয়া প্রয়োজন। বাঁশের খুঁটি কমপক্ষে ১ মিটার লম্বা হতে হবে এবং গাছকে পাটের সুতলিতে খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে। আগাছা নিয়ন্ত্রণে মালচ পলিথিন ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়। মালচ পলিথিন মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখে, আগাছা কমায় এবং সেচের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে। বেগুন চাষে ২৫ মাইক্রন পুরুত্ব ও ১.২ মিটার প্রস্থের মালচ পলিথিন ব্যবহার করা হয়। তবে চারা রোপণের আগে মালচ পলিথিনে ছিদ্র করেই লাগানো উচিত, কারণ আগেই পলিথিন বসালে চারাগুলো সূর্যের অতিরিক্ত তাপে নষ্ট হতে পারে। মালচ পলিথিন ছাড়া কোদাল বা নিড়ানি দিয়ে নিয়মিত আগাছা নিয়ন্ত্রণ করাই উত্তম। রাসায়নিক আগাছানাশক ব্যবহার এড়ানো উচিত।

গাছের পরিচর্যা প্রথম ফুলের নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। এতে গাছের শক্তি একটি কুশিতে কেন্দ্রীভূত হয়, যা ফলকে স্বাস্থ্যবান ও বড় করে। ফলবান গাছের উপরে পাখি থেকে রক্ষা করতে নেট ব্যবহার করা যেতে পারে। জমি ও গাছকে মানুষ, গবাদিপশু ও অন্যান্য প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চারপাশে বেড়া-নেট স্থাপন প্রয়োজন। সেচের ক্ষেত্রে, চারাগুলো রোপণের ৩-৪ দিনের মধ্যে হালকা সেচ দিতে হবে। এরপর প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর সেচ দেওয়া উচিত। বেগুন জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই বেডের দুপাশে ড্রেন বা নালা রাখা জরুরি। মাটির উপরিভাগের চাটা ভেঙে দিলে মাটিতে বাতাস চলাচল বাড়ে। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি প্রয়োগ করলে পানি সাশ্রয় হয় এবং জলাবদ্ধতা কমে। বেগুন চারা রোপণের ২.৫-৩ মাস পর থেকে ফলন সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত প্রতি ২-৩ দিনে বেগুন কাটা হয়। ফলনের পরিমাণ শীতকালে ৪০-৬০ টন/হেক্টর এবং গ্রীষ্মকালে ৩৫-৪০ টন/হেক্টর পর্যন্ত হয়।

ফল সংগ্রহের সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হয়। পরিপক্ব অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতি বেগুনের ডগা সাথে কেটে রাখতে হবে, যাতে ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। ফল সংগ্রহে ধারালো চাকু বা কাঁচি ব্যবহার করলে গাছ ও ফলের

ক্ষতি কম হয়। ফল সংগ্রহের জন্য ভোর বা বিকেল সময় সবচেয়ে উপযুক্ত, কারণ তাপমাত্রা কম থাকায় ফলের টার্গার বজায় থাকে। সংগ্রহের পর বেগুন ছায়াযুক্ত ও ঠাণ্ডা স্থানে রাখা উচিত, যেখানে ফল মাটির সংস্পর্শে না আসে। মাটির সংস্পর্শ রোধে ত্রিপল বিছিয়ে তার উপর বেগুন রাখা উত্তম। ছিদ্রযুক্ত পাস্টিক পাত্র বা বুড়ি ব্যবহার করলে বাতাস চলাচল বজায় থাকে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখতে ফলের ওপর ভেজা কাপড় দেওয়া যেতে পারে।

বাজারজাতকরণের আগে বেগুন ধুয়ে পরিষ্কার করে আকার ও গুণগতমান অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হয়। পচা, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভিন্ন রঙের ফল বেছে ফেলা উচিত। পুরো প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক, যাতে ফল শুষ্ক ও রোগমুক্ত থাকে। প্যাকেজিংয়ের সময় ত্রিপল বা পাস্টিক শিট ব্যবহার করলে গুণগতমান ভালো থাকে। সতর্কতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে বেগুন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করলে গুণমান উন্নত হয় এবং বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ ডগা ও ফলে ছিদ্র
- ❖ ভেতরে কীড়া অবস্থান
- ❖ ডগা শুকিয়ে যাওয়া, ফল পচা



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ আক্রান্ত ডগা ও ফল সপ্তাহে ১ দিন সংগ্রহ করে মাটির ১ ফুট নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ❖ চারা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ১০ মিটার দূরত্বে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন।
- ❖ জৈব বালাইনাশক: বায়োচমক ২.৫ মিলি/লি বা এন্টারিও ২.০ গ্রা./লি ১০ দিন পরপর ৩-৪ বার।
- ❖ স্পিনোসেড (ট্রেসার ০.৫ মিলি/লি বা সাকসেস ১.২ মিলি/লি) ফুল আসার সময় ২ সপ্তাহ অন্তর ৩-৪ বার।

শোষক পোকা (এফিড, সাদা মাছি, জ্যাসিড, প্রিপস, মিলিবাগ)

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতার রস শোষণ।
- ❖ পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া।
- ❖ পাতা কুঁকড়ে যাওয়া।
- ❖ গাছ দুর্বল হওয়া।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পরে ১৫-২০ মিটার দূরে হলুদ ও সাদা আঠালো ফাঁদ পর্যায়ক্রমে বসানো।
- ❖ ফাঁদ সপ্তাহে ১ বার পরিষ্কার ও ২ মাস অন্তর রং করা।
- ❖ জৈব বালাইনাশক: নিম তেল (৫-৭ মিলি/লি), সাবান পনি স্প্রে, হলুদ স্টিটি ট্র্যাপ, ডি-লিমোনিন ১ মিলি/লি বা ফিজিমাইট ১ মিলি/লি বা বায়োট্রিন ১.৫ মিলি/লি ৭-১০ দিন অন্তর ৩-৪ বার।

নিরাপদ স্নেহজি ও ফল উৎপাদন

- ✿ মিলিবাগে ফাইটোক্লিন ৮-১০ মিলি/লি।
- ✿ অজৈব বালাইনাশক: জৈব পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ না হলে প্রয়োজনে স্পিনোসেড, অ্যাসিটামিপ্রিড, ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের বালাইনাশক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা।

ডাম্পিং অফ / চারা ঢলে পড়া রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ✿ চারা হঠাৎ ঢলে পড়ে গোড়া পচে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ বীজতলায় কাঠের গুড়া পোড়ানো।
- ✿ সরিষার খৈল ২-২.৫ কেজি/বর্গমিটার ৩ সপ্তাহ আগে প্রয়োগ।



বেগুনের ব্যাকটেরিয়া ঢলে পড়া রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ✿ গাছ হঠাৎ ঢলে পড়ে শিকড় পচে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ প্রতিরোধী জাত (বারি বেগুন-৮, ১০)।
- ✿ গ্রাফটিং চারা ব্যবহার।
- ✿ শস্য পর্যায় (বাদাম, সরিষা, ভুট্টা)।
- ✿ স্টেবল ব্লিচিং পাউডার ২০ – ২৫ কেজি/হেক্টর।
- ✿ আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস ও জমি স্যাঁতস্যাঁতে না রাখা।



বেগুনের শিকড় গিট রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ✿ শিকড়ে গিট।
- ✿ গাছ খর্বাকৃতি।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ শস্য পর্যায় অনুসরণ।
- ✿ জমি পাবিত রাখা (সুযোগ থাকলে)।
- ✿ পাঁচ মুরগির বিষ্ঠা ৪-৫ টন/হেক্টর বা ট্রাইকো-কম্পোস্ট ২.৫ টন/হেক্টর।
- ✿ রাগবি ১০ জি ১৫-২০ কেজি/হেক্টর।



ফোমোপসিস ব্লাইট / ফল ও কাণ্ড পঁচা ও ফলে কালো দাগ রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ✿ ফল ও কাণ্ড পঁচা এবং ফলে কালো দাগ।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ সুস্থ বীজ ও চারা ব্যবহার।
- ✿ আক্রান্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলা।
- ✿ জৈব ছত্রাকনাশক: ফাইটোম্যাক্স/লাইকোম্যাক্স।
- ✿ কার্বেন্ডাজিম ১ গ্রা/লি বা প্রোপিকোনাজোল ০.৫ মিলি/লি ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার।



নিরাপদ টমেটো উৎপাদন কলাকৌশল

টমেটো (*Solanum lycopersicum*) একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি, যা পুষ্টিগুণ, বাজার চাহিদা ও কৃষকের আয়ের দিক থেকে জাতীয় সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল জাতের কারণে টমেটো চাষের বিস্তার ঘটলেও অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহার, মাটির উর্বরতা হ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার তারতম্য, রোগ-পোকামাকড়ের আক্রমণ এবং অপর্যাপ্ত সেচ ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনার ফলে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন টমেটো উৎপাদন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা শুধু ফলন কমায় না, খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের জন্যও ঝুঁকি সৃষ্টি করে। তাই ভোক্তা চাহিদা, রপ্তানি সম্ভাবনা ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপদ টমেটো উৎপাদন এখন সময়ের দাবি।

নিরাপদ টমেটো উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ

জমি নির্বাচন: নিরাপদ টমেটো উৎপাদনের জন্য উঁচু ও ভাল নিষ্কাশন ব্যবস্থা আছে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে, যা মহাসড়ক থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত। আলো-বাতাসযুক্ত দোঁআশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী এবং মাটির pH ৬-৭ হলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫° সে. ও রাতের তাপমাত্রা ২৩° সে. -এর নিচে থাকলে ফুল ও ফল ধারণ ভালো হয়।

জাত নির্বাচন: জাত নির্বাচনে বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাত যেমন বারি টমেটো-২, ১৪, ১৫, ১৭, ২১, ২২, ২৩ এবং বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, ৮ ও ১১ ব্যবহার করা যেতে পারে। পাশাপাশি বাজার চাহিদাসম্পন্ন বাণিজ্যিক হাইব্রিড জাতও চাষযোগ্য।

বীজের হার, শোধন ও বপন: প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। বীজ বপনের আগে কার্বোন্ধিন+থিরাম বা কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করা জরুরি। শীতকালীন চাষে অক্টোবর এবং গ্রীষ্মকালীন চাষে এপ্রিল মাস বপনের উপযুক্ত সময়। সুস্থ চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় নিয়মিত সেচ, ছায়া প্রদান ও রোগ দমন ব্যবস্থা নিতে হবে।

জমি তৈরি ও চারা উৎপাদন: সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য ৯-১০ গ্রাম পরিপক্ক ও রোগমুক্ত বীজ ৩ মি × ১ মি আকারের বীজতলায় ঘন করে বপন করতে হবে। এ হিসেবে প্রতি হেক্টরে প্রায় ২০০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা ৪ × ৪ সেমি দূরত্বে দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হবে। বীজতলায় দিনে ছায়া ও রাতে পলিথিন দিয়ে ঢেকে চারাকে রক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। জমি ৪-৫ বার চাষ করে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করে ৩০-৩৫ দিন বয়সী চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে বিকেলে রোপণ করে হালকা সেচ দিতে হবে।

নিরাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

চারা রোপণ: জমি ভালোভাবে চাষ করে উঁচু বেড তৈরি করে ৩০-৩৫ দিন বয়সী চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে বিকেলে রোপণ করা উত্তম।

সুষম সার ব্যবহার: মাটি পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী বিএআরসি হতে প্রকাশিত সার সুপারিশমালা-২০২৪ এর সাথে সমন্বয় করে সারের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।

সার	সারের পরিমাণ (হেক্টর প্রতি)	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	২০ দিন পর পর উপরি প্রয়োগ
কম্পোস্ট	৫.০ টন	সব	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	-	২৬০ কেজি (৪ বার)
টিএসপি	২২৫ কেজি	সব	-
এমওপি	২০০ কেজি	১০০ কেজি	১০০ কেজি (৪ বার)
জিপসাম	১৪০ কেজি	সব	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১২৫ কেজি	সব	-
দস্তা	২০ কেজি	সব	-
বোরাক্স/ বরিক এসিড	১৫ কেজি	সব	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় অর্থাৎ রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে সম্পূর্ণ গোবর ও ভার্মিকম্পোস্ট সার, টিএসপি, জিপসাম, বোরিক এসিড, জিংক সালফেট এবং ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং ১/২ ভাগ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর উলিখিত হারে ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

নিরাপদ টমেটো উপাদান ব্যবস্থাপনা

টমেটো গাছের ভালো ও গুণগত ফলন নিশ্চিত করতে খুঁটি দেওয়া প্রয়োজন। বাঁশের খুটির দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ৪ ফুট হতে হবে এবং গাছকে পাটের সূতলিতে খুঁটির সাথে বেঁধে রাখতে হবে। এতে গাছ ভারে হেলে পড়ে না এবং রোগ থেকে রক্ষা পায়। আগাছা নিয়ন্ত্রণ ও মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে মালচ পলিথিন ব্যবহার করা হয়। এটি আগাছা দমন খরচ কমায় এবং ফলন বৃদ্ধি করে। টমেটো চাষে ২৫ মাইক্রন পুরুত্ব ও ১.২ মিটার প্রস্থের মালচ পলিথিন ব্যবহৃত হয়। তবে মালচ পলিথিন আগে বসালে সূর্যের অতিরিক্ত তাপে চারা মারা যেতে পারে, তাই চারার দূরত্ব অনুযায়ী ছিদ্র করে বসানো উত্তম।

আগাছা দমনে নিড়ানি বা কোদাল ব্যবহৃত হয়। মালচ পলিথিন থাকলেও ডেনের আগাছা কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়। রাসায়নিক আগাছানাশক ব্যবহার এড়ানো উচিত। গাছের পরিচর্যায় প্রথম ফুলের গোছার নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হয়। এতে গাছের শক্তি এক কুশিতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। জমির চারপাশে বেড়া-নেট দেওয়া প্রয়োজন, যা মানুষ ও গবাদিপশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। পাখি থেকে রক্ষা করতে ফলবান গাছের ওপর নেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

চারা রোপণের ২-৩ মাস পর থেকে ফলন শুরু হয়। শীতকালে ৮০-৮৫ টন/হেক্টর এবং গ্রীষ্মে ৪৫-৫০ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়। ফল সংগ্রহে সতর্কতা প্রয়োজন। টমেটো লাল হওয়া শুরু করলে বোঁটাসহ ধারালো চাকু বা কাঁচি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, যাতে ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। সকাল বা বিকেলের ঠাণ্ডা সময়ে সংগ্রহ করা উত্তম, কারণ এতে টমেটোর দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং ফল ফোলা ও চকচকে থাকে।

সংগ্রহের পর টমেটো ছায়াযুক্ত, ঠাণ্ডা ও মাটির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। ত্রিপল বিছিয়ে টমেটো রাখা উত্তম, যা রোগ থেকে রক্ষা করে। পাস্টিকের ছিদ্রযুক্ত পাত্র বা বুড়িতে রাখলে বাতাস চলাচল বজায় থাকে। বাজারজাতকরণের আগে টমেটো ধুয়ে পরিষ্কার করে আকার ও গুণমান অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও ভিন্ন রঙের ফল বেছে ফেলা উচিত। পুরো প্রক্রিয়ায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা জরুরি। সতর্কতা ও সঠিক ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে টমেটোর গুণগত মান ও বাজার মূল্য উন্নত হয়। কৃষকদের এই ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে উৎপাদনের সফলতা বৃদ্ধি পাবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ ক্ষুদ্র কীড়া পাতার দুই পর্দার মাঝখানের সবুজ অংশ আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে খায়।
- ❖ আক্রান্ত অংশ স্বচ্ছ পর্দার মতো দেখায়।
- ❖ পাতা ফ্যাকাশে হয়, বয়স্ক পাতায় বাদামী ছোপ দেখা যায়।
- ❖ আক্রমণ বেশি হলে পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে ও ফলন কমে যায়।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- ❖ আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার।
- ❖ নিমতেল ৫ মি.লি. + ট্রিকস ৫ মিলি/লি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।।
- ❖ আক্রমণ তীব্র হলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ।

টমেটোর ফলছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ ফলে পুরাতন বা নতুন কালচে ছিদ্র।
- ❖ ছিদ্রে কীড়া, বিষ্ঠা ও পচা অংশ দেখা যায়।
- ❖ কীড়া ফলের ভেতরে ঢুকে খায়, আংশিক ক্ষতি করে।
- ❖ একটি কীড়া অনেকগুলো ফল নষ্ট করে।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ আক্রান্ত ও পাকা ফল হাত বাছাই করে নষ্ট করা।
- ❖ আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ১ কেজি/১০ লি পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ❖ সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার।
- ❖ আক্রমণ বেশি হলে সাইপারমেথ্রিন ৪০ ইসি ১ মি.লি./লি স্প্রে।

নাবী ধ্বসা / মড়ক রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতায় কালো পানিভেজা দাগ।
- ❖ পাতার নিচে সাদা ছত্রাকজালি দেখা যায়।



নিরাপদ সর্বাঙ্গি ও ফল উৎপাদন

- ❖ তুলার মতো আবরণ ও পোড়া গন্ধ।
- ❖ শেষ পর্যায়ে গাছ পুড়ে যাওয়ার মতো দেখায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ মেঘলা আবহাওয়া/কুয়াশা ৩-৪ দিন থাকলে রিডোমিল গোন্ড বা ম্যানকোজেব ২০ গ্রা/১০ লি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে
- ❖ প্রথম স্প্রে ৩ দিন পর দ্বিতীয় স্প্রে
- ❖ আক্রান্ত ফসল পুড়িয়ে ধ্বংস

হলুদ পাতা কুঁকড়ানো রোগ: সাদা মাছি এ রোগের বাহক।

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতার কিনারা থেকে মধ্যশিরার দিকে কুঁকড়ে যায়
- ❖ পাতা খসখসে ও হলুদ হয়ে যায়
- ❖ ডগায় ছোট ছোট পাতা গুচ্ছ আকারে হয়



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ রোগমুক্ত চারা ব্যবহার।
- ❖ সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত নাইলন নেট দিয়ে বীজতলা ঢেকে চারা উৎপাদন।
- ❖ চারা লাগানোর ১ সপ্তাহ পর থেকে ৭-১০ দিন অন্তর ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করে সাদা মাছি দমন।
- ❖ জমি আগাছামুক্ত রাখা।
- ❖ আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলা।
- ❖ ফল সংগ্রহের ২ সপ্তাহ আগে স্প্রে বন্ধ করতে হবে।

নিরাপদ মিষ্টি মরিচ উৎপাদন কলাকৌশল

মিষ্টি মরিচ (*Capsicum annuum*) বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় সবজি ফসল। এটি আকর্ষণীয় (সবুজ, হলুদ, লাল) রঙের এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে শহর ও শহরতলী এলাকায় মিষ্টি মরিচের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিষ্টি মরিচের নিরাপদ উৎপাদন প্রযুক্তি (Safe Production Technology) অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। মিষ্টি মরিচ ভিটামিন সি, ভিটামিন এ (বিটা ক্যারোটিন), ভিটামিন বি-৬, ভিটামিন কে, ফোলেট, পটাশিয়াম ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করে। কম ক্যালরিয়ুক্ত হওয়ায় এটি ডায়েট ফুড হিসেবেও জনপ্রিয়।

জমি নির্বাচন: মানসম্মত মিষ্টিমরিচ উৎপাদনের জন্য ১৬° - ২৫° সেঃ তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬° - ২১° সেঃ এর কম বা বেশী হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফুল বাঁরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা রোপন করলে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা কমে যায় ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

সুনিষ্কাশিত দোঁআশ বা বেলেদোঁআশ মাটি মিষ্টি মরিচ চাষের জন্য উত্তম। মিষ্টি মরিচ খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। মিষ্টি মরিচের জন্য মাটির pH ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বীজ বপনের সময়: অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়। তবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জীবন কাল: জাত ও মৌসুম ভেদে মিষ্টি মরিচের জীবনকাল ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বীজের মাত্রা: প্রতি এক গ্রাম বীজে গড়ে ১৫০টি বীজ থাকে। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন।

চারা উৎপাদন: সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০-১২ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকা ভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজন অনুসারে ঝাঝরি দিয়ে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৭-১০ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে পলি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পলি ব্যাগ বা পাস্টিক পটে চারা তৈরী করতে হয়। পলিব্যাগ বা পাস্টিক পটে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোষ্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি ক্ষতি করতে না পারে।

জমি তৈরী ও চারা রোপণ: ভাল ভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে যাতে জমিতে বড় বড় চাকা এবং আগাছা না থাকে। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরী করতে হবে। প্রতিটি বেড লম্বায় ৩ মিটার এবং প্রস্থে ১ মিটার হতে হবে। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৫০x৪০ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। দুটি সারির মাঝখানে ৩০ সেমি ড্রেন করতে হবে। চারা বিকেলবেলা রোপন করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। প্রতিদিন মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। যদি কোন চারা মারা যায় তাহলে ঐ জায়গায় গ্যাপ ফিলিং অর্থাৎ পুণরায় চারা রোপণ করতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশী থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষাবাদ

- ✿ উচ্চ গুণ সম্পন্ন মিষ্টিমরিচ উৎপাদন হয়।
- ✿ পোকা এবং রোগের আক্রমণ কম হয়।
- ✿ বেশ নিম্ন তাপমাত্রায়ও মিষ্টিমরিচ উৎপাদন সম্ভব।
- ✿ সাদা ঘন নেট দিয়ে ঢেকে মিষ্টিমরিচ উৎপাদন করতে হয়।
- ✿ নিম্ন তাপমাত্রায় ও রাতে (১৫° সেঃ এর নীচে) পলিথিন দিয়ে ঢেকে মিষ্টিমরিচ উৎপাদন করতে হয়।
- ✿ এ পদ্ধতি বাণিজ্যিকভাবে মিষ্টিমরিচ উৎপাদনে শহর ও শহরতলীর সবজি চাষীদের আত্মহীন করে তুলবে এবং মিষ্টিমরিচ চাষের বর্তমান সমস্যা দূর হবে।

সেচ প্রয়োগ: মিষ্টি মরিচ খরা ও জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

খুঁটি: কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে।

নির্যাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

আগাছা দমন: আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানী দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

ফলন: উওম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলেবারি মিষ্টিমরিচ-১ জাতে ১৫-২০ টন এবং বারি মিষ্টিমরিচ- ২ জাতে ২০-২৫ টন হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া সম্ভব।

জীবন কাল: জাত ও মৌসুম ভেদে মিষ্টি মরিচের জীবনকাল ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বীজ বপনের সময়: সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাস।

সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর প্রতি):

সার	পরিমাণ/ কেজি	রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ	চারা রোপণের ২০ দিন পর	চারা রোপণের ৪০ দিন পর	চারা রোপণের ৭০ দিন পর	চারা রোপণের ১০০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০০০০ কেজি	সব	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০ কেজি	-	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি
টিএসপি	২৫০ কেজি	সব	-	-	-	-
এমওপি	২৫০ কেজি	১০০ কেজি	৫০ কেজি	৫০ কেজি	৫০ কেজি	-
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-	-
বোরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	৫ কেজি	সব	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	৫ কেজি	সব	-	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: রোপণের ৭ দিন পূর্বে সম্পূর্ণ গোবর/ ভার্মিকম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, বোরিক এসিড, জিঙ্ক সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এবং ১০০ কেজি এম ও পি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকী ইউরিয়া এবং এমওপি সার চারা রোপণের ২০, ৪০, ৭০ এবং ১০০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

রস শোষক পোকা (এফিড)

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতা ও কচি ডগার রস শোষণ করে
- ❖ পাতা বিকৃত, কুঁকড়ে ও নিচের দিকে মোড়ানো
- ❖ মধুরস নিঃসরণে কালো ছত্রাক (সুটি মোল্ড) জন্মায়
- ❖ মেঘলা ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আক্রমণ বেশি



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও পোকা হাত দিয়ে নষ্ট করা
- ❖ নিম্ন বীজের নির্ধারিত (১ কেজি আধাভাঙা বীজ/১০ লি পানি, ১২ ঘন্টা ভিজানো) বা সাবান পানি স্প্রে
- ❖ লেডিবার্ড বিটল, সিরফিড ফ্লাই সংরক্ষণ
- ❖ আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মি.লি./লি বা ইমিডাক্লোপ্রিডি ১ গ্রা./লি স্প্রে

খিপস পোকা

পোকা খুব ছোট, খালি চোখে দেখা কঠিন।

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ ফুল ঝরে যায় ও ফল কম হয়
- ❖ ফলের গায়ে দাগ হয়
- ❖ পাতায় রূপালি/বাদামি দাগ
- ❖ পাতা উপরের দিকে কুঁকড়ে যায়



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ সাবান গুঁড়া ৫ গ্রা./লি পানিতে স্প্রে
- ❖ সাদা রঙের আঠালো ফাঁদ (৩০x৩০ সেমি) ব্যবহার
- ❖ নিম্ন বীজের নির্ধারিত স্প্রে
- ❖ আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মি.লি./লি

সাদা মাছি

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতায় হলুদ দাগ পড়ে ও আঠালো পদার্থ জমা হয়
- ❖ গাছের বৃদ্ধি কমে যায়
- ❖ ফল ছোট হয়
- ❖ সাদা মাছি (হোয়াইট ফ্লাই) ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

নিরাপদ সর্বাঙ্গি ও ফল উৎপাদন

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ সাবান পানি, নিম তেল ব্যবহার করা
- ❖ স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার
- ❖ প্রয়োজনে এসিটামিপ্রিড, থায়ামেথক্সাম গ্রুপের বালাইনাশক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা।

লাল মাকড় (মাইট)

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতায় হলুদ/বাদামি ছোট ছোট দাগ
- ❖ পাতা কুঁকড়ে যায় ও ঝরে পড়ে
- ❖ পাতার নিচে সূক্ষ্ম জাল ও ডিম দেখা যায়



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ নিমতেল ৫ মিলি + তরল ডিটারজেন্ট ৫ গ্রা/লি স্প্রে
- ❖ নিম বীজের নির্ধারিত স্প্রে
- ❖ ওমাইট/টেলস্টার জাতীয় মাকড়নাশক ২ মিলি/লি

অ্যানথ্রাকনোজ

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতায় ও ফলে কালো দাগ
- ❖ ফল পচে যায়
- ❖ আক্রান্ত ফলে বীজ অঙ্কুরোদগম হয় না



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ ব্যাভিস্টিন ২ গ্রা./লি পানিতে ১৫ দিন পরপর স্প্রে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার
- ❖ পাকা ফল দ্রুত সংগ্রহ
- ❖ বীজ শোধন করা

ব্লাইট রোগ

ক্ষতির লক্ষণ

- ❖ পাতায় দাগ
- ❖ পাতা ঝলসে যায়



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ ব্যাভিস্টিন ২ গ্রা./লি পানিতে ১৫ দিন পরপর স্প্রে
- ❖ সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার

উইল্ট (ঢলে পড়া রোগ)

ক্ষতির লক্ষণ: গাছ ধীরে ধীরে ঢলে পড়ে ও মারা যায়

দমন ব্যবস্থাপনা: জমিতে পানি জমতে না দেওয়া ও সঠিক নিকাশন ব্যবস্থা



সেচ প্রয়োগ

- ✿ জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে।
- ✿ আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ✿ ড্রিপ সেচ পদ্ধতি তে সেচ দিলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না, তদুপরি পানির প্রয়োজন ও কম হয়। অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচ পেপার ব্যবহার: গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও মাটির পানির সঠিক ব্যবহার করার জন্য মালচ পেপার ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করলে ফলনেও বৃদ্ধি ঘটে।

আগাছা দমন: নিড়ানী বা কোদাল দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হয়, তবে মালচ পেপার ব্যবহার করে আগাছা দমন এ খরচ কম হয়।

বিশেষ পরিচর্যা: ১ম ফুলের গোছার ঠিক নীচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

সোলালেসি পরিবারের সবজি উৎপাদনে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে সতর্কতা

- ✿ বেগুন/টমেটো/মিষ্টিমরিচ উৎপাদনে দেশের বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।
- ✿ দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ না করা। যদি একান্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কারিগরি সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।
- ✿ অনুমোদিত মাত্রার অধিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ না করা।
- ✿ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি (Pre-Harvest Interval) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ✿ প্রত্যেক ফসলের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের বিস্তারিত তথ্য যেমন-প্রয়োগের কারণ, স্থান, মাত্রা, পদ্ধতি, তারিখ ও প্রয়োগকারীর নাম সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✿ উৎপাদিত টমেটো বিক্রি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিকের MRL (Maximum Residue Limit) বা অবশিষ্টাংশের মাত্রা স্বীকৃত পরীক্ষাগার হতে (Accredited laboratory) নির্ণয় করতে হবে।
- ✿ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে দমন কৌশল নির্বাচন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে রাসায়নিক প্রয়োগ করে বালাই (Pest) এর বংশ বৃদ্ধি সীমিত রাখা।
- ✿ লেবেলে প্রদত্ত নির্দেশিকা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করে রাসায়নিক/বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ✿ যে সকল কৃষক/শ্রমিক/কর্মী রাসায়নিক হ্যান্ডলিং এবং প্রয়োগ করবে তাদেরকে উপযুক্ত পোশাক, মাস্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

নিরাপদ মরিচ উৎপাদন কলাকৌশল

ড. মোহাম্মদ নুরে ইউছুফ

মরিচ *Capsicum* গণভুক্ত Solanaceae পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী মসলা জাতীয় ফসল। যার ৩-৪ হাজার জাত রয়েছে। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দৈনন্দিন রান্নায় রং, রুচি ও স্বাদে ভিন্নতা আনার জন্য মরিচ একটি অপরিহার্য উপাদান। বাংলাদেশে মরিচের আবাদি জমির পরিমাণ ১.৪২ লক্ষ হেক্টর, বার্ষিক উৎপাদন ১.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০২৫)। মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও মরিচে পুষ্টির প্রায় সব উপাদান উলেখযোগ্য পরিমাণে বিদ্যমান। নিরাপদ মরিচ উৎপাদন বলতে এমন পদ্ধতিতে মরিচ চাষ করাকে বোঝায়, যেখানে পরিবেশ, কৃষক ও ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে এবং ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মরিচ উৎপাদন করা হয়। নিরাপদ মরিচ উৎপাদনের মূল ভিত্তি হলো উন্নত বীজ ব্যবহার, সুষম সার প্রয়োগ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, অনুমোদিত বালাইনাশকের সঠিক ব্যবহার এবং ফসল সংগ্রহের আগে অপেক্ষাকাল মেনে চলা। এসব কলাকৌশল অনুসরণ করলে উচ্চ ফলনের পাশা-পাশি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মরিচ উৎপাদন সম্ভব।

পুষ্টিমান: পুষ্টিমানে কাঁচা মরিচ ভিটামিন এ ও ভিটামিন সি সমৃদ্ধ। প্রতি ১০০ গ্রাম কাঁচা মরিচে-আমিষ ২-৩ গ্রাম, শ্বেতসার ৬ গ্রাম, তৈল ০.৬ গ্রাম, আঁশ ৭ গ্রাম, ভিটামিন এ- ১০০-২০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি- ২০-২৮০ মাইক্রোগ্রাম, আয়রন ২-৩ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম-১৫০-১৭০ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০-২০০০০ আই ইউ, পানি ৫০-৬০গ্রাম এবং খাদ্য শক্তি-২৫০-৩০০কিলোক্যালরি রয়েছে। অন্যদিকে প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনা মরিচে-আমিষ ১৫-১৬ গ্রাম, শ্বেতসার ৩১-৩৫ গ্রাম, তৈল ৬-৭ গ্রাম, আঁশ ১০-১৫ গ্রাম, ভিটামিন এ- ৩৩০-৩৪৫ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন সি- ১০-১০০মাইক্রোগ্রাম, আয়রন ৩-৫ মিলিগ্রাম, ক্যালসিয়াম-১৬০-২০০মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০-২০০০০ আই ইউ, পানি ১০-১২গ্রাম এবং খাদ্য শক্তি-২০০-২৫০কিলোক্যালরি রয়েছে।

বাংলাদেশে দুই ধরনের মরিচ চাষ করা হয়

দেশে মরিচের ৩০টি বন্য প্রজাতির মধ্যে ৫টি প্রজাতির মরিচ চাষাবাদ করা হয়। যেমন-

Capsicum annuum যেমন- bell peppers, paprika

Capsicum chinense যেমন- cayenne, jalapeños, and the chiltepin

Capsicum frutescens যেমন- habanero, Datil, Scotch bonnet

Capsicum pubescens যেমন- Rocoto

Capsicum baccatum যেমন- Aji lemon

❀ কেপসাইসিন নামক রাসায়নিক পদার্থের জন্য মরিচ ঝাঁঝালো হয়।

❀ কেপসানথিন নামক একটি রঞ্জক পদার্থের জন্য মরিচ উজ্জল ও লাল বর্ণের হয়।

জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে বারি মরিচ-১ ও বারি মরিচ- ২, (গ্রীষ্মকালীন), বারি মরিচ-৩, বারি মরিচ-৪ ও বারি মরিচ-৫ (শীতকালীন) এবং বারি মরিচ-৬ (গ্রীষ্মকালীন) নামে ৬টি জাত মুক্তায়িত হয়েছে। নতুন উন্নত মুক্তায়িত জাত এবং অন্যান্য দেশী জাতগুলোর মান খুব ভাল। স্থানীয় জাতগুলোর মধ্যে বালিঝুড়ি, বিন্দু, ইরি মরিচ, মিঠা মরিচ, বাওয়া, তরনী, দিঘলা, টেস্কাখালি, হলেন্দার, গোলমরিচ, আলমডাঙ্গা মরিচ, মাঠউবদা, হালদা ইত্যাদি। জনপ্রিয় বানিজ্যিক জাত: বিজলী, উক্কা, সনিক, ধুম, কোবরা ইত্যাদি। নিম্নে বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাতসমূহের পরিচিতি বর্ণনা করা হলো।

বারি মরিচ-১

এ জাতটি সারা বছর চাষের উপযোগী। উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেমি। গাঢ় ঘন সবুজ পাতায় পরিবেষ্টিত। গাছ ঝোপালো হওয়ায় বাহির থেকে কাঁচা মরিচ দেখা যায় না। তাই অনিষ্টকারী পাখির উপদ্রব কম হয়। প্রতি গাছে ৭০০-৭৫০ টি মরিচ ধরে। কাঁচা মরিচ লম্বায় ৫.৫-৬.৫ সে.মি. এবং ব্যাসে ২.৫-৩.৫ সেমি। মরিচের ত্বক পুরু। মরিচ পাকা অবস্থায় চকচকে লাল। কাঁচা এবং পাকা মরিচের বাল সহনশীল। প্রতিটি পাকা মরিচে ৭০-৭৫টি বীজ থাকে। প্রতি হেক্টর জমিতে ১০-১২ টন কাঁচা মরিচ এবং ২.৫-৩ টন শুকনা মরিচ উৎপাদন হয়।



বারি মরিচ-১

বারি মরিচ-২

এই জাতটির গাছ লম্বা ও ঝোপালো। এর উচ্চতা ৮০-১১০ সে মিঃ। গাছের পাতার রং হালকা সবুজ। এটি প্রধানত গ্রীষ্মকালে চাষ হয়ে থাকে। জাতটিতে পোকা মাকড়ের আক্রমণ তুলনামূলক ভাবে কম। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় লাল রং এর হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী থাকে। এ জাতের মরিচের জীবনকাল ২৪০ দিন (মার্চ -অক্টোবর), প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৭টি, প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৫০-৫০০টি (ওজন ১১০০ গ্রাম), প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ৭.০-৭.৫ সেঃ মিঃ ও ওজন ২.৫ গ্রাম, ১০০০ বীজের ওজন ৪.৫ গ্রাম। হেক্টর প্রতি কাঁচা মরিচের ফলন ২০-২২ টন। এই জাতের মরিচ কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল।



বারি মরিচ-২

বারি মরিচ-৩

এটি প্রধানত শীতকালীন জাত। গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সে.মি। গাছের পাতার রং সবুজ। গাছ মাঝারি ধরনের বোপালো এবং শাখাযুক্ত। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পরিপক্ব অবস্থায় উজ্জল, চকচকে এবং লাল রং বিশিষ্ট। প্রতি গাছে পাকা মরিচের সংখ্যা ৬০-৭০টি (ওজন ১৮০ - ২০০ গ্রাম), প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১২ সেঃ মিঃ ও ওজন ৩ গ্রাম, ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। পাকা অবস্থায় জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৮-১০ টন।



বারি মরিচ-৩

বারি মরিচ-৪

এটি শীতকালে চাষ উপযোগী জাত। এটি চরাঞ্চলের মরিচ এবং চরাঞ্চল সহ সারা দেশে ইহা ব্যাপকভাবে চাষ করার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ লম্বায় ৮০-১০০ সেমি এবং পাতার রং সবুজ। মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১২ সেমি ও ব্যাস ১.২-১.৪ সেমি, ওজন গড়ে ১.৮-২.০ গ্রাম। প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৮০-৫২০টি এবং ওজন ১২০০-১৪০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়। কচি অবস্থায় ফল সবুজ রঙের এবং পাকা অবস্থায় চকচকে লাল রঙের হয়। এই জাতটি মাঠে ১৩০-১৫০দিন পর্যন্ত (নভেম্বর- মার্চ) থাকে। জাতটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ফলন ১৮-২০ টন/হে. (পাকা মরিচ)। পাকা ও শুকনা মরিচের অনুপাত ১ঃ৪।



বারি মরিচ-৪

বারি মরিচ-৫

এটি শীতকালে চাষ উপযোগী জাত। এটি চরাঞ্চলের মরিচ এবং চরাঞ্চল সহ সারা দেশে ইহা ব্যাপকভাবে চাষ করার সম্ভাবনা রয়েছে। গাছ লম্বায় ৮০-১১০ সেমি এবং পাতার রং সবুজ। মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সেমি ও ব্যাস ১.২-১.৫ সেমি, ওজন গড়ে ২.০-২.৫ গ্রাম। প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৫০-৫০০টি পর্যন্ত হয়। কচি অবস্থায় ফল সবুজ রঙের এবং পাকা অবস্থায় চকচকে লাল রঙের হয়। এই



বারি মরিচ-৫

জাতটি মাঠে ১৪০-১৬০দিন পর্যন্ত (অক্টোবর- মার্চ) থাকে। জাতটিতে রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম হয়। ফলন ১৫-১৬ টন/হে. (পাকা মরিচ)। পাকা ও শুকনা মরিচের অনুপাত ১ঃ৪।

বারি মরিচ-৬

এটি সারাবছর চাষ উপযোগী জাত। গাছ লম্বায় ৭০-১০০ সেমি এবং পাতার রং সবুজ। মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১২ সেমি ও ব্যাস ১.২-১.৫ সেমি, ওজন গড়ে ১.৮-২.০ গ্রাম। প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ৪৫০-৫০০টি পর্যন্ত হয়। কচি অবস্থায় ফল সবুজ রঙ্গের এবং পাকা অবস্থায় চকচকে লাল রঙের হয়। এই জাতটি মাঠে ১৫০-২৩০দিন পর্যন্ত থাকে। জাতটিতে রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম হয়। ফলন ১১-১৩ টন/হে. (পাকা মরিচ)। পাকা ও শুকনা মরিচের অনুপাত ১ঃ৩.৫।



বারি মরিচ-৬

জলবায়ু: প্রচুর আলো-বাতাস পাওয়া যায় ও পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়, এমন স্থানে মরিচ ভালো হয়। মরিচের জন্য আদর্শ তাপমাত্রা হলো ২১-২৯° সে., বীজগুলি কেবল উষ্ণ অবস্থায় প্রায় ২১°সে. হলেই অঙ্কুরিত হয়। বৃদ্ধিও পর্যায় ১২°সে. নিচে এবং ৩৫° সে. উপরে তাপমাত্রা গেলে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। ফুল ফোটার সাথে আলোক সংবেদনশীলতার কোন সম্পর্ক নেই। তবে তাপমাত্রা ৩০°সে. এর উপরে হলে পরাগায়ন হয়না, ফুল ঝরে যায় এবং ফল ধরে না। ফসল উত্তোলন, শুকানো ও সংরক্ষণের জন্য উষ্ণ-শুষ্ক পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন।

মাটি: সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁ-আশ থেকে এটেল দোঁ-আশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোঁ-আশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। সব মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ফলন ভালো হয় না। মাটির পিএইচ ৬.০ থেকে ৭.০ হলে মরিচের উৎপাদন ভালো হয়। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারী ও উঁচু ভিত্তি সুনিষ্কাশনের যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগষ্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে জো-অবস্থা আসে সেখানে মরিচ ভাল হয়।

উৎপাদন মৌসুম

❀ রবি মৌসুম: বীজ বপনের সময় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

❀ খরিপ মৌসুম: বীজ বপনের সময় ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারী

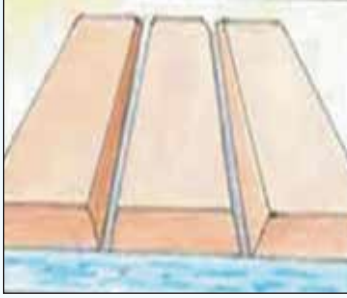
রোপন পদ্ধতি: আমাদের দেশে দুইভাবে জমিতে মরিচ লাগানো হয়- ১. সরাসরি বীজ বপন ২. বীজতলায় চারা তৈরী করে পরে জমিতে রোপন। সরাসরি বীজবপনের ক্ষেত্রে জমি ভালো ভাবে চাষ ও মই দিয়ে সমান করে, নিষ্কাশনের জন্য নালা করে বীজ গুলি জমিতে চিটিয়ে দেওয়া হয়। চারা উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রথমে বীজতলা তৈরি করতে হয়।

নিরাপদ চারা উৎপাদন: উঁচু বীজতলায় চারা উৎপাদন করতে হবে। বীজতলা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনে সীডলিং ট্রে বা প্রো-ট্রে ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর চারা উৎপাদ করা যায়।

বীজতলা তৈরি: উত্তর ও দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বিভাবে ৩মি. দৈর্ঘ্যের ও ১মি. প্রস্থ বা দৈর্ঘ্য পরিমানমত ও ১৫-২০ সেমি উচ্চতার বীজ তলা তৈরি করতে হয়। প্রত্যেকটি বীজতলায় চারিদিকে যাতায়াত ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ৫০ সেঃ মিঃ চওড়া নালা রাখা দরকার, এতে বীজতলায় চারার পরিচর্যা সহজ হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে প্রয়োজনীয় চারা

নিরাপদ সসজ্জি ও ফল উৎপাদন

উৎপাদনের জন্য ৩৬১ মি আকারের ২০-২৫ টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলার মাটির উপর ব্রুকপার মিশিয়ে বা ৩-৪ সেমিটমিটার ধানের খড়ের স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে মাটি শোধন করতে হবে। অথবা স্ট্যাবল ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়। এছাড়া বীজতলা পলিথিন দিয়ে ১০-১৫ দিন ঢেকে রেখেও মাটি শোধন করা যায়। বীজতলার উপরের মাটিতে বালি ও ৩-৫ বুড়ি পচা গোবর দিয়ে ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে, আগাছা বেছে মাটি ঝুরঝুরে করা হয়।



বীজতলায় চারা উৎপাদন

নিরাপদ উন্নত ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার: প্রত্যয়িত ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাত নির্বাচন করতে হবে।

নিরাপদ বীজ শোধন: বীজ বপনের আগে ট্রাইকোডার্মা ৪-১০ গ্রাম প্রতি কেজিতে ব্যবহার করা বা অনুমোদিত জৈব বা নিরাপদ বীজ শোধন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। বপনের পূর্বে অটোস্টিন বা ভিটামিন বা ক্যাপটান (২ গ্রাম/কেজি বীজ) দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।



বীজ শোধন ও ফলিয়ার স্প্রে ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক

বীজ হার

- ❖ ছিটিয়ে বপন করলে ২.৫-৩.০ কেজি/হেঃ
- ❖ চারা উৎপাদন করে ১.০-১.৫ কেজি/হেঃ

বীজতলায় বীজ বপন: মাটির লেভেল হতে ১ সেমি গভীরে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর বীজতলায় বীজ যাতে পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। ৫-৭ দিনের মধ্যে বীজ গজানোর পর চারা ৩-৪ সেমি লম্বা হলে অতিরিক্ত চারা পাতলা করতে হবে।

চারার পরিচর্যা: বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। চারা তৈরী হলে ইনসেক্ট প্রুফ নেট দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। বীজ বুন্যর পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত নেটের উপর ঝরনা দিয়ে সেচ দেয়া আবশ্যিক। বীজতলায় আগাছা গজালে ১-২ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা বেছে মাটি আলগা করে দিলে চারা ভাল হয়। চারা তোলায় আগের দিন বীজতলায় সেচ দিলে মাটি নরম হয়। এতে শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজেই চারা তোলা যায় এবং চারা

সহজেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। খাট, মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা লাগানোর জন্য ভাল। চারা রোপন মুহূর্তে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে মাটিতে সহজে গাছ নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে পারে।

নার্সারী ট্রে ও পলিথিন ব্যাগে নিরাপদ চারা উৎপাদন: নার্সারী ট্রে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি আর পলিথিন ব্যাগ স্বল্প খরচে সহজ চারা উৎপাদন পদ্ধতি।

নার্সারী ট্রে চারা উৎপাদন: নার্সারী ট্রেতে সেলের সংখ্যা ৫০-১০৪টি পর্যন্ত থাকে, সেলে কোকোপিট বা বুরবুও মাটি ও জৈবসার ভর্তি করা হয়। প্রতি সেলে ১-২ টি বীজ ১ সে.মি. গভীরে বপন করা হয় এবং হালকা সেচ দিতে হয়। ট্রে হালকা ছায়া যুক্ত স্থানে রাখা হয় প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য হালকাভাবে পানি দিতে হবে।



নার্সারী ট্রে চারা উৎপাদন

পলিথিনে ব্যাগে চারা উৎপাদন: ছোট পরিসরে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ছিদ্রযুক্ত ছোট পলিথিন ব্যাগে মাটি, বালি ও পচা গোবর ২:১:১ অনুপাতে ভর্তি করে, প্রতি ব্যাগে ১-২টি বীজ বপন করতে হবে। পলিথিন ব্যাগ হালকা ছায়া যুক্ত স্থানে রাখা হয় প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য হালকাভাবে পানি দিতে হবে।



পলিথিনে ব্যাগে চারা উৎপাদন

জমি চাষ ও ভিটি তৈরী: মাটির প্রকারভেদে জমিতে প্রয়োজন সংখ্যক চাষ ও মই দিতে হয়। প্রথম চাষে জমি গভীর ভাবে চাষ হওয়া দরকার। শেষ চাষের সময় সুপারিশকৃত মাত্রায় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। জমিতে ১ মিটার প্রশস্ত ও লম্বায় জমির অবস্থান মতো ভিটি তৈরী করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রত্যেক ভিটি অন্তত ২০ সেমি উঁচু হবে ও দুই ভিটির মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে। প্রত্যেক ভিটির উভয় পার্শ্ব হতে ৩০ সেমি জায়গা খালি থাকবে। প্রত্যেক ভিটায় দুই সারি চারা লাগানোর পর উভয় পার্শ্ব ২৫ সেমি জায়গা খালি থাকবে। ভিটিতে পলিথিন মাল্চ ব্যবহার করে মরিচ উৎপাদন করলে সহজে আগাছা দমন সহ মৃত্তিকা বাহিত রোগ-বালাই দমন করা এবং আর্দ্রতাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

নিরাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

সুষম সার ব্যবস্থাপনা: মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। বৈ সার ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করা যাবে না। রাসায়নিক সারের জৈব সার সমন্বিতভাবে ব্যবহার করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসাবে প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর/কম্পোষ্ট	১০ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২১০ কেজি	-	৭০	৭০	৭০
টিএসপি	৩৩০ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	-	৪৫	৪৫	৪৫
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
জিংক সালফেট	১২কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	১০কেজি	সব	-	-	-

চারারোপন দূরত্ব: খরিপ মৌসুম ৫০'৫০ সেমি দূরত্বে এবং রবি মৌসুম ৪০'৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপন করতে হবে।



ভিটিতে চারা রোপন

হরমোন প্রয়োগ: প্যানোফিক্স নামে এক প্রকার হরমোন প্রয়োগে দেখা গেছে মরিচের ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। এক মিলিলিটার প্যানোফিক্স ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুল আসলে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০০ লিটার মিশ্রণের প্রয়োজন হয়।

আন্তঃপরিচর্যা

আগাছা দমন: নিরাপদ মরিচ উৎপাদনে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করতে হবে। নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিস্কার ও মাটি বুঁদবুঁদ করতে হয়। মালচিং ব্যবহার করলে আগাছা কম জন্মায় এবং মাটির আর্দ্রতা বজায় থাকে।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা: মরিচের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য শুষ্ক মৌসুমে সেচের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ড্রিপ সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করলে পানি সাশ্রয় ও রোগের আক্রমণ কম হয়। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। সেচের প্রয়োজনীয়তা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে।

চটা ভেঙ্গে দেওয়া: বৃষ্টি বা সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা যায়। এই চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে শিকড় প্রয়োজনীয় আলো ও বাতাস পায়। এতে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হওয়ার সাথে সাথে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

খুঁটি দেওয়া: ফলের ভারে মরিচ গাছ যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য খুঁটি দিতে হবে।



মরিচ গাছে খুঁটি দেওয়া

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা

রোগ ও পোকা-মাকড় দমনে নিরাপদ পদ্ধতি: নিয়মিত ক্ষেত পরিদর্শন করতে হবে। জৈব ও যান্ত্রিক দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উপকারী পোকা সংরক্ষণ করতে হবে। ফসল পর্যাক্রম অনুসরণ করতে হবে, হলুদ আঠালো ফাঁদ ও সেক্স ফেরোমোন ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত পাতা বা গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। জৈব বালাইনাশক ও বায়োপেস্টিসাইড বা উপকারী জীবাণু ব্যবহার করতে হবে। যা নিরাপদ মরিচ উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। একান্ত প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির মাত্রা অতিক্রম করলে

শুধুমাত্র অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। সুপারিশকৃত মাত্রা মেনে চলতে হবে; কোনভাবেই অনেকগুলো বালাইনাশক ককটেল আকারে প্রয়োগ করা অনুচিত। এতে কৃষকের আর্থিক ক্ষতির পাশা-পাশি পরিবেশের ক্ষতি এবং জীবাণু পোকার বিষের বিপক্ষে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে ফলে বালাইদমন করা যায় না। একই গ্রুপের বালাই নাশক বারবার ব্যবহার না করে পালাক্রমে ব্যবহার করতে হবে। ফসল তোলায় আগে লেবেলে উল্লেখিত মাত্রা ও নির্ধারিত অপেক্ষাকাল অবশ্যই মানতে হবে। স্প্রে করা সময় গ্লাভস, মাস্ক ও সুরক্ষা পোশাক ব্যবহার করতে হবে। বাতাসের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে স্প্রে করা যাবে না। সকাল বা বিকেলে স্প্রে করতে হবে। খালি বোতল বা প্যাকেট জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

বহুল ব্যবহৃত বালাইনাশকের নিরাপদ অপেক্ষাকাল

- ✿ এবামেকটিন বেনজোয়েট ৫% এসজি শেষ স্প্রে ৩ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়
- ✿ মেটাল্যাথ্রিল + ম্যানকোজেব শেষ স্প্রে ৭-১৪ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়
- ✿ ইমিডাক্লোপ্রিড শেষ স্প্রে ৭ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়
- ✿ কপার ছত্রাক নাশক শেষ স্প্রে ৭-১৪ দিন পর মরিচ সংগ্রহ করা যায়

নিরাপদ বীজ উৎপাদন: মরিচ স্ব-পরাগায়িত ফসল। শতকরা ৯০ ভাগ মরিচে স্ব-পরাগায়িত হয়ে থাকে। তবে কিছু কিছু জাতে স্ব-পরাগায়ন হতে পারে। মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হলে বীজ ফসল আলাদা করে লাগাতে হবে। মরিচের নিরাপদ অন্ডতঃ ৪০০ মিটার হতে হবে। স্ব-পরাগায়নের জন্য সাদা পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ফুল পরাগধানী বিদারনের আগেই ঢেকে দিতে হবে। পরিপক্ক, পুষ্ট এবং উজ্জল লাল রং-এর মরিচ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সাধারণত একটি মরিচে ৭০-৭৫টি বীজ থাকে এবং ১০০০টি বীজের ওজন প্রায় ৫গ্রাম। বীজ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অনুসরণ করলে প্রতি হেক্টরে ২০০-২৫০কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

ফসল সংগ্রহ: নিরাপদ মরিচ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিপক্ক মরিচ সংগ্রহ করতে হবে। স্প্রে করার পর অপেক্ষাকাল পূর্ণ না হলে মরিচ সংগ্রহ করা যাবে না। মরিচ কাঁচা অথবা পাকা অবস্থায় তোলা হয়। সংগ্রহকৃত মরিচ অবশ্যই পরিষ্কার পাত্রে রাখতে হবে। মরিচ চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরতে শুরু করে, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল ধরে ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে আরম্ভ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সংগৃহীত ফসল কাচা মরিচ হিসাবে গণ্য করা হয়। পরের মরিচ পাকা (লাল রং) হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। সবুজ, চকচকে, মসৃন ত্বক এবং মাঝারি ঝাঁঝের কাঁচা মরিচের গ্রহণযোগ্যতা বেশী। অন্যদিকে লম্বা, উজ্জল লাল বর্ণ, চকচকে, পাতলা মসৃন ত্বক এবং বেশী ঝাঁঝ পাকা মরিচ (যা পরবর্তীতে শুকানো হয়) মসলা হিসাবে অধিক জনপ্রিয়। মরিচের ফুল ফোটা, ফল ধরা, রং ধারণ ইত্যাদি তাপমাত্রা, মাটির উর্বরতা এবং ভালো জাতের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ তাপমাত্রায় ফল তাড়াতাড়ি পাকে এবং ঠান্ডায় পাকতে দেরী হয়। অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করলে এর স্বাভাবিক উৎপাদন কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। মরিচ সাধারণত ৩-৮ পর্যায়ে তুলতে হয়। কাঁচা ফল বড় ও পুষ্ট দেখে তুলতে হয়। প্রতি সপ্তাহে পাকা ফল সংগ্রহ করা যায়। শুকনা মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রং ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়। ফলগুলো সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত, এবং শুকনো জায়গায় ২৮০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করলে ১-২ সপ্তাহে কোন ক্ষতি হয় না।



সংগ্রহের উপযোগি পাকা ফল

সংগ্রহভোর ব্যবস্থাপনা: নিরাপদ মরিচ উৎপাদনে সংগ্রহভোর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিষ্কার স্থানে মরিচ বাছাই ও সংরক্ষণ করতে হবে। পঁচা ও রোগাক্রান্ত মরিচ আলাদা করতে হবে। শুকনা মরিচ তৈরির ক্ষেত্রে পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে শুকাতে হবে।

শুকানো: পাকা মরিচ শক্ত মাটির উপরে বা পাকা মেঝে বা টিনের চালে অথবা পাকা বাড়ীর ছাদে ৫-৮ সেন্টিমিটার পুরু করে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকানো হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি সূর্যের আলো মরিচের “ওয়াইট প্যাচ” সৃষ্টি করে যা মরিচের গুণগত

মান নষ্ট করে। সাধারণত: ২২-২৫° সে. তাপমাত্রা মরিচ শুকানোর জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সব মরিচের রং সমভাবে ঠিক রেখে শুকানোর জন্য এবং যাতে মোল্ড/ছত্রাক জন্মাতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝেই রৌদ্রের মধ্যে মরিচ নেড়ে দিতে হবে। ভালভাবে না শুকালে মরিচের রং, বাঁধা এবং চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ভাল বীজ, উচ্চ



ট্রেতে এবং ড্রায়ারে মরিচ শুকানো

অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, উজ্জ্বল রং ও উন্নত পুষ্টিমান, অনুজীবের আক্রমণ এবং আফলাটক্সিন এর হাত হতে মরিচকে রক্ষার জন্য শুকানো মরিচের আর্দ্রতা ৮-১০% মধ্যে রাখতে হবে। শুকানোর সময় রোগে আক্রান্ত এবং রং নষ্ট হয়ে যাওয়া মরিচ বেছে ফেলে দিতে হবে। সাধারণত ১০০ কেজি কাঁচা মরিচ শুকিয়ে ২৫-৩৫ কেজি (১ কেজি পাকা মরিচ শুকালে ২৫০-৩০০গ্রাম) শুকানো মরিচ পাওয়া যায়। সোলার ড্রায়ার এর সাহায্যেও মরিচ শুকানো যায়। ৮ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হার্ডবোর্ড, কাচ ও তারের জাল দিয়ে দুই স্তরের বিশিষ্ট সোলার ড্রায়ার তৈরী করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মরিচ শুকানো যায়। এতে মরিচের রং ভাল থাকে।

সংরক্ষণ: কাঁচা মরিচ ০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৯৫-৯৮% আর্দ্রতায় ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আবার ৭-১০° সে. তাপমাত্রা ও ৯০-৯৫% আর্দ্রতায় ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। দুরবর্তী স্থানে কাঁচা মরিচ পরিবহনের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত

বাঁশের ঝুড়ি এবং ছালার ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠান্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে। ৬ মাস হতে এক বছর সময় পর্যন্ত মরিচ সংরক্ষণের জন্য টিনের পাত্র, পলিথিন ব্যাগ, মাটির পাত্র, ডুলি এবং ছালার ব্যাগ ব্যবহার করা যায়।



মরিচ সংরক্ষণ

তবে দ্বিস্তরের বিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ও টিনের পাত্রের মধ্যে পলিথিন দিয়ে তার ভিতর মরিচ রাখলে মরিচের রং গুণগত মান খুব ভাল থাকে। সংরক্ষিত মরিচ মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিলে ভাল থাকে। মরিচ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মরিচের বোটা যেন মরিচ থেকে পৃথক না হয়ে যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বোটা মরিচ থেকে পৃথক হয়ে গেলে মরিচের বীজ মরিচের পড হতে পড়ে যায়। ফলে মরিচের ওজন ও বাঁধা দুইই কমে যায়।

নিরাপদ স্ববর্জি ও ফল উৎপাদন

মরিচ উৎপাদনের সমস্যা: শীতকালীন মরিচ চাষে উপযুক্ত জমির সংকট। কেননা উক্ত মৌসুমে বেশীর ভাগ জমি ভুট্টা, আলু, সবজি ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বলে মরিচের আওতায় জমি বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। মরিচ চাষে উচ্চ ফলনশীল জাত অভাব। মানসম্পন্ন বীজের অভাব। উৎপাদন প্রযুক্তির অভাব। রোগ, পোকা-মাকড় ও আগাছা।

রোগ বালাই সমস্যা

ঢলে পড়া রোগ: *Fusarium oxysporum f.sp. capsici* নামক ছত্রাকের আক্রমণে মরিচের এই রোগ হয়ে থাকে।

- ✿ ছোট চারাতে এ রোগ হতে পারে।
- ✿ এ রোগে ৩-৭ দিনে আক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন গোড়া কালো হয়ে পচে যায়।
- ✿ গাছ ঢলে পড়ে ও মরে যায়।

দমন

- ✿ বীজ শোধন করে জমিতে লাগাতে হবে।
- ✿ প্রাথমিক অবস্থায় দুই গ্রাম রিডোমিল এম. জেড-৭২ এক লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার বীজতলার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় বা জমিতে ট্রাইকোডার্মা ৪-১০গ্রাম/কেজি বীজ বা ২-৫ কেজি জমিতে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস ২-৫ মিরি বা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ৫-১০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে এই সমস্ত বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে।
- ✿ বাড়ন্ত গাছে এই রোগ দেখা দিলে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম অটোস্টিন/ব্যাভিষ্টিন/ক্যাপটান গুলে আক্রান্ত গাছের গোড়ার মাটিতে দিতে হবে।



ঢলে পড়া রোগ

ফল পচা/ফুট রট রোগ: (*Collectotrichum capsici* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে)

- ✿ বীজের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়।
- ✿ ফুল আসার সময় আলাদা আলাদাভাবে ফুলে আক্রমণ করে এবং শুকিয়ে যায়।
- ✿ আক্রান্ত স্থান থেকে কান্ডেও ছড়ায়।
- ✿ আক্রান্ত কান্ডের বাকল প্রথমে বাদামী রং ধারণ করে পরে উজ্জল সাদা হয়।

দমন

- ❖ বীজ শোধন করে লাগাতে হবে। বীজতলায় বা জমিতে ট্রাইকোডার্মা ৪-১০গ্রাম/কেজি বীজ বা ২-৫ কেজি জমিতে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস ২-৫ মিরি বা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ৫-১০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে এই সমস্ত বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম অটোস্টিন/প্রোভেক্স দিয়ে শোধন করতে হবে।
- ❖ প্রথমে ২-১ টা গাছে লক্ষন দেখা দিলে সেগুলো জমি থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- ❖ প্রতি আক্রান্ত গাছে টিল্ট-২৫ইসি (০.০৫%) / অটোস্টিন (০.১%) বা নোইন(০.২%) ১লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।



ফল পঁচা/ফুট রট রোগ

মরিচের চোয়ানিফোরা রোগ (Choanephora blight of chilli): চোয়ানিফোরা (*Choanephora* sp.) নামক ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী। এই রোগে চারা ও বয়স্ক গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল ও ফল আক্রান্ত হয়।

দমন

- ❖ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে এমন জমিতে মরিচের চাষ করা।
- ❖ মরিচে ক্ষেতে অতিরিক্ত সেচ না দেয়া।
- ❖ সুস্থ ও সবল গাছ হতে মরিচের বীজ সংগ্রহ করা।
- ❖ বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম অটোস্টিন/প্রোভেক্স দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।
- ❖ বীজতলায় বা জমিতে ট্রাইকোডার্মা ৪-১০গ্রাম/কেজি বীজ বা ২-৫ কেজি জমিতে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস ২-৫ মিরি বা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ৫-১০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে এই সমস্ত বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে।



চোয়ানিফোরা রোগ

- ❖ আক্রান্ত গাছে এমিস্টার টপ (০.১%) অথবা অটোস্টিন (০.১৫%) অথবা রিডোমিল গোল্ড (০.২%) মরিচ গাছে রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই ১০ দিন পর পর ৪ বার গাছে স্প্রে করলে মরিচের চোয়ানিফোরা রোগ দমন হয় ও ফলন বৃদ্ধি পায়

ব্যাকটেরিয়াল লিফস্পট রোগ (*Xanthomonas vesicatoria*)

- ✿ প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপরে বাদামী রং এর দাগ পড়ে।
- ✿ আক্রান্ত পাতায় রোগ বেশী হলে পাতা হলুদ রং ধারণ করে ও ঝরে পড়ে।
- ✿ কান্ডে আক্রান্ত হলে চলে পড়ে।



ব্যাকটেরিয়াল লিফস্পট রোগ

দমন: প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ স্প্রে করতে হবে।

ফসল চক্র

- ✿ মাটি বাহিত রোগের প্রতি মরিচ অত্যন্ত সংবেদনশীল।
- ✿ বীজতলায় বা জমিতে ট্রাইকোডার্মা ৪-১০গ্রাম/কেজি বীজ বা ২-৫ কেজি জমিতে, ব্যাসিলাস সাবটিলিস ২-৫ মিরি বা গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স ৫-১০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে এই সমস্ত বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে।
- ✿ এই জন্য একই জমিতে বছরে একবারের বেশি মরিচ বা সোলানেসী পরিবারভুক্ত কোন ফসল করা উচিত নয়।
- ✿ বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে

পোকামাকড়: মরিচ চাষে পোকামাকড়ের উপদ্রব রোগের চেয়ে বেশী

থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা (*Thrips palmi/Scirtothrips dorsalis*)

- ✿ গাছের যে কোন অবস্থায় এ পোকাকার আক্রমণ হয়।
- ✿ তবে ফুল ফোটার সময়ই বেশী ক্ষতি করে।
- ✿ এই পোকা পাতার রস চুষে খায়।
- ✿ ফলে পাতা কুকে যায়।
- ✿ আক্রান্ত গাছ বা পাতা তামাটে রং ধারণ করে।

দমন

নীল বা হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার, আক্রান্ত পাতা অপসারণ এবং সমন্বিত ব্যালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। অ্যাজাডির্যাকটিন ২-৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে, বিউভারিয়া ব্যাসিয়ানা ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, মেটোরাইজিয়াম অ্যানিসোপ্লি ২-৫ গ্রাম বা



চিত্র : থ্রিপস/চুঙ্গি পোকা আক্রান্ত গাছ

মিলি প্রতি লিটার পানিতে, লেকানিসিলিয়াম ৩-৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে। অধিক আক্রান্ত ক্ষেত্রে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি স্পিনোসাইড/টাফগড়/ইমিটাফ মিশিয়ে স্প্রে করলে দমন করা যায়।

মাকড়/মাইটস (*Polyphagotarsonemus latus*)

- ✿ আক্রান্ত পাতা কুকড়ে নিচের দিকে নেতিয়ে পড়ে।
- ✿ পোকা কচি পাতায়ও আক্রমণ করে।
- ✿ আক্রান্ত গাছ গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে।
- ✿ আক্রান্ত গাছের দৈহিক বৃদ্ধি কমে যায়।
- ✿ ফুল উৎপাদন বাধা প্রাপ্ত হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।



চিত্র : মাকড়/মাইটস আক্রান্ত গাছ

দমন

আক্রান্ত পাতা অপসারণ এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। অ্যাজাডির্যাকটিন ২-৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে, বিউভারিয়া ব্যাসিয়ানা ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, মেটরাইজিয়াম অ্যানিসোপ্লি ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, লেকানিসিলিয়াম ৩-৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে। অধিক আক্রান্ত ক্ষেত্রে ভার্টমেক/ওমাইট/অ্যামেকটিন @ ২ মিলিলিটার/লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

জাব পোকা/এফিড (*Aphis gossypii/Myzus persicae*)

- ✿ পোকা গাছের কান্ড ও পাতার নিচে আক্রমণ করে।
- ✿ ফলে গাছের আকার ও বৃদ্ধি কমে যায়।
- ✿ মিষ্টি আঠালো পদার্থ নিঃসরণ করে ফলে পিপড়া আক্রমণ করে ও সুটি মোল্ড হয়।
- ✿ সুটি মোল্ড এর কারণে ফল কাল রং ধারণ করে এবং ফলে বাজার মূল্য কমে যায়।
- ✿ এফিড এর আক্রমণে ফলন কমে যায় এবং ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।



চিত্র : জাব পোকা/এফিড আক্রান্ত গাছ

দমন

হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার, আক্রান্ত পাতা অপসারণ এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে। অ্যাজাডির্যাকটিন, বিউভারিয়া ব্যাসিয়ানা, মেটরাইজিয়াম অ্যানিসোপ্লি, লেকানিসিলিয়াম, ব্যাসিলাস

থুরিনজিয়েনসিস বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে। অ্যাজাডির্যাকটিন ২-৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে, বিউভারিয়া ব্যাসিয়ানা ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, মেটারাইজিয়াম অ্যানিসোপ্লি ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, লেকানিসিলিয়াম ৩-৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে। অধিক আক্রান্ত ক্ষেত্রে টাফগড়/মেটাসিসটক্স ১ চা চামচ ৫ লিটার পানির সংগে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ১০ দিন পরপর ঔষধ পরিবর্তন করে স্প্রে করলে এফিড বৃদ্ধি দমন করা যায়। উপকারী পোকা যখন দেখা যাবে তখন স্প্রে করা যাবে না।

ফল ছিদ্রকারী পোকা (*Helicoverpa armigera* Hubner, পরিবার: *Noctuidae*, বর্গ : *Lepidoptera*)

- ✿ এই পোকা কচি ও বাড়ুন্ডু ফল ছেদ করে ভিতরে ঢুকে ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে। ফলে মরিচ বাড়তে পারে না এবং আকৃতি নষ্ট হয়, বাঁঝা থাকে না ও বাজার দর কম হয়।

দমন

- ✿ মরিচের ফুল আসার আগে জমিতে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (প্রতি বিঘায় ১৫টি) ব্যবহার করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা। জমি পরিষ্কার রাখা এবং আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।



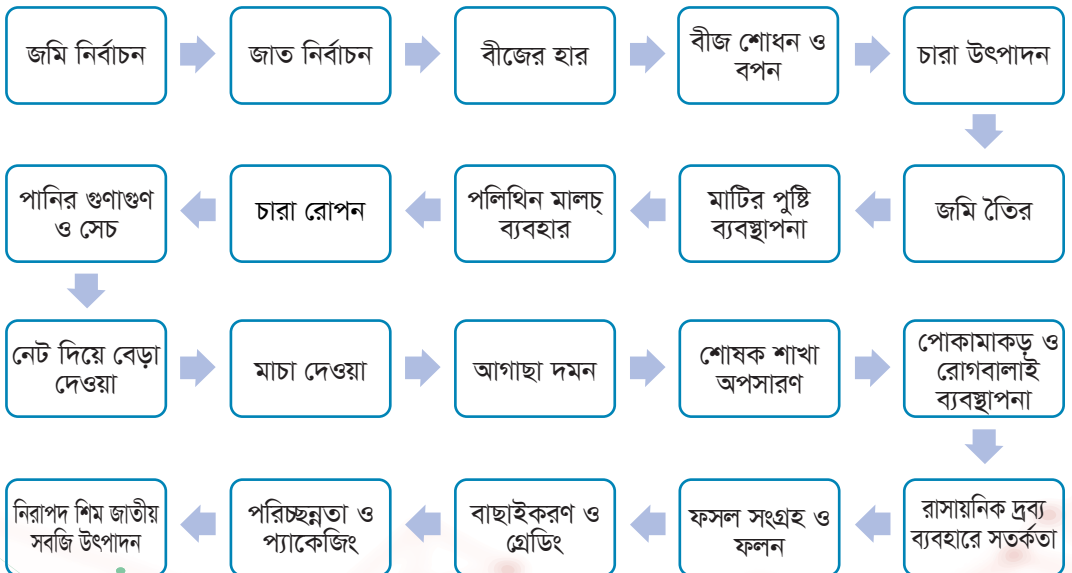
চিত্র : ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত গাছ

- ✿ অ্যাজাডির্যাকটিন ২-৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে, বিউভারিয়া ব্যাসিয়ানা ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, মেটারাইজিয়াম অ্যানিসোপ্লি ২-৫ গ্রাম বা মিলি প্রতি লিটার পানিতে, লেকানিসিলিয়াম ৩-৫ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে, ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে বায়োপেস্টি সাইড ব্যবহার প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণ তীব্র হলে সাকসেস ২.৫ ইসি অথবা প্রোক্লেম ৫ জি অথবা করলাক্স ২৫ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। ঔষধের মাত্রা বেশী হলে ফুল বাড়ে পড়ে।

নিরাপদ শিম জাতীয় সবজি উৎপাদন কলাকৌশল

ড. মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম

শিম জাতীয় সবজি, যেমন শিম, বরবটি, ঝাড়শিম এবং মটরগুঁটি, বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি ও জনস্বাস্থ্যে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই শস্যগুলি কেবল পুষ্টির উৎস হিসেবেই নয়, বরং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কৃষকের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনতেও সহায়ক। প্রথমত, এই শস্যগুলি হলো প্রোটিনের শক্তিশালী উৎস। সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য, মাছ-মাংসের মতো ব্যয়বহুল প্রোটিনের বিকল্প হিসেবে এই ডাল জাতীয় শস্যগুলি দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা মেটায়। মটরগুঁটি এবং বরবটিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ (যেমন ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, আয়রন) থাকে, যা অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এই শস্যগুলি মাটির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এগুলো লিগিউম গোত্রের উদ্ভিদ, যা এদের মূলে থাকা রাইজোবিয়াম (Rhizobium) ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে মাটিতে যুক্ত করে। এর ফলে জমিতে রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন এর ঘাটতি) প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়, যা একদিকে কৃষকের উৎপাদন খরচ কমায়ে এবং অন্যদিকে মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ দূষণ কমাতে সহায়তা করে। তৃতীয়ত, কৃষকের জন্য এটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। শিম জাতীয় শস্য দ্রুত বর্ধনশীল এবং একই জমিতে অন্যান্য ফসলের (যেমন আলু, সরিষা) সাথে সফলভাবে চাষ করা যায় (আন্তঃফসল বা Intercropping)। এর ফলে কৃষক একই জমিতে একাধিক ফসল থেকে আয় করতে পারে এবং ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। মটরগুঁটির মতো ফসল শীতকালে পতিত জমিতেও চাষ করা যায়, যা জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। চতুর্থত, নিরাপদ বা বিষমুক্ত উৎপাদন বর্তমান সময়ে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস করে জৈব বা নিরাপদ পদ্ধতিতে এই শস্য উৎপাদন করা হলে তা খাদ্যনিরাপত্তাকে আরও সুসংহত করে এবং ভোক্তাদের কাছে স্বাস্থ্যকর সবজি সরবরাহ নিশ্চিত করে। সব মিলিয়ে, নিরাপদ শিম, বরবটি, ঝাড়শিম ও মটরগুঁটি উৎপাদন কেবল খাদ্য নিরাপত্তা বা পুষ্টি সরবরাহ নয়, বরং এটি টেকসই কৃষি ব্যবস্থা, পরিবেশ সুরক্ষা এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নেও এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই শস্যগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি ও নিরাপদ চাষের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিকে যেমন পুষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে কৃষক ও মাটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে।



নিরাপদ শিম জাতীয় সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিতাত্ত্বিক বিষয়সমূহ

জমি নির্বাচন: শিম জাতীয় সবজি (বরবটি, ঝাড়শিম ও মটরশুঁটি) উৎপাদনের সফলতা নির্ভর করে সঠিক জমি নির্বাচন, উপযুক্ত মাটি ও অনুকূল আবহাওয়ার ওপর। জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো উঁচু বা মাঝারি উঁচু এমন স্থান নির্বাচন করা যেখানে বৃষ্টি বা সেচের পানি জমে না এবং পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে, যা রোগবালাই কমিয়ে ভালো ফলন নিশ্চিত করে। এই ফসলগুলির জন্য দোঁআশ ও বেলে-দোঁআশ মাটি সর্বোত্তম, কারণ এই মাটির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো এবং বায়ু চলাচল স্বাভাবিক থাকে; একই সাথে, এতে পর্যাপ্ত জৈব পদার্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। মাটির পিএইচ মান ৫.৫ থেকে ৭.০ এর মধ্যে থাকলে ফলন ভালো হয়। আবহাওয়া ভিন্ন হলেও মটরশুঁটি প্রধানত শীতল আবহাওয়া (১০ থেকে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পছন্দ করে, যেখানে বরবটি ও শিম উষ্ণ ও আদ্র আবহাওয়া (২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) এবং প্রচুর সূর্যালোক পেলে সবচেয়ে ভালো জন্মায়। সামগ্রিকভাবে, সুনিষ্কাশিত, উর্বর মাটি এবং ফসলের প্রকার অনুযায়ী অনুকূল তাপমাত্রা নিশ্চিত করাই হলো সফল উৎপাদনের ভিত্তি।

জাত নির্বাচন

শিমের জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক জাত নির্বাচন করা। তবে কৃষকরা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা আছে এমন জাতও চাষ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্যাবদ্ধ করে নিতে হবে। বিএআরআই উদ্ভাবিত উন্নত জাত যেমন: শীতকালীন জাত বারি শিম-১, ৫ ও ৬; গ্রীষ্মকালীন জাত বারি শিম-৭ এবং খাইস্যা বা শুধু বীজ খাওয়ার জন্য জাত বারি শিম-৮, ৯ ও ১০ ইত্যাদি। বাংলাদেশে জনপ্রিয় কোম্পানীর জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে সিম জরি (ইউনাইটেড সীড), নলডগ (লাল তীর সীড লিমিটেড), কেরালা কিং (মোমিন সীড কোম্পানী); স্থানীয় জাতসমূহ অটোশিম ও পার্পল (ঈশ্বরদী লোকাল) ইত্যাদি।

বরবটির জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত জাত বারি বরবটি-১ (লতানো জাত) ও বারি বরবটি-২ (খাটো জাত)। কোম্পানির বরবটির বিভিন্ন জাত, যেমন- মালিক সীড কোম্পানির আনন্দ (খাটো জাত), লাল তীর কোম্পানির টোকি এবং ইউনাইটেড সীড কোম্পানির ইউনাইটেড ৫৭০ (হাইব্রিড, মোটা ও লম্বা)।

ঝাড়শিমের জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত জাত বারি ঝাড়শিম-১ (খাটো জাত) ও বারি ঝাড়শিম-২ (খাটো জাত), বারি ঝাড়শিম-৩ (লতানো জাত), বারি ঝাড়শিম-৪ (লতানো জাত)।

মটরশুঁটির জাত: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত জাত বারি মটরশুঁটি-১, বারি মটরশুঁটি-২ ও বারি মটরশুঁটি-৩।

বীজের হার, শোধন ও বপন: শিমের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি এবং প্রতি শতকে ৩০ গ্রাম; বরবটির জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি এবং প্রতি শতকে ৪০ গ্রাম, ঝাড়শিমের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৭০-৭৫ কেজি এবং প্রতি শতকে ২৮০-৩০০ গ্রাম এবং মটরশুঁটির ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৭৫-৮০ কেজি এবং প্রতি শতকে ৩০০-৩২৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ বা চারার সংখ্যা অনেকাংশেই জমিতে বীজ বা চারার রোপন দূরত্বের উপর নির্ভর করে। আবার রোপণ দূরত্ব নির্ভর করে জাত ও মাটির উর্বরতার উপর। বীজ শোধনের জন্য বহুল ব্যবহৃত কার্বোক্সিন + থিরাম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রোভেক্স যা প্রতি কেজি বীজের জন্য ২-৩ গ্রাম প্রয়োজন হয়। এছাড়া কারবেন্ডাজিম গ্রুপ এর ছত্রাকনাশকও সমমাত্রায় ব্যবহার করা যায়। শিম জাতীয় সবজির জন্য বীজ বপনের সময় মৌসুমভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, শীতকালীন চাষের জন্য শিমের বীজ বপনের উত্তম সময় হলো আগস্ট মাস আর ঝাড়শিম ও মটরশুঁটির

উপযুক্ত সময় হলো অক্টোবর-নভেম্বর মাস এবং গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য মার্চ হতে আগস্ট মাসের যে কোন সময় চাষ করা যায়। বরবটি গ্রীষ্মকালীন সবজি এর উপযুক্ত সময় হলো মার্চ-এপ্রিল মাস।

চারা উৎপাদন: শিম বীজ সরাসরি মাদায় বপন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় ২-৩ টি বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর একের অধিক গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া পলিব্যাগে ৭-১০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে মাঠে রোপণ করা যায়। বরবটি, ঝাড়শিম ও মটরশুটির বীজ সরাসরি গর্তে বপন করা হয়, এক্ষেত্রে প্রতি গর্তে ২ করে বীজ বপন করতে হবে। বপনের ১০ দিন পর প্রতি গর্তে একটি সুস্থ চারা রেখে বাকীগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। পাখি কিংবা পোকা মাকড় যাতে অংকুরিত বীজ খেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চারার যত্ন: বীজতলায় চারাগুলোকে প্রথর সূর্যালোক হতে রক্ষা করার জন্য দিনে নাইলন নেট ও বাশের চাটাই দিয়ে ছায়া দিতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে এবং ড্যাম্পিং অফ রোগ হতে বাচানোর জন্য কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজিব গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করতে হবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: জমি চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। শিম চাষের জন্য বেডের প্রস্থ হবে ২.০ মিটার এবং দু-বেডের মাঝে ৫০ সেমি নালা থাকবে। দুই মিটার প্রস্থ বেডের দুই পাশে ২৫ সেমি রেখে ১.৫ মিটার পরপর মাদা তৈরি করতে হবে। মাদায় বীজ বপন বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে প্রস্তুত করে নিতে হবে। প্রতিটি মাদার আয়তন হবে $80 \times 80 \times 80$ সেমি। মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে ‘জো’ এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

বরবটি: বরবটি চাষের জন্য বেডের প্রস্থ হবে ১.০ মিটার এবং দু-বেডের মাঝে ৫০ সেমি নালা থাকবে। দুই মিটার প্রস্থ বেডের দুই পাশে ২০ সেমি রেখে ৬০ সেমি লাইন দূরত্ব ও ৩০ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করতে হবে।

ঝাড়শিম: এক্ষেত্রে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে সারি করে ১০-১৫ সেমি দূরে একটি বা দুটি করে বীজ বপন করতে হবে, আবার লতানো জাতের সারি হতে সারির দূরত্ব হবে ৪০ সেমি।

মটরশুটি: প্রতিটি বেডে ৪০-৫০ সেমি সারির দূরত্ব হতে হবে ১৫-২০ দূরে দূরে বীজ বপন করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি গর্তে ২ টি করে বীজ বপন করতে হবে। চারা গজানোর পর একের অধিক গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে। পাখি কিংবা পোকা মাকড় যাতে অংকুরিত বীজ খেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সার এবং মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

- ✿ শিম জাতীয় সবজি আবাদের ক্ষেত্রে এবং মাটির উপযোগের সাথে সম্পর্কিত রাসায়নিক ও জৈবিক ঝুঁকি নির্ধারণ করা।
- ✿ মাটি বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে ফসলের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী সার এবং মাটির উপযোগ (Additives) প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে, যাতে প্রবাহ (Run off) অথবা লিচিং এর মাধ্যমে পুষ্টির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়।
- ✿ শিম জাতীয় সবজি উৎপাদনে ভারী ধাতব পদার্থের দূষণ কমানোর জন্য উপযুক্ত সার ও মাটির উপযোগ নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করতে হবে।
- ✿ জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শস্য আবর্তন অনুসরণ করে খামারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

সুখম সার প্রয়োগ:

কমোপাস্ট বা সার	শিম (প্রতি হেক্টরে)	বরবটি (প্রতি হেক্টরে)	ঝাড়শিম (প্রতি হেক্টরে)	মটরশুটি (প্রতি হেক্টরে)
কমোপাস্ট	৫ টন	৫ টন	৫ টন	৫ টন
ইউরিয়া	১০০ কেজি	৮৫ কেজি	১৩০ কেজি	৭৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	১০০ কেজি	১৫০ কেজি	৯০ কেজি
এমওপি	১৪০ কেজি	৯০ কেজি	১২০ কেজি	৮৫ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	১১০ কেজি	৭০ কেজি	৯০ কেজি
জিংক সালফেট	১৮ কেজি	১৪ কেজি	১৪ কেজি	১৪ কেজি
বোরণ	১৫ কেজি	১২ কেজি	১২ কেজি	১২ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

জমি তৈরির সময় অর্থাৎ রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে সম্পূর্ণ কম্পোস্ট বা ভার্মিকম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং ১/২ ভাগ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর উলিখিত হারে ইউরিয়া ও বাকী এমওপি সার ৪ বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনা

নেট দিয়ে বেড়া দেওয়াঃ ফসলের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য জমির চারদিকে নাইলন নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে, এতে ফসলকে গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির আক্রমণ হতে রক্ষা করা যাবে। এরপর প্রয়োজনে জমি ও ফসলের তথ্য সম্বলিত এটি সাইনবোর্ড দিতে হবে।

পলিথিন মালচ ব্যবহার: শিম জাতীয় ফসলের জন্য পলিথিন মালচ ব্যবহার করা ভালো কারণ এটি আগাছা জন্মাতে দেয় না, মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি বা আর্দ্রতা ধরে রাখে, মাটির তাপমাত্রা ঠিক রাখে এবং মাঠে শ্রমিক সংখ্যা কম লাগে।

মাচা দেওয়া: শিম জাতীয় ফসলের অন্যতম প্রধান পরিচর্যা হলো বাউনি ও মাচা দেয়া। চারা লম্বায় ২০-২৫ সেমি হলেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি ও বাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। বাউনি দেয়ার জন্য বাঁশ ও বাঁশের কঞ্চি ব্যবহার করা উত্তম। বাউনি ও মাচা দিলে বেশি ফলন ও ফলের গুণগত মান ভালো হয়।

আগাছা দমন: সময় মতো নিড়ানি দিয়ে আগাছা সবসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। জমির পানি নিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেড ও নিকাশ নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে। নিয়মিত আগাছা দমন করলে রোগ ও পোকাকার আক্রমণ কম হয় ও ফসলের গুণগত মান ভালো হয়।

বিশেষ পরিচর্যা: গাছের গোড়ার দিকে যে শাখা থাকে তা শোষক শাখা। শোষক শাখা হতে কোন ফলন হয় না বরং পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। শোষক শাখা অপসারণের ফলে রোগ বালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ কম হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সহজ হয়।

পানির গুণাগুণ ও সেচ:

- ❀ সেচ কার্যে ব্যবহৃত পানি ক্ষতিকর সংক্রমণ বা দূষণমুক্ত হতে হবে।
- ❀ অনাকাঙ্ক্ষিত কোন উৎস যেমন: শহরের বর্জ্য স্থাপনা, হাসপাতাল, শিল্প ও ডাম্পিং বর্জ্য ইত্যাদির পানি কৃষি জমিতে ব্যবহার এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বিপণন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- ❀ ফসলের প্রকারভেদে পানির প্রাপ্যতা এবং মাটির আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে সেচ প্রদান করতে হবে।

সেচের সময় সূচি:

শুরু মৌসুমে ৭ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিতে হবে। পানির অভাব হলে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এ লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া, পরবর্তীকালে ফুল বারা, পড়ের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও বারে যাওয়া ইত্যাদি। শিমের বীজ উৎপাদনের সময় খেয়াল রাখতে হবে শিম পরিপক্ব হওয়া শুরু হলে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে আবাদের ক্ষেত্রে জুন-জুলাই মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেড ও নিকাশ নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।



--

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: ভোর বা বিকেল অর্থাৎ দিনের ঠাণ্ডা সময়ে ফসল সংগ্রহ করা উচিত, কারণ এতে ফসলের স্বাভাবিক রসালোভাব বজায় থাকে এবং ক্ষতির সম্ভাবনা কম থাকে।

শিম: শী ফুলের পরাগায়ণের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শিম খাওয়ার উপযুক্ত হয়। কচি ও খাওয়ার উপযোগী পুষ্ট অবস্থায় ৫-৭ দিন পর পর শিম সংগ্রহ করতে হয়। ফসল সংগ্রহ একবার শুরু হলে তা দুই হতে আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন (৬০-৮০ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

বরবটি: চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর বরবটি সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহ করার সময় বরবটি উজ্জ্বল, সবুজ ও রসালো হবে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-১৭ টন (৬৫-৭০ কেজি/শতাংশ) হয়ে থাকে।

ঝাড়শিম: এটি একটি স্বল্প মেয়াদি ফসল, ঝোপালো জাতের বপনের ৪০-৫০ দিন ও লতানো জাতের ৬-৭০ দিন পর ফুল আসে। ফুল আসার ৭-১০ দিন পর গুটি সংগ্রহ করা যায়। ঝোপালো জাতে জাতভেদে প্রতি গাছে ২০-২৫ টি ও লতানো জাতে ২৫-৩০ টি গুটি পাওয়া যায়। কাঁচা গুটি প্রতি হেক্টরে ১৫-২০ টন (৬০-৮০ কেজি/শতাংশ) এবং বীজের ফলন ২-৩ টন (৭-১০ কেজি/ শতাংশ) হয়ে থাকে।

মটরগুটি: বীজ বপনের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে গুটি সংগ্রহ করা যায় আগাম জাত ৪৫-৫০ দিনে সবুজ গুটি সংগ্রহ উপযোগী হয়। মৌসুমে প্রতি গাছে ২০-২৫ টি এবং আগাম জাতে ৭-১০ টি সবুজ গুটি পাওয়া যায়। হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন (৪০-৪৫ কেজি/শতাংশ) সবুজ গুটি উৎপন্ন হয়। পরিপক্ব মটরগুটির বীজ শুকিয়ে পরবর্তীতে ডাল হিসেবে খাওয়া যায়।

বাছাইকরণ ও গ্রেডিং: সংগ্রহের পর রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, অধিক পরিপক্ব ও নষ্ট পডগুলোকে বাছাই করতে হবে যাতে ভাল পডগুলোর সংস্পর্শে না আসে। এরপর আকার, আকৃতি এবং গুণগতমান অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হবে। সোজা, নরম, দাগবিহীন পডগুলোকে উন্নত মানের হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

পরিচ্ছন্নতা ও প্যাকেজিং: প্যাকেজিং এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফসলের ওপর যেন চাপ না পড়ে এবং যথেষ্ট বায়ু চলাচল করতে পারে। সাধারণত ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিকের ক্রেট অথবা কার্টুন বক্সে সাদা লাইনার কাগজ বিছিয়ে প্যাকিং করা হয় যাতে পণ্যগুলো ভালো থাকে। প্লাস্টিকের ক্রেট অথবা কার্টুন বক্সেও মুখ ভালোভাবে আটকাতে হবে।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারে সতর্কতা

- ❖ শিম জাতীয় সবজি উৎপাদনে দেশের বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নিবন্ধিত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ করা যাবে না। যদি একাত্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কারিগরি সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।
- ❖ অনুমোদিত মাত্রার অধিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ না করা।
- ❖ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি (Pre-Harvest Interval) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ❖ প্রত্যেক ফসলের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের বিস্তারিত তথ্য যেমন-প্রয়োগের কারণ, স্থান, মাত্রা, পদ্ধতি, তারিখ ও প্রয়োগকারীর নাম সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ উৎপাদিত শিম জাতীয় সবজি বিক্রি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কোন রাসায়নিকের MRL (Maximum Residue Limit) বা অবশিষ্টাংশের মাত্রা স্বীকৃত পরীক্ষাগার হতে (Accredited laboratorz) নির্ণয় করতে হবে।
- ❖ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে দমন কৌশল নির্বাচন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে রাসায়নিক প্রয়োগ করে বালাই (Pest) এর বংশ বৃদ্ধি সীমিত রাখা।
- ❖ লেবেলে প্রদত্ত নির্দেশিকা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করে রাসায়নিক/বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ যে সকল কৃষক/শ্রমিক/কর্মী রাসায়নিক হ্যান্ডলিং এবং প্রয়োগ করবে তাদেরকে উপযুক্ত পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

জাব পোকা

ক্ষতির লক্ষন

- ❖ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক জাব পোকা দলবদ্ধ ভাবে গাছের পাতার রস চুষে খেয়ে থাকে। ফলে পাতা বিকৃত হয়ে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও প্রায়শ: নীচের দিকে কোঁকড়ানো দেখা যায়।
- ❖ মেঘলা, কুয়াশাচ্ছন্ন এবং ঠান্ডা আবহাওয়ায় এদের বংশ বৃদ্ধি বেশী হয়। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হলে এদের সংখ্যা কমে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়।
- ❖ নিম বীজের দ্রবন (১ কেজী পরিমাণ অর্ধভাঙ্গা নিম বীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) বা সাবান গুলা পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ চা চামচ গুড়া সাবান মেশাতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকাকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।

- ❖ হলুদ আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করলে এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।
- ❖ স্বল্পমোদী বিষক্রিয়া সম্পন্ন জৈব বালাইনাশক, যেমন- ফাইটোম্যাক্স (এজাডিরেকটিন) প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।



পড ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

ডিম থেকে বের হয়ে আসা কীড়া ফুল, ফুলের কুঁড়ি, কচি পড ছিদ্র করে ভিতরে ঢোকে এবং ভিতরের শাঁস খেয়ে নষ্ট করে। ফলে এগুলো ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শিম অনেক সময় কুঁকড়ে যায় এবং অসময়েই ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে (আক্রান্ত ফুলের কুঁড়ি, ফুল ও শিম সংগ্রহ করে পোকার কীড়া পুতুলিসহ ধ্বংস করে ফেলতে হবে)।
- ❖ ফেরোমন লিউর ব্যবহারে এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়।
- ❖ আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে জৈব বালাইনাশক এন্টারিও প্রয়োগ করা যেতে পারে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ ৭ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।



থ্রিপস পোকা

ক্ষতির লক্ষণ

পূর্ণাঙ্গ ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক থ্রিপস পাতা থেকে রস চুষে খায়। পাতার মধ্যশিরার নিকটবর্তী এলাকা বাদামী রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায়। নৌকার খোলের ন্যায় পাতা উপরের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ পাঁচ গ্রাম পরিমাণ গুড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নীচের দিকে স্প্রে করতে হবে।
- ❖ ক্ষেতে সাদা রঙের ৩০ সেমি ৩০ সেমি আকারের বোর্ডে পাতলা করে গ্রীজ লাগিয়ে ৩ মিটার দূরে দূরে “আঠালো ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকা আকৃষ্ট করে মারা যায়।
- ❖ আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশী হলে জৈব বালাইনাশক ইনট্রিপিড (ক্লোরফিনাপাইর ১০% এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি পরিমাণ স্প্রে করতে হবে।



রোগবালাই

এনথ্রাকনোজ

রোগের লক্ষন

- ✿ পাতায় বৃত্তাকার বাদামী দাগ ও তার চারপাশে হলুদাভ বলয় দেখা যায়।
- ✿ পরিণত ফলে প্রথমে ছোট গোলাকার জলবসা কলো দাগ পড়ে এবং দাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
- ✿ আক্রান্ত বীজ থেকে গজানো চারায় এ রোগ দেখা যায়।



রোগের প্রতিকার

- ✿ রোগমুক্ত ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- ✿ অনুমোদিত কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক অটোস্টিন প্রতি লিটারে ২ গ্রাম হারে ৭ দিন পর পর স্প্রে আক্রমণের শুরুতেই করতে হবে। বেশী আক্রান্ত হলে টিল্ট প্রতি লিটারে ০.৫ গ্রাম হারে ৭ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।
- ✿ খাওয়ার শিমে ছত্রাকনাশক না ছিটানো উত্তম। বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

পাউডারী মিলডিউ

রোগের লক্ষন: *Erysiphe polygoni* নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে পাতায় সাদা পাউডারের মত ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে এ দাগ কান্ড, ফুল ও ফলে বিস্তার লাভ করে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে সমস্ত গাছ আক্রান্ত হয় ও মারা যায়।

রোগের প্রতিকার

- ✿ গুটি সংগ্রহ করার পর ফসলের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ✿ অত্যধিক সেচ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ✿ সালফার জাতীয় বালাইনাশক থিওভিট ৮০ ডাব্লিউ পি অথবা কমুলাস ডি এফ জাতীয় ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ৫-৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।



মরিচা রোগ

রোগের লক্ষন: *Uromyces phaseoli* নামক ছত্রাকের আক্রমণে মরিচা রোগ হয়ে থাকে। পাতার নিচের দিকে, কান্ডে ও ফলের উপর মরিচা রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায় এবং শিম পরিপক্ব হওয়ার পূর্বেই গাছ শুকিয়ে খড়ের

মত রং ধারণ করে। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং রাতের তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে এ রোগ সহজেই বিস্তার লাভ করে।

রোগের প্রতিকার

- ❖ দেরীতে বীজ বপন না করে মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বরের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- ❖ লিগুমিনোসিস বহির্ভূত ফসলের সাথে মটরশুটির ২-৩ বছর পরপর শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- ❖ রোগ প্রতিরোধী/সহনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ অধিক নাইট্রোজেন সার দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ আক্রান্ত ফসলে প্রোপিকোনাভোল (টিল্ট ২৫০ইসি) অথবা টেবুকোনাভোল (ফলিকুর ২৫০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ টি স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়। স্প্রে করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন স্প্রে দ্রবন ভালোভাবে পাতার নীচের দিকে যায়।



মোজাইক ভাইরাস রোগ

রোগের কারণ: সাদা মাছির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। Hyacinth Bean Yellow Mosaic Virus দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

- ❖ গাছের যেকোন অবস্থায় আক্রান্ত হলেও সাধারণত কচি পাতায় এ রোগের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।
- ❖ আক্রান্ত গাছের পাতায় হলুদ ও গাঢ় সবুজের ছোপ ছোপ মোজাইকের মত দাগ দেখা যায়।
- ❖ কিছু কিছু পাতায় শিরা স্বচ্ছতা লক্ষণও দেখা যায়।
- ❖ আক্রান্ত গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।
- ❖ ফলন কমে যায় এবং পড়ুলো ছোট ও অস্বাভাবিক আকৃতির হয়।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ সুস্থ সবল গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ❖ রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ❖ দু'একটি পাতায় আক্রমণ দেখা মাত্র তা কেটে ফেলে রোগের বাহক পোকা (সাদা মাছি) দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি নিম তেল ও ৩ মিলি ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৫ বার স্প্রে করতে হবে।
- ❖ সাদা মাছি দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন: গেইন/ইমিটাফ) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

নিরাপদ টেঁড়স উৎপাদন কলাকৌশল

ড. মোঃ মাহবুব রহমান সেলীম

সুস্থ জীবনের জন্য নিরাপদ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। খাদ্য-শৃঙ্খলের যে কোন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য মাত্রার অধিক অবশিষ্টাংশ, অণুজীবীয় সংক্রমণ, ক্ষতিকর ভারী ধাতব বস্তুসহ অন্যান্য ক্ষতিকর বস্তুর উপস্থিতি ইত্যাদি দ্বারা বিপত্তি ঘটতে পারে। খামার পর্যায়ে হতে শুরু করে ভোক্তা পর্যায়ে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য নিশ্চিত করতে খামারে উৎপাদন এবং সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়ায় নিরাপদ কৃষি উৎপাদন চর্চা বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাঠ পর্যায়ে আধুনিক উৎপাদন কৌশলের সঙ্গে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য পণ্য উৎপাদন হতে শুরু করে প্রক্রিয়াজাতকরণ, সরবরাহ ও বিপণন এবং প্রতিটি পর্যায়েই নিরাপদ টেঁড়স উৎপাদন কলাকৌশল এর মানদণ্ড অনুসরণ জরুরি।

টেঁড়স (*Abelmoschus esculentus*) একটি জনপ্রিয় ও পুষ্টিকর সবজি যা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে চাষ হয়। তবে বর্তমানে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে টেঁড়সে ক্ষতিকর অবশিষ্টাংশ থেকে যাচ্ছে, যা মানবদেহের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। তাই নিরাপদ টেঁড়স উৎপাদন নিশ্চিত করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, নিরাপদ চাষাবাদের ভিত্তি হলো ভাল জাত নির্বাচন। দ্বিতীয়ত, জমি প্রস্তুতের সময় পর্যাপ্ত জৈব সার, যেমন পচানো গোবর ও কম্পোস্ট ব্যবহার করতে হবে। মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জৈব পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করতে হবে।

নিরাপদ টেঁড়স উৎপাদন ছক

নিচে টেবিল আকারে টেঁড়স উৎপাদনের ধাপগুলো উপস্থাপন করা হলো:

ধাপ বিষয়বস্তু	মূল নির্দেশনা
১ জলবায়ু	উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু; তাপমাত্রা ২৫-৩৫° সেলসিয়াস; পর্যাপ্ত সূর্যালোক প্রয়োজন
২ মাটির গুণাগুণ	দোআঁশ/বেলে দোআঁশ মাটি; pH ৬-৬.৮; পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে
৩ জাত নির্বাচন	উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী জাত; যেমন বারি টেঁড়স-১, বারি টেঁড়স-২
৪ বীজের হার	প্রতি হেক্টরে ৮-১০ কেজি বীজ; অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা যাচাই করা জরুরি
৫ বীজ শোধন	ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন; ট্রাইকোডার্মা বা কার্বেনডাজিম ব্যবহার
৬ জমি তৈরী ও বীজ বপন	জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দেওয়া; সারি দূরত্ব ৬০ সেমি, গাছের দূরত্ব ৩০ সেমি; বীজ ২-৩ সেমি গভীরে বপন
৭ সার ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা	জৈব সার (কম্পোস্ট/গোবর) ব্যবহার; ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি সুষম প্রয়োগ; মাটির উর্বরতা অনুযায়ী সময়সূচি নির্ধারণ
৮ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা	নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার; সেচ ও পানি নিষ্কাশন; গাছের চারপাশে মাটি আলগা করা

ধাপ বিষয়বস্তু	মূল নির্দেশনা
৯ পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা	জৈব কীটনাশক/বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার; ফাঁদ (pheromone trap) ব্যবহার; ফসল পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন
১০ সংগ্রহ ও সংগ্রহ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা	বপনের ৪৫-৫০ দিন পর ফল সংগ্রহ শুরু; ২-৩ দিন অন্তর সংগ্রহ; পরিস্কার করে বাজারজাতকরণ
১১ ফলন	প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮-১০ টন; সঠিক ব্যবস্থাপনায় ফলন আরও বাড়ানো সম্ভব
১২ কর্ম পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিধি	কাজের সময় পরিস্কার পোশাক; কীটনাশক প্রয়োগে মাস্ক ও গান্ধাস ব্যবহার করা; কাজ শেষে হাত-মুখ ধোয়া বা গোসল করা।

জলবায়ু: টেঁড়শের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় অবস্থায় টেঁড়শ জন্মানো যায়। সাধারণত খরিপ মৌসুমেই এর চাষ হয়ে থাকে।

মাটির গুণাগুণ: দোঁ-আশ মাটি টেঁড়শের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করতে পারলে বেলে ধরণের মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাটি সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। সবচেয়ে উপযোগী অম্ল-ক্ষারত্ব ৬.০-৬.৮।

জাত নির্বাচন: বিএআরআই ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক জাত নির্বাচন করা। তবে কৃষকরা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা আছে এমন জাতও চাষ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্যাবদ্ধ করে নিতে হবে।

বীজের হার: অঙ্কুরোদগমের হার ৮০% এবং প্রতিষ্ঠার হার ৮০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বপনের জন্য ৪-৫ কেজি (১২-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা উচিত। বহুল ব্যবহৃত ছত্রাকনাশক হল: কার্বোক্সিন ও থিরাম গ্রুপের প্রোভেক্স ২০০ ডার্লিউপি এবং ব্যবহারের মাত্রা হল ২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ। তাছাড়া কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাক নাশক অটোস্টিন ৫০ ডার্লিউডিজিও ২ গ্রাম/কেজি করে ব্যবহার করা যায়।

জমি তৈরী ও বীজ বপন

বৃষ্টির পানি জমে না এবং সারাদিন রৌদ্র পায় এমন স্থানে টেঁড়শের চাষ করা উচিত। নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য জমি কয়েক খন্ডে ভাগ করে নেয়া বাঞ্ছনীয়। টেঁড়শের বীজের খোসা খুব শক্ত, তাই বোনার পূর্বে বীজ ২৪ ঘন্টা পানিতে চুবিয়ে নিলে অঙ্কুরন তারাতারি হয়। আগাম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং সারিতে ৪০ সেমি দূরত্বে গাছ লাগাতে হবে। সঠিক মৌসুমে উৎপাদনের জন্য বপন দূরত্ব সারি থেকে সারি ৬০ সেমিঃ এবং সারিতে গাছ ৫০ সেমিঃ হবে। প্রতি গর্তে দুটি বীজ দিতে হবে। দুটি বীজই গজালে ৪-৫ পাতা অবস্থায় সুস্থ সবল চারা রেখে অন্যটি তুলে ফেলতে হবে। উড়চুঙ্গা পোকা টেঁড়শের কচি চারা কেটে দেয়। এজন্য শূন্যস্থান পূরণ করার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু চারা ছোট পলিথিনের ব্যাগে জন্মিয়ে রাখা যেতে পারে।

সার এবং মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

টেঁড়স উৎপাদনে মাটি বিশ্লেষণের ফলাফলের ভিত্তিতে উপযুক্ত সার ও মাটির উপযোগ নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করতে হবে। টেঁড়স উৎপাদনে অপরিশোধিত জৈব পদার্থ বা বর্জ্য ব্যবহার করা যাবে না। উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুসম

নিরাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা জমির উর্বরতা শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং উর্বরতা অনুযায়ী মাত্রা কমবেশী হতে পারে। সাধারণত প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	হেক্টর প্রতি মোট পরিমাণ	শতাংশ প্রতি মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	উপরি প্রয়োগ বীজ বপনের পর		
				১ম কিস্তি ১৫-২০ দিন পর	২য় কিস্তি ৩০-৩৫ দিন পর	৩য় কিস্তি ৪৫-৫০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	৪০ কেজি	৪০ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	-	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম			
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	৩০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	২৪০ গ্রাম			
জিংক সালফেট	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম			
বরিক এসিড	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম			

* মাটির উর্বরতা ভেদে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় অর্থাৎ রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে সম্পূর্ণ গোবর, কম্পোস্ট বা ভার্মিকম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, বরিক এসিড, জিংক সালফেট এবং ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং ১/৩ ভাগ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর উল্লিখিত হারে ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

উৎপাদন বাবস্থাপনা

আগাছা দমন: নিড়ানী বা কোদাল দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হয়, তবে মালচ পলিথিন ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করলেও ড্রেনের আগাছা কোদাল দিয়ে দমন করা দরকার। মালচ পলিথিন ছাড়া চাষ করলে নিড়ানি, আঁচড়া বা কোদাল দিয়ে আগাছা দমন করা ভাল। আগাছা দমনে আগাছা নাশক ব্যবহার না করাই উত্তম।

বিশেষ পরিচর্যা: গাছের গোড়ার দিকে যে শাখা থাকে তাকে শোষক শাখা বলে। শোষক শাখা হতে কোন ফলন হয় না বরং পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। শোষক শাখা অপসারণের ফলে রোগবাহাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ কম হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সহজ হয়।

বেড়া-নেট দেওয়া: ফসলের নিরাপত্তা বিধান করার জন্য জমির চারদিকে নাইলন নেট দিয়ে বেড়া দিতে হবে, এতে ফসলকে গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগির আক্রমণ হতে রক্ষা করা যাবে।

সেচের সময় সূচি

- ✿ চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে।
- ✿ টেঁড়স গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেড়ের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক।
- ✿ প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।
- ✿ ড্রিপ পদ্ধতিতে সেচ দিলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না, পানির প্রয়োজনও কম হয়। অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

একদিন পর পর প্রতিদিনই টেঁড়শের ক্ষেত থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত। কচি ফল সংগ্রহ করলে ফলন সামান্য কমে কিন্তু ফলের স্বাদ ও পুষ্টিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

টেঁড়স সংগ্রহ এবং সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

টেঁড়স একটি সংবেদনশীল ফসল, তাই সঠিকভাবে সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণের পূর্বে যথাযথ ব্যবস্থাপনা জরুরি। এতে করে ফলের গুণমান, সংরক্ষণক্ষমতা এবং বাজারমূল্য বজায় থাকে। প্রতিটি ফল বোঁটাসহ কাটা উচিত, যাতে সংরক্ষণের সময় ফলটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পচে না যায়। ফল সংগ্রহে ধারালো চাকু, কাঁচি বা সিকেচার ব্যবহার করা উত্তম, যাতে গাছের ক্ষতি না হয়।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা: ফল সংগ্রহের পরপরই তা ছায়াযুক্ত ও ঠান্ডা স্থানে রাখা উচিত। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেন টেঁড়স কোন ভাবেই মাটির সংস্পর্শে না আসে। সেজন্য মাটিতে ত্রিপল বিছিয়ে তার উপর রাখতে হবে। এতে মাটি বাহিত কোন রোগ জীবাণুর সংস্পর্শ থেকে মুক্ত থাকে। টেঁড়স ছিদ্রযুক্ত প্লাস্টিক পাত্রে বা বুড়িতে রাখা যেতে পারে, যাতে বাতাস চলাচল বজায় থাকে। প্রয়োজনে আর্দ্রতা ধরে রাখতে ফলের ওপর ভেজা কাপড় ঢেকে দেওয়া যেতে পারে।

বাছাই (গ্রেডিং): বাজারজাত করার পূর্বে টেঁড়স আকার, রং ও গুণমান অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হবে। রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, অতি কচি, বাতি কিংবা ভিন্ন রংয়ের ফলগুলো বেছে ফেলা উচিত।

পরিচ্ছন্নতা ও প্যাকেজিং: পুরো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। ফল মাটিতে সরাসরি না রেখে সংরক্ষণের সময় ত্রিপল বা পাস্টিক শিট ব্যবহার করা উচিত, বিশেষ করে প্যাকেজিং-এর সময়।

টেঁড়স সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রতিটি ধাপে সতর্কতা অবলম্বন করলে ফলের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বাজারে ভালো মূল্য পাওয়া যায়। কৃষকদের এই ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে উৎপাদিত টেঁড়সর বাণিজ্যিক সফলতা অনেকাংশেই বাড়বে।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার

- ❖ টেঁড়স উৎপাদনে দেশের বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ করা উচিত নয়। যদি একান্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কারিগরি সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।
- ❖ অনুমোদিত মাত্রার অধিক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ না করা। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি (Pre-Harvest Interval) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ❖ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে দমন কৌশল নির্বাচন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে রাসায়নিক প্রয়োগ করে বালাই (Pest) এর বংশ বৃদ্ধি সীমিত রাখা।

ফলন: উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে টেঁড়শের ফলন হেক্টর প্রতি ১৪-১৬ টন (৫৫-৬৫ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

টেঁড়শের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: আক্রান্ত ডগা নেতিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায় ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা: পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করে পোকাকার কীড়া বা পুতুলি ধ্বংস করা। আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে অন্তঃবাহী বিষ ক্রিয়া সম্পন্ন



নিরাপদ সার্বজি ও ফল উৎপাদন

কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে বিষ প্রয়োগের দুই সপ্তাহের মধ্যে খাওয়ার জন্য কোন ফল সংগ্রহ করা যাবে না।

সাদা মাছি পোকা:

ক্ষতির লক্ষণ: সবুজ শিরাসহ পাতা হলুদ হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা: ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. পরিমাণ) অথবা কনফিডর (প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি পরিমাণ) মিশিয়ে স্প্রে করা।

হলুদ শিরা বা মোজাইক ভাইরাস:

সাদা মাছি (হোয়াইট ফ্লাই) ভাইরাস রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

ক্ষতির লক্ষণ: দাগগুলো ক্রমশ: বড় হয়ে মোজাইক এর মত দেখায় ও পাতা কুকড়ে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ সাবান পানি, নিম তেল ব্যবহার করা
- ❖ স্টিকি ট্র্যাপ বা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার
- ❖ সাদা মাছি দমনের জন্য প্রয়োজনে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (যেমন: গেইন/ইমিটাফ) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। এছাড়াও এসিটামিপ্রিড, থায়ামেথক্সাম গ্রুপের বালাইনাশক পরিমিত মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে।



ফসল সংগ্রহ ও ফলন

মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে ৪০-৪৫ দিনে এবং এরপর বপন করলে ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফুল ফুটে শুরু করে। ফুল ফোটার ৫/৬ দিন পর থেকেই ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের বয়স ৯ দিনের বেশী হলে ফল আঁশময় এবং পুষ্টিমানের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হয়ে যায়। খাওয়ার উপযোগী হওয়া মাত্রই ফল সংগ্রহ করা উচিত। বেশি দেরীতে ফল সংগ্রহ করলে কান্ডের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং মোট ফলন কমে যায়। গাছের প্রধান কান্ডে প্রতি একদিন অন্তর ফুল ফুটে এবং একটি পত্রকক্ষে একটি মাত্র ফল ধরে। প্রতি একদিন অন্তর ফসল সংগ্রহ করতে হবে। টেঁড়সের মোট জীবনকাল প্রায় পাঁচ মাস। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বারি টেঁড়স-২ জাতটির ফলন প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৪-১৬ টন।

টেঁড়স চাষের কর্ম পরিবেশ ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি

কৃষক এবং কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নিরাপদ ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

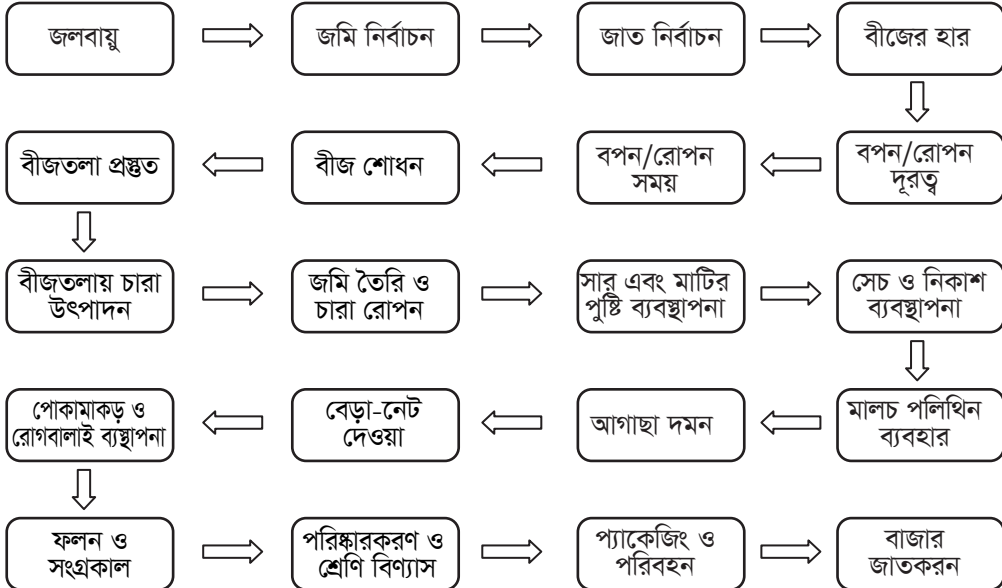
গৃহপালিত বা খামারের প্রাণি যাতে উৎপাদন, হ্যান্ডেলিং, প্যাকিং ও মজুদ এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্রাসিকেসি (Brassicaceae) বা ক্রুসিফেরি (Cruciferae) পরিবারের সবজির নিরাপদ উৎপাদন কলাকৌশল

ড. মো. এমরাউল ইসলাম

ব্রাসিকেসি (Brassicaceae) বা ক্রুসিফেরি (Cruciferae) পরিবারের সবজির মধ্যে বাংলাদেশে উলেখযোগ্য হলো- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, মূলা, নলখোল ও শালগম ইত্যাদি। ক্রুসিফেরাস (Brassica জাতীয়) ফসলসমূহ মোট সবজি উৎপাদনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী এবং সর্বাধিক ভোগ্য সবজি হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে কৃষক অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে বিষাক্ত পদার্থের অবশিষ্টাংশ সবজিতে থেকে যায়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাছাড়া অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহার মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয় এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। নিরাপদ সবজি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর ও কীটনাশকমুক্ত সবজি উৎপাদন করা। এ ক্ষেত্রে জমি প্রস্তুত করার সময় জৈব সার ও কম্পোস্ট সার ব্যবহার, উন্নতমানের বীজ নির্বাচন, ফসলের পরিচর্যা সমন্বিত বালাই দমন কৌশল প্রয়োগ এবং সময়মতো সেচ ও আগাছা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া, নিরাপদ সবজি উৎপাদন শুধু ভোক্তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষাই নিশ্চিত করে না; এটি কৃষকের উৎপাদন খরচ কমিয়ে তাদের আর্থিক লাভ বাড়ায় এবং বাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। একইসাথে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

ব্রাসিকেসি পরিবারের সবজির নিরাপদ উৎপাদন কলাকৌশলের ধাপসমূহ:



নিরাপদ সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ কৃষিতাত্ত্বিক বিষয় সমূহ

জলবায়ু: ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, নলখল ও মূলা ইত্যাদি মূলত শীতকালীন সবজি, এদের ফলন ও গুণগত মান অনেকাংশেই নির্ভর করে উপযুক্ত জলবায়ুর উপর। বিভিন্ন জাত তাপমাত্রা এবং ফোটোপিরিয়ডিক অবস্থার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তাই সঠিক সময়ে সঠিক জাত বপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং আলোর প্রাপ্যতা না থাকলে ফলন ও গুণগত মান কমে যায়।

জমি নির্বাচন: ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, নলখল ও মূলা ইত্যাদি জন্য জমি অবশ্যই জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর, উঁচু বা মাঝারি উঁচু হওয়া উচিত, যাতে বৃষ্টির পানি জমে না থাকে এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না করে। এছাড়া জমিটি মহাসড়ক, বাস চলাচলকারী প্রধান সড়ক বা জনবহুল এলাকা থেকে কমপক্ষে ৫০ মিটার দূরে থাকা উচিত। তবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে, যেমন গ্রীনহাউস বা নিরাপদ চাষাবাদের ক্ষেত্রে, এই দূরত্ব কম হলেও চাষ করা সম্ভব। জমি নির্বাচনের সময় কলকারখানা বা শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপনের পথ থেকেও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। চাষ শুরু করার আগে জমির চৌহদ্দি ও পরিবেশের অবস্থা লিপিবদ্ধ রাখা কৃষকের জন্য উপকারী, যা নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর উৎপাদন নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

জাত নির্বাচন: বিএআরআই ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত আধুনিক জাত নির্বাচন করা। তবে কৃষকরা দেশীয় বা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা আছে এমন জাতও চাষ করতে পারেন। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমপক্ষে ৮০% হতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ায় তথ্যাবদ্ধ করে নিতে হবে।

বীজের হার, বপন/রোপন দূরত্ব, বপন/রোপন সময়ঃ

সবজির নাম	বীজ হার (গ্রাম/হেক্টর)	বপন/রোপন দূরত্ব	জাতভেদে বপন/রোপন সময়
ফুলকপি	২৫০-৩৫০	৬০ সেমি × ৪৫ সেমি	আগস্ট থেকে অক্টোবর
বাঁধাকপি	৩৫০-৪০০	৬০ সেমি × ৪৫ সেমি	আগস্ট থেকে অক্টোবর
ব্রোকলি	৩০০-৩৫০	৫০ সেমি × ৪৫ সেমি	আগস্ট থেকে অক্টোবর
নলখল	১০০০-১৫০০	৪০ সেমি × ২৫ সেমি	সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর
মূলা	২৫০০-৩০০০	৪৫ সেমি × ৩০ সেমি	সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর

হেক্টর প্রতি চারার সংখ্যা অনেকাংশেই জমিতে চারার রোপন দূরত্বের উপর নির্ভর করে। আবার রোপণ দূরত্ব নির্ভর করে জাত ও মাটির উর্বরতার উপর।

বীজ শোধন: ছত্রাক বাহিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করা উচিত। ট্রাইকোডার্মা গুঁড়া (৪ গ্রাম/কেজি বীজ) অথবা কারবেনডাজিম/প্রোভেক্স জাতীয় বীজ শোধক (২-৩ গ্রাম/কেজি বীজ) ব্যবহার করতে হবে। জৈবিকভাবে নিরাপদ রাখতে চাইলে ট্রাইকোডার্মা হার্জিয়ানাম ব্যবহার করা উত্তম।

বীজতলা প্রস্তুত

মূলা সরাসরি মূল জমিতে বপন করা হয় আর ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি ও নলখল বীজতলায় বপন করে চারা তৈরি করে সেই চারা মূল জমিতে লাগানো হয়। বীজতলা প্রস্তুতের জন্য মাটিতে পচা গোবর ১০-১২ কেজি/বর্গমিটার, ভার্মিকম্পোস্ট, ছাই ও নিমখেল মিশিয়ে নিতে হবে। রোগ কমানোর জন্য বীজতলা সূর্যের তাপে ৩-৪ দিন পাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

বীজতলায় চারা উৎপাদন: আমাদের দেশে সাধারণত ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি ও নলখলের বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন করা হয়। চারাগুলি দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করা হয় না। এতে বীজের পরিমাণ বেশী লাগে। উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। অথচ ভাল ফসল পেতে হলে সুস্থ সবল চারা লাগাতে হয়। তাই সুনিষ্কাশিত উচু জমির মাটি মিহি করে প্রথম বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয় এবং বীজতলায় প্রয়োজন অনুসারে মাঝারি থেকে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়।

প্রতিটি বীজতলা 1×3 মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরের ৭/৮ দিন পূর্বে প্রতিটি 1×3 মিটার বীজতলায় ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম এমপি মিশিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীতে চারা বৃদ্ধির হার কম হলে প্রতিটি বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।

- ✿ পানি, সূর্যালোক ও ছায়া প্রয়োজন মাফিক নিশ্চিত করতে হবে।
- ✿ চারা সাদা ঘন নেট দিয়ে সবসময় ঢেকে রাখতে হবে যাতে কোন ধরনের রোগ জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে।
- ✿ অতিরিক্ত পানি না দেওয়া, যাতে ড্যাম্পিং অফ রোগ না হয়। ট্রাইকোডার্মা মিশ্রিত কম্পোস্ট চা সাপ্তাহিক স্প্রে করা যেতে পারে। জৈব কীটনাশক যেমন নিম নির্য়াস ব্যবহার করতে হবে।
- ✿ প্রয়োজন হলে কারবেন্ডাজিম গ্রুপ এর ছত্রাকনাশক (অটোস্টিন) ও ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপ এর কীটনাশক (ইমিটাফ) সিডিউল ৭-১০ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

চারার বয়স: চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে। প্রতি পিটে একটি সুস্থ সবল চারা রোপন করতে হবে। রোপনের পর কোন চারা মারা গেলে তা পুনরায় সেই জাতের চারা দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে। এ জন্য অতিরিক্ত চারা সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি তৈরি ও বেড ডিজাইন

গভীর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর দুসারিতে চারা রোপণের জন্য ১ মিঃ চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উচু মিড়ি তৈরি করতে হবে। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য মিড়িতে চারা রোপণ করাই ভাল। মিড়ির দৈর্ঘ্য জমির সাইজ এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে যত ইচ্ছা করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুই মিড়ির মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি গভীর পিলি থাকবে। পিলির মাটি তুলেই মিড়ি তৈরী করা হয়। সেচ দেয়া এবং পানি নিকাশের জন্য পিলি অত্যন্ত জরুরী।

সার এবং মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি ও নলখলের একর প্রতি ফলন যথেষ্ট। তাই ভারী ধাতব পদার্থ এবং মাটি বিশেষণের ফল্যফলের ভিত্তিতে উপযুক্ত সার ও মাটির উপযোগ নির্ধারণ এবং প্রয়োগ করতে হবে। সার এবং মাটির উপযোগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা যেমনঃ উৎস, পণ্যের নাম, তারিখ, পরিমাণ উল্লেখসহ প্রয়োগ পদ্ধতি এবং প্রয়োগকারীর বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। কম্পোস্ট ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করতে হবে যাতে ফুলকপি উৎপাদনে কোনরূপ পারস্পরিক দূষণ না হয়।

নির্যাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি ও নলখল চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

সার	পরিমাণ	শেষ চাষের সময়	রোপণের ৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ	চারা রোপণের ১৫-২০ পর	চারা রোপণের ৩৫-৪০ পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	৫ টন	৫ টন	-	-
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	-	-	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি
টিএসপি	২৫০ কেজি	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	-	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি
মলিবডেনাম	১ কেজি	সব	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	৩ কেজি	সব	-	-	-

মূলা চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

মূলা উৎপাদনের জন্য গভীর করে বার বার চাষ দিয়ে জমি উত্তমরূপে তৈরী করে নিতে হবে। কারন জমি তৈরী করার উপরই মূল্য ফলন অনেকাংশে নির্ভর করে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর প্রতি)

সার	মোট সারের পরিমাণ	শেষ চাষের প্রয়োগ সময়	বীজ বপনের ২০ দিন পর	বীজ বপনের ৪০ দিন পর	বীজ বপনের ৬০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	১০ টন	-	-	-
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	-	৮০ কেজি	৯০ কেজি	৮০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি	২০০ কেজি	-	-	-
এমপি	২০০ কেজি	২০০ কেজি	৮০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	১০০ কেজি	-	-	-
বোরা	১০ কেজি	৫ কেজি	-	-	৫ কেজি

পরবর্তী পরিচর্যা

সেচ ও নিকাশ ব্যবস্থাপনা

- ❀ রোপণের পর প্রথম ৪-৫ দিন এক দিন পরপরই সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে। বেডের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক।
- ❀ সেচ পরবর্তী জমিতে 'জো' আসলে স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- ❀ সারের উপরি প্রয়োগ যথাসময়ে করতে হবে। উল্লেখ্য সারের উপরি প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচের পানির গুণাগুণ

- ❖ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, মুলা ও নলখল চাষের জন্য উৎপাদনে পানি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এ পানির মাধ্যমে জমি ও ফসল যেমন উপকার পেয়ে থাকে তেমনি দূষণ হতে পারে, সে জন্যে পানির সঠিক উৎস স্থির করতে হবে। সেচ কাজে ব্যবহারের পূর্বে উৎসের পানির নমুনা নিয়ে বিশেষণ করতে হবে।
- ❖ ভূগর্ভস্থ পানির বেলায় আর্সেনিক ও নাইট্রেট নাইট্রোজেন দূষণ পরিমাপ জরুরি, আর ভূ-উপরিস্থ পানির বেলায় সকল ভারী ধাতু ও ক্ষতিকর অনুজীব বা শহরের বর্জ্য স্থাপনা, হাসপাতাল, শিল্প ও ডাম্পিং বর্জ্য ইত্যাদির খেয়াল রাখতে হবে। পানি নিরাপদ নিশ্চিত হওয়ার পর সে পানি সেচ কাজে ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ ফসলের প্রকারভেদ, পানির প্রয়োজনীয়তা, প্রাপ্যতা ও মাটির আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে সেচ প্রদান করা। সেচ পদ্ধতি নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে ভাল ব্যবস্থাপনা বজায় রাখা যাতে সেচ প্রদানে দক্ষতা বৃদ্ধি ও পানির অপচয় হ্রাস পায়।

মালচ পলিথিন ব্যবহার: আগাছা দমন, গাছের সঠিক বৃদ্ধি ও মাটির পানির সঠিক ব্যবহার করার জন্য মালচ পলিথিন ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করলে আগাছা দমন খরচ কমে যায়, এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। বাজারে বিভিন্ন পুরুত্ব এবং সাইজের মালচ পলিথিন পাওয়া যায়। সাধারণত ২৫ মাইক্রন পুরুত্ব এবং ১.২ মিটার মিটার প্রস্থ এবং ৫০০ মিটার লম্বার মালচ পলিথিন ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলো খুবই উপকারি, তবে মালচ পলিথিন দিয়ে চাষ করলে চারা জমিতে লেগে গেলে তারপরই চারার দূরত্ব অনুসারে ছিদ্র করে মালচ পলিথিন স্থাপন করাই উত্তম, কারণ চারা রোপণের পূর্বে মালচ পলিথিন বসালে পলিথিন এর সূর্যের অতিরিক্ত তাপে চারা মারা যায়।

আগাছা দমন: নিড়ানী বা কোদাল দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হয়, তবে মালচ পলিথিন ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করলেও ড্রেনের আগাছা কোদাল দিয়ে দমন করা দরকার। মালচ পলিথিন ছাড়া চাষ করলে নিড়ানি, আঁচড়া বা কোদাল দিয়ে আগাছা দমন করা ভাল। আগাছা দমনে আগাছা নাশক ব্যবহার না করাই উত্তম।

বেড়া-নেট দেওয়া: মানুষ, গরু, ছাগল বা অন্যান্য প্রাণী থেকে জমি ও ফসল রক্ষা করার জন্য জমির চারিদিকে বেড়া-নেট দেয়া প্রয়োজন।

ব্রাসিকা ফসলে পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

পোকাকার নাম	ক্ষতির লক্ষণ	দমন ব্যবস্থাপনা
ডায়মন্ড ব্যাক মথ	কচিপাতা, ডগা ও কপি খেয়ে ফেলে, গাছ দুর্বল হয়	আক্রান্ত পাতা নষ্ট, ফেরোমন ফাঁদ, নিম তেল/জৈব কীটনাশক, প্রয়োজনে সাইপারমেথ্রিন
জাব পোকা	রস চুষে নেয়, বৃদ্ধি ও ফলন কমে	হাতে দমন, সাবান পানি, নিম তেল, উপকারী পোকা সংরক্ষণ, প্রয়োজনে ম্যালাথিয়ন
কাণ্ডছিদ্রকারী	কাণ্ড ছিদ্র হয়ে গাছ শুকায়	আক্রান্ত গাছ অপসারণ, ফাঁদ ও জৈব কীটনাশক
কাটুই পোকা	চারা কেটে ফেলে	টর্চ বা হারিকেন নিয়ে রাতের বেলা কাটুই পোকাকার কীড়া সংগ্রহ, সেচ ও বিষটোপ প্রয়োগ

ব্রাসিকা ফসলে রোগ ব্যবস্থাপনা

রোগের নাম	ক্ষতির লক্ষণ	দমন ব্যবস্থাপনা
ড্যাম্পিং অফ	চারা ঢলে পড়ে মারা যায়	বীজতলা জীবাণুমুক্ত, ট্রাইকোডার্মা, বীজ শোধন
দাগ রোগ (অল্টারনারিয়া)	পাতায় বাদামী চক্রাকার দাগ	শস্য পর্যায়, সুষম সার, রোভরাল স্প্রে
ডাউনি মিলডিউ	পাতার নিচে সাদা/ধূসর আন্তরণ	রোগমুক্ত বীজ, জমি পরিষ্কার, জৈব ছত্রাকনাশক
ব্ল্যাক রট	পাতার কিনারা কালো হয়ে শুকায়	রোগমুক্তবীজ, আক্রান্ত গাছ ধ্বংস, ফসল আবর্তন

নিরাপদ চাষের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM):

- ❖ রোগ প্রতিরোধী জাত নির্বাচন।
- ❖ নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ।
- ❖ ফেরোমন ফাঁদ, আঠালো ফাঁদ ও আলো-ফাঁদ ব্যবহার।
- ❖ জৈব সার, নিম তেল ও বায়োপেস্টিসাইড প্রয়োগ।
- ❖ আক্রান্ত গাছ নষ্ট করা।
- ❖ প্রয়োজনে অনুমোদিত স্বল্প বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার (শেষ উপায় হিসেবে)।

রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশনা:

- ❖ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, মুলা ও নলখল উৎপাদনে প্রয়োজন হলে দেশের বিধিবিধান দ্বারা অনুমোদিত বালাইনাশক গুলো ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রণ না করা। যদি একান্তই করতে হয় সেক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের কারিগরি সুপারিশের ভিত্তিতে করতে হবে।
- ❖ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেবেলে উল্লিখিত প্রয়োগ বিরতি এবং ফসল সংগ্রহ পূর্ব বিরতি (Pre-Harvest Interval) যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- ❖ প্রত্যেক ফসলের জন্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের বিস্তারিত তথ্য যেমন-প্রয়োগের কারণ, স্থান, মাত্রা, পদ্ধতি, তারিখ ও প্রয়োগকারীর নাম সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ উৎপাদিত সবজি বিক্রি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন রাসায়নিকের MRL (Maximum Residue Limit) বা অবশিষ্টাংশের মাত্রা স্বীকৃত পরীক্ষাগার হতে (Accredited laboratory) নির্ণয় করতে হবে।
- ❖ সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অবলম্বনের ক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে দমন কৌশল নির্বাচন এবং সর্বশেষ পর্যায়ে রাসায়নিক প্রয়োগ করে বালাই (Pest) এর বংশ বৃদ্ধি সীমিত রাখা।
- ❖ লেবেলে প্রদত্ত নির্দেশিকা এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুসরণ করে রাসায়নিক/বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ যে সকল কৃষক/শ্রমিক/কর্মী রাসায়নিক হ্যান্ডলিং এবং প্রয়োগ করবে তাদেরকে উপযুক্ত পোশাক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে উক্ত কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ফলন ও সংগ্রহকাল

জাতভেদে সংগ্রহের উপযুক্ত সময় ভিন্ন হয়। উপযুক্ত পরিচর্যায় হেক্টর প্রতি ২৫-৩৫ টন ফুলকপি, ৫৫-৬৫ টন বাঁধাকপি, ১২-১৮ টন ব্রোকলি, ৬০-৮০ টন মুলা ও ৪০-৫০ টন নলখল পাওয়া যায়।

সংগ্রহ এবং সংগ্রহ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

সঠিক সময়ে সংগ্রহ ও যথাযথ সংগ্রহ-পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করলে সবজি অনেকদিন সতেজ থাকে, বাজারমূল্য বেশি পাওয়া যায় এবং ভোক্তাদের কাছে নিরাপদ ও মানসম্মত সবজি সরবরাহ করা সম্ভব হয়। এছাড়া, রপ্তানির ক্ষেত্রেও এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

পরিষ্কারকরণ ও (grading) শ্রেণিবিন্যাস

সংগ্রহের পর মাটি, আগাছা ও শুকনা পাতা পরিষ্কার করতে হবে। আকার, রঙ ও গুণমান অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস (grading) করতে হবে। শ্রেণিবিন্যাসের ফলে বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায় এবং রপ্তানির উপযোগী সবজি আলাদা করা যায়।

প্যাকেজিং ও পরিবহন

বাঁশের ঝুড়ি, কাঠের বাক্স বা কার্টনে প্যাকিং করে বাজারে নিতে হবে। নিচে নরম খড় বা কাগজ বিছিয়ে সাজাতে হবে, যাতে চাপ লেগে ক্ষতি না হয়। দূরপাল্লার পরিবহনের জন্য বায়ু চলাচলযোগ্য প্যাকেজ ব্যবহার করা জরুরি। সঠিক পরিবহন পদ্ধতি মানলে সবজি দীর্ঘ সময় সতেজ থাকে।

বাজারজাতকরণ

ফসলের সতেজতা বজায় রেখে দ্রুত বাজারজাত করতে হবে। সবজিতে যেন কোনো দাগ বা রোগাক্রান্ত অংশ না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সতেজ ও রোগমুক্ত সবজি ভোক্তাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং বাজারে ভালো দাম পাওয়া যায়।

নিরাপদ শাক উৎপাদন কৌশল

মো. হাসিনুল ইসলাম

নিরাপদ সবজি এমনভাবে উৎপাদিত হয় যেখানে প্রতিটি ধাপ-জমি নির্বাচন, চাষ, সার ও কীটনাশক প্রয়োগ, সেচ, সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষার মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এতে ক্ষতিকর কীটনাশক, অতিরিক্ত রাসায়নিক সার, রোগজীবাণু, ভারী ধাতু বা যেকোনো ধরনের দূষণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা হয়। নিরাপদ সবজি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো ভোক্তার স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থা এবং স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা।

নিরাপদ সবজি হিসাবে শাকের গুরুত্ব

নিরাপদ সবজি হিসেবে শাকের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ শাকসবজি মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন, খনিজ উপাদান, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও আঁশের প্রধান উৎসগুলোর অন্যতম। লাল শাক, পালং শাকসহ অধিকাংশ শাক স্বল্পমেয়াদি ফসল হওয়ায় দ্রুত বৃদ্ধি ও ঘন ঘন সংগ্রহের জন্য অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক প্রয়োগের ঝুঁকি থাকে। নিরাপদ উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করলে এই ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এবং ভোক্তার জন্য রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ, নাইট্রেট ও রোগজীবাণুমুক্ত পুষ্টির খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ফলে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে নিরাপদ শাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিরাপদ শাক উৎপাদন পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। জৈব সার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বজায় থাকে, উপকারী অণুজীবের কার্যক্রম সক্রিয় হয় এবং পানি ও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা স্থিতিশীল ও পরিবেশবান্ধব হয়, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও নিরাপদ সবজি হিসেবে শাকের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন শাক ভোক্তার আস্থা বৃদ্ধি করে, বাজারমূল্য ও চাহিদা বাড়ায় এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একই সঙ্গে শিশু, গর্ভবতী নারী, বয়স্ক ব্যক্তি ও অসুস্থ জনগোষ্ঠীর জন্য নিরাপদ শাক সহজলভ্য পুষ্টির উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে নিরাপদ সবজি হিসেবে শাক মানবস্বাস্থ্য রক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত।

জমি নির্বাচন ও তৈরি

নিরাপদ শাক উৎপাদনের জন্য উর্বর, বুরবুরে এবং পানি নিষ্কাশন সুবিধায়ুক্ত দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ জমি সবচেয়ে উপযোগী। জমি এমন হতে হবে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া যায় এবং জমিতে শিল্পকারখানা, নোংরা পানি, বর্জ্য বা রাসায়নিক দূষণের উৎস না থাকে। পরিষ্কার ও নিরাপদ সেচের পানি নিশ্চিত করতে হবে, কারণ দূষিত পানি সবজিতে জীবাণু ও ভারী ধাতুর ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। মাটির প্রকারভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দিতে হবে। প্রথম চাষ গভীর হওয়া দরকার। এতে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাজনক, পরিচর্যা সহজ এবং সেচের পানির অপচয় কম হয়। সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার, বিশেষ করে কম্পোস্ট বা ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে মাটির উর্বরতা ও মাটির গঠন উন্নত করা উচিত। মাটিতে কোনো ধরনের রাসায়নিক দূষণ না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। শাকের ভিন্নতা অনুযায়ী এর জমি তৈরি আলাদা হতে পারে।

বেডের আকার	প্রস্থ	১ মিটার
	দৈর্ঘ্য	জমির দৈর্ঘ্য অনুযায়ী
	উচ্চতা	১৫-২০ সেমি
নালার আকার	প্রস্থ	৩০ সেমি
	গভীরতা	২০ সেমি



শাক উৎপাদনের আদর্শ বেড

জাত নির্বাচন

উচ্চ ফলনশীল, রোগ সহনশীল এবং স্থানীয় পরিবেশের সাথে উপযোগী জাত নির্বাচন নিরাপদ সবজি উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া এবং স্বল্প মেয়াদী জাত ব্যবহার করলে রোগবালাইয়ের চাপ কমে এবং কম সার ও কম কীটনাশকে উৎপাদন সম্ভব হয়। বিশুদ্ধ উৎস থেকে বিশুদ্ধ ও মানসম্মত বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য, কারণ অনিশ্চিত বা নিম্নমানের বীজ রোগ ও দূষণের ঝুঁকি বাড়ায়।

সুশম সার প্রয়োগ

নিরাপদ শাক উৎপাদনে জৈব সারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হলে তা ভাগ করে প্রয়োগ করা উত্তম, যাতে গাছ ধীরে ধীরে পুষ্টি পায় এবং নাইট্রেটের মাত্রা কম থাকে। মাটির উর্বরতার ভিত্তিতে সুশম NPK প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ, তবে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে। টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার দিলে প্রতি কেজি ডিএপি সারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া (হেক্টর প্রতি) কম দিবেন। এলাকা বা মৃত্তিকাভেদে সারের পরিমাণে কম-বেশি করুন। ইউরিয়া সার ছাড়া বাকি সব সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। জমি তৈরির প্রথম দিকে জমিতে গোবর সার প্রয়োগ করা ভালো। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর থেকে ২০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর মাটির সাথে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
জৈব/ গোবর সার	৪০ কেজি	১০ টন
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম	২০০কেজি
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	১০০কেজি
এমওপি	৬০০ গ্রাম	১৫০ কেজি
জিপসাম	৩০০ গ্রাম	৭৫ কেজি

বীজের হার ও বপন

শাকের ক্ষেত্রে প্রতি শতক জমিতে বীজের প্রয়োজন শাকের ভিন্নতা অনুযায়ী নির্ভর করে। ঘনভাবে বপন করলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রোগবালাইয়ের আক্রমণ বাড়ে এবং পাতলা করণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। অঙ্কুরোদগম বাড়ানোর জন্য বীজ ৮-১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখা, বীজ ট্রাইকোডার্মা দ্বারা প্রক্রিয়াজাত করা এবং বপনের পরে হালকা আর্দ্রতা বজায় রাখা গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধি উন্নত করে।

		কলমি শাক	লাল শাক	পুই শাক	পালং শাক
বেড়ে বীজ	সারি থেকে সারি (সেগমিঃ)	৩০	১৫-২০	৪৫	২০- ২৫
বপন দূরত্ব	গাছ থেকে গাছ (সেগমিঃ)	১০-১৫	১০	৪৫	১০
প্রতি গর্তে	বীজের সংখ্যা	২টি	২টি	২টি	২ টি
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)		১০	৪ (সারিতে) ৬-৮ (ছিটিয়ে)	২.০-২.৫ (চারার উত্তোলন) ৩.০-৩.৫ (সরাসরি বপন)	২.০-২.৫ (চারার উত্তোলন) ৩.০-৩.৫ (সরাসরি বপন) ৩৫-৪০ (ছিটিয়ে)

সেচ, আগাছা দমন ও পাতলা করণ

শাকের উৎপাদনে সেচ ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই শাক দ্রুত বাড়ে এবং পর্যাপ্ত মাটির আর্দ্রতা না থাকলে পাতার রং, বৃদ্ধি ও গুণগত মান উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। শাকের শিকড় অগভীর হওয়ায় বপনের পর থেকেই মাটিতে হালকা আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন যাতে বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হতে পারে এবং চারা সুস্থভাবে দাঁড়াতে পারে। সাধারণত ৩-৪ দিন পরপর হালকা সেচ দেওয়া উত্তম, তবে অতিরিক্ত সেচ বা পানি জমে থাকা একেবারেই অনুচিত, কারণ এতে শিকড় পচা, ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ এবং ছত্রাকজনিত সমস্যা বাড়ে। বর্ষাকালে বেড উঁচু করে তৈরি করা হলে পানি নিষ্কাশন ভালো হয় এবং চারার ক্ষতির ঝুঁকি কমে। নিরাপদ উৎপাদনের জন্য দূষণমুক্ত, বিস্কন্দ পানি ব্যবহার করা জরুরি কারণ দূষিত পানি থেকে রোগজীবাণু বা বিষাক্ত উপাদান শাকে প্রবেশ করতে পারে। উন্নত চাষে ড্রিপ বা স্প্রিংস্প্রিন্সের সেচ ব্যবস্থার ব্যবহার পানি সাশ্রয় করে, একই সঙ্গে পাতায় অতিরিক্ত পানি না পড়ায় রোগের ঝুঁকিও হ্রাস পায়।

বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর গাছ উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হবে এবং মাঝে মাঝে মাটি বুঝবুঝে করে দিতে হবে। ঘন চারা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী পাতলা করে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, যাতে গাছ সুস্থভাবে বাড়তে পারে। গাছের বৃদ্ধি দ্রুত ও ফলন ভালো হওয়ার জন্য মাটি আলগা করে দেওয়া ভালো।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

ধরণ	পোকা বা রোগের নাম	প্রস্তাবিত বালাইনাশক (উদাহরণ)	প্রয়োগ মাত্রা ও নিয়ম (১০ লিটার পানিতে)
পোকামাকড়	বিছা বা শুয়োপোকা	এবামেক্ট্রিন বেনজোয়েট (প্রোক্লোইম) অথবা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ)	প্রোক্লোইম ১০ গ্রাম অথবা রিপকর্ড/সিমবুশ ২০ মিলি। ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
	ফ্লি বিটল পোকা	সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড ১০ বা সিমবুশ ১০)	২০ মিলি (৪ মুখ)। ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
	পাতা সুড়ঙ্গকারী পোকা	সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড ১০ বা সিমবুশ ১০)	২০ মিলি (৪ মুখ)। ১০ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
	থ্রিপস ও জাবপোকা	ইমিডাক্লোপ্রিডি (এডমায়ার বা টিডো)	৭-১০ মিলি (২ মুখ)। ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
	মোজাইক রোগের বাহক পোকা (সাদা মাছি)	ইমিডাক্লোপ্রিডি (এডমায়ার বা টিডো)	১০ মিলি (২ মুখ)। সকালে গাছে ছাই ছিটিয়ে দিলে এই পোকা পড়ে যায়।

ধরণ	পোকা বা রোগের নাম	প্রস্তাবিত বালাইনাশক (উদাহরণ)	প্রয়োগ মাত্রা ও নিয়ম (১০ লিটার পানিতে)
রোগবালাই	পাউডারি মিলডিউ	সালফার জাতীয় (কুমুলাস/গেইভেট) অথবা কার্বেন্ডাজিম (গোল্ডাজিম/এমকোজিম)	কুমুলাস ৪০ গ্রাম বা গেইভেট ২০ গ্রাম; অথবা গোল্ডাজিম ৫ মিলি। ১০ দিন পরপর ২-৩ বার।
	মরিচা রোগ	প্রপিকোনাজল (টিল্ট ২৫০ ইসি)	৫ মিলি। ১০ দিন পরপর ৩ বার শেষ বিকেলে স্প্রে করতে হবে।
	এনথ্রাকনোজ ও পাতার দাগ	কার্বেন্ডাজিম (গোল্ডাজিম বা এইমকোজিম)	২০ গ্রাম। ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

****বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন। ব্যবহারের সময় নিরাপদ পোষাক পরিধান করুন। ব্যবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবেনা। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে ৭ থেকে ১৫দিন পর বাজারজাত করুন।**

সহজভাবে বলতে গেলে, ফসল রক্ষা করা অনেকটা ঘর পাহারার মতো; প্রথমে আমরা বেড়া (জৈব পদ্ধতি) দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করি, কিন্তু যদি চোর (পোকা) খুব বেশি শক্তিশালী হয়, তবেই কেবল আইন-শৃঙ্খলার (কীটনাশক) সাহায্য নেওয়া হয়, তাও খুব নিয়ম মেনে।



বিশেষ সতর্কতা

অতিরিক্ত সার, বিশেষ করে নাইট্রোজেনের অতিমাত্রা প্রয়োগ শাকে নাইট্রেট জমার ঝুঁকি বাড়ায়, যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। একইভাবে কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সেচের জন্য পরিষ্কার পানি ব্যবহার এবং জমির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা প্রয়োজন। যেকোনো রাসায়নিক প্রয়োগের সময় সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করতে হবে।

সংগ্রহ

বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শাক সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহের জন্য ভোরবেলা বা বিকেলের সময় সবচেয়ে উপযোগী, কারণ এ সময় শাকের পানি ধরে রাখার ক্ষমতা ভালো থাকে এবং সতেজতা বজায় থাকে। সংগ্রহের সময় মাটি, কাদা বা ক্ষতচিহ্ন এড়াতে সতর্ক থাকতে হবে।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা

সংগ্রহের পর শাক পরিষ্কার পানিতে আলতোভাবে ধুয়ে ময়লা, কাদা ও পোকামাকড় অপসারণ করতে হবে। ছায়াযুক্ত স্থানে পানি ঝরিয়ে নিতে হবে, কারণ রোদে রাখলে শাক নরম হয়ে যায়। পরে ছিদ্রযুক্ত ব্যাগে বা উপযুক্ত প্যাকেজিংয়ে ভরে ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ বা পরিবহন করা উচিত। কোল্ড চেইন ব্যবস্থা থাকলে শাকের সতেজতা দীর্ঘ সময় বজায় থাকে।



বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে প্রধান প্রধান ফল উৎপাদন পদ্ধতি

ড. মো. মশিউর রহমান

আম

আম একটি জনপ্রিয় ফল এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। এর ইংরেজি নাম: Mango বৈজ্ঞানিক নাম: *Mangifera indica* L. ও পরিবার: Anacardiaceae। আমের বেশকিছু বুনো প্রজাতি ইন্দো-বার্মা অঞ্চলে (বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্যাঞ্চল, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং মিয়ানমারের পশ্চিমাঞ্চল) পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় এ সকল বন্য প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ন ও বিবর্তনের মাধ্যম দিয়ে আজকের উন্নত আমের উৎপত্তি। আম গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল। গুরুত্ব, বহুবিধ ব্যবহার এবং পুষ্টিমান বিবেচনায় আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়। আম গাছকে ২০১০ সালে এদেশের জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ২৩টি জেলায় আমের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। তবে উৎকৃষ্ট মানের আম প্রধানত দেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে উৎপাদিত হয়ে থাকে। গবেষকবৃন্দের মতে, উক্ত জেলাগুলোর জলবায়ু ও মাটির অধিক উপযোগিতার কারণেই ভালোমানের আম উৎপাদিত হয়। এ সব অঞ্চলের ৮০-৮৫ ভাগ পরিবারের আয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমের উপর নির্ভরশীল। তবে সাম্প্রতিককালে উন্নত ও বারোমাসী জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় সারাদেশেই আম চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক হওয়ায় প্রতি বছর আম চাষাবাদের এলাকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবিসি ২০২৪ অনুসারে এদেশে ১২৩.৯৯৮ হাজার হেক্টর জমি থেকে ১৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়েছে। জাতিসংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO) এর মতে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১০% হারে ফলের চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত ১৮ বছরে এদেশে ফল উৎপাদন বৃদ্ধি হারে প্রায় ১১.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং গত ১০ বছরে দেশের আমের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। বাংলাদেশের সকল স্থানেই আমের আবাদ হচ্ছে তবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, যশোর, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরের পাশাপাশি দেশের তিন পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানেও বাণিজ্যিকভাবে আমের চাষ হচ্ছে।

পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা আমে গড়ে ৭৮.৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৪ গ্রাম খনিজ, ০.৭ গ্রাম আঁশ, ১.০ গ্রাম আমিষ, ০.৭ গ্রাম চর্বি, ২০.০ গ্রাম শর্করা, ১৬.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১.৩ মি.গ্রা. লৌহ, ০.১ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ০.০৭ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-২, ৪১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি, ৮৩০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন ও ৯০ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

জলবায়ু ও মাটি

আম প্রধানত গ্রীষ্ম মন্ডলের ফসল। তবে এর বাণিজ্যিক চাষ অবগ্রীষ্ম মন্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৪০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত স্থানে আম জন্মে। আমের জন্য বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২০-৩০°সে. সবচেয়ে উপযোগী তবে আমগাছ ৪৫-৪৮°সে. পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। যে কোন মাটিতে আমের চাষ করা গেলেও গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোঁ-আঁশ মাটি উত্তম। আম ৫.৫-৮.০ মাত্রার অম্লক্ষরত্ব জন্মালেও ৬.৫ থেকে ৭.৫ মাত্রা সর্বোত্তম।

জাত

বাংলাদেশের আমের অসংখ্য জাত রয়েছে। এ জাতগুলোতে পরিপক্বতার সময়, আকার, আকৃতি, স্বাদ ও বর্ণে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পরিপক্বতার সময় অনুসারে আমের জাতসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন: ১) আশু/আগাম জাত (পরিপক্বতার সময় মধ্য মে হতে মধ্য জুন); ২) মধ্য/মাঝ মৌসুমী জাত (পরিপক্বতার সময় মধ্য

জুন হতে জুন মাসের শেষ) এবং ৩) নাবী জাতসমূহ (পরিপক্কতার সময় জুলাই থেকে মধ্য আগস্ট মাস)। বাংলাদেশে অনেক জাতের আমগাছ থাকলেও বাণিজ্যিক জাতের সংখ্যা অনেক কম। প্রচলিত বাণিজ্যিক জাতগুলোর মধ্যে গোপালভোগ, খিরসাপাত/হিমসাগর, ল্যাংড়া, ফজলি, বোম্বাই, রানীপছন্দ, আশ্বিনা, সূর্যপুরী, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আমের প্রচলিত জাতগুলোর অধিকাংশে একান্তর ফলধারণ প্রবণতা (এক বছর ফল ধরলে পরের বছর ফল কম ধরে) লক্ষ্য করা যায়। এ সকল জাতের আম সাধারণত পরিপক্ক অবস্থায়ও সবুজ থাকে এবং ফলন তুলনামূলকভাবে কম। ফলে বাণিজ্যিক চাষাবাদের জন্য নিয়মিত ফলধারণক্ষম, উচ্চ ফলনশীল, রঙিন ও উচ্চ ফলনশীল জাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এ পর্যন্ত আমের ৪ হাইব্রিড জাতসহ ১৮টি উন্নত, উচ্চ ফলনশীল ও পুষ্টিসমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করে। যেগুলো প্রতি বছর ফল দিয়ে থাকে। উদ্ভাবিত জাতগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো:

বারি আম-১: এটি বারির প্রথম আমের জাত যা ১৯৯৬ সালে মুক্তায়িত হয়। এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-০১/১৯৯৬। প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন, আগাম এবং মধ্যম ফলনশীল জাত। গাছ আকারে বড় ও খাড়া প্রকৃতির। মধ্য জানুয়ারি মাসে গাছে মুকুল আসা শুরু হয় এবং মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফল পরিপক্ক হয়। পাকা ফলের রং উজ্জ্বল হলুদ, ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, আকৃতিতে প্রায় গোলাকার। ফলের শাঁস আঁশহীন, গাঢ় হলুদে, মধ্যম রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১৯%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৬-৮ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৫ টন।

বারি আম-২: এ জাতটি ১৯৯৬ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-০২/১৯৯৬। প্রতি বছর ফলদানকারী, রঙিন, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ আকারে বড় ও খাড়া প্রকৃতির। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে ফল পরিপক্ক হয়। ফল ডিম্বাকৃতির, গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (টিএসএস ১৭.৫%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৬-৮ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি আম-৩: এ জাতটি ১৯৯৬ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-০৩/১৯৯৬। ভারতের আশোপালি জাতের আম থেকে প্রবর্তন ও নির্বাচন পদ্ধতিতে জাতটি উদ্ভাবিত হয়। এটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং নাবী জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া প্রকৃতির। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল পরিপক্ক হয়। ফল লম্বাটে ও গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৩%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭১%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং ৭-৯ দিন কক্ষ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে ও ছাদ বাগানে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ২৩-২৭ টন।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড): এ জাতটি ২০০২ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-০৪/২০০২। এটি দেশের প্রথম হাইব্রিড জাত। এটি নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং নাবী জাত। গাছ আকারে বড় ও কিছুটা ঝোপালো প্রকৃতির। এ জাতটিতে জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও লাল আভাযুক্ত সবুজ বর্ণের। তবে ব্যাগিংকৃত আম সম্পূর্ণ হলুদ রঙ ধারণ করে। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদে বর্ণের, আঁশহীন, রসালো, খেতে খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৪%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে ও ছাদ বাগানে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ২২-২৭ টন।

বারি আম-৫: জাতটি ২০০৯ সালে মুক্তায়িত হয়, যার নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-১৮/২০০৯। এটি নিয়মিত ফলদানকারী আগাম জাত। গাছ আকারে বড় ও খাড়া প্রকৃতির। মধ্য জানুয়ারি মাস হতে গাছে মুকুল আসা শুরু হয় এবং মে মাসের শেষ সপ্তাহে ফল পরিপক্ক হয়। ফল মাঝারী আকারের (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (টিএসএস ১৯%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

সারা দেশে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্যর জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন ১২-১৫ টন।

বারি আম-৬: ২০০৯ সালে মুক্তায়িত জাতটির নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-১৯/২০০৯। প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ আকারে বড় ও মধ্যম খাড়া প্রকৃতির। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে, ডিম্বাকৃতির, গড় ওজন ২৮০ গ্রাম, ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (টিএসএস ২১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭১%। সংরক্ষণকাল মধ্যম এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-১৬ টন।

বারি আম-৭: এ জাতটি ২০০৯ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-২০/২০০৯। প্রতি বছর ফলদানকারী, রঙিন, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমী জাত। গাছ আকারে বড় ও মধ্যম খাড়া। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের গড় ওজন ২৮৫ গ্রাম, গোলাকার, লালচে হলুদ বর্ণের। ফলের শাঁস হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (টিএসএস ১৮%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৭%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী ও রপ্তানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮ (বহুজীবী): এ জাতটি ২০০৯ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-২১/২০০৯। প্রতি বছর ফলদানকারী রঙিন উচ্চ ফলনশীল নাবীজাত জাত। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের বোটা বেশ শক্ত ও লম্বা, ফলে ঝড়ো বাতাস সহনশীল। ফল লম্বাটে, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এবং ফলের গড় ওজন ২৭০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ, রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (টিএসএস ২২%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি ছাদ বাগানে চাষোপযোগী এবং রপ্তানিযোগ্য। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৪ টন।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা): ২০১১ সালে মুক্তায়িত জাতটির নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-২৬/২০১১। প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল, আগাম জাত। গাছ আকারে বড় ও মধ্যম খাড়া প্রকৃতির। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং মে মাসের মাঝামাঝি ফল আহরণ উপযোগী (কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য) হয়। উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, আঁশহীন, কাঁচা অবস্থায় মিষ্টি (টিএসএস ১১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন (কাঁচা অবস্থায়) ৮-১০ টন।

বারি আম-১০: এ জাতটি ২০১২ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-২৭/২০১২। এ জাতটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমী। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও মধ্যম ছড়ানো। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, গোলাকার, হালকা সবুজ বর্ণের, শাঁসের রঙ কমলা রঙের এবং হালকা আঁশযুক্ত, মিষ্টি (টিএসএস ২০%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। যে সমস্ত এলাকায় অধিক বৃষ্টিপাত হয় সে এলাকার জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

বারি আম-১১ (বারোমাসী): এ জাতটি ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৩১/২০১২। এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও বছরে ৩ বার ফল প্রদান করে। গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও কিছুটা লতানো প্রকৃতির। ফল মাঝারি আকারের, লম্বাটে, গড় ওজন ৩২০ গ্রাম। পাকা ফলের রং হলুদ বর্ণের, হালকা আঁশযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ১৮.৫%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৯%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি জাতটি ছাদ বাগানসহ সারাদেশে চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ১৮-২০ টন।

বারি আম-১২: এ জাতটি ২০১৯ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৩৭/২০১৯। প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল, খুব সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত এবং অধিক নাবী জাত। জানুয়ারি মাসের শেষে গাছে মুকুল আসে এবং আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফল গোলাকার, হালকা সবুজ রঙের, গড় ওজন ৪৩৫ গ্রাম। ফলের শাঁস আঁশহীন, গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো ও খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৩%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী রাণ্ডানিযোগ্য। ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৩ (হাইব্রিড): এ জাতটি ২০২০ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৩৮/২০২০। এটি একটি উচ্চফলনশীল ও নাবী হাইব্রিড জাতের রঙিন আম। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের আকার উপবৃত্তাকার, গড় ওজন ২২০ গ্রাম। ফলের শাঁস আঁশহীন, কমলা বর্ণের, রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ২১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৪.৬%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী রাণ্ডানিযোগ্য। ফলন ২০-২২ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৪ (রঙিন): এ জাতটি ২০২০ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৪২/২০২০। এটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং নাবী জাত। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। পরিপক্ক ফল হলুদাভ আকর্ষণীয় গাঢ় লাল রঙের। ফলের আকৃতি আয়তাকার, গড় ওজন ৫৬৯ গ্রাম। ফলের শাঁস আঁশহীন, গাঢ় হলদে, রসালো ও ফল মিষ্টি (টিএসএস ২২.৮৩%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৫.৩৫%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে ও ছাদ বাগানে চাষোপযোগী এবং রাণ্ডানিযোগ্য। ফলন ১৪-১৬ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৫: এ জাতটি ২০২০ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-৪০/২০২০। এটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং নাবী জাত। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। পরিপক্ক ফলের জন্য রঙ হলুদাভ সবুজ। ফল উপবৃত্তাকার এবং গড় ওজন ৬৮০ গ্রাম। শাঁস হলুদ, কিছুটা শক্ত প্রকৃতির, সুগন্ধযুক্ত এবং বেশ মিষ্টি (টিএসএস ২৪%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২.৩৫%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি আম-১৬: এ জাতটি ২০২০ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৩৯/২০২০। এটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং নাবী জাত। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে থেকে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার এবং গড় ওজন ৫৭১ গ্রাম। শাঁস কমলা বর্ণের, শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত, বেশ মিষ্টি (টিএসএস ২৫%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০.২০%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে চাষোপযোগী। ফলন ২২-২৪ টন/হেক্টর।

বারি আম-১৭ (হাইব্রিড): এ জাতটি ২০২০ সালে মুজায়িত হয় এবং এর নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৪১/২০২০। এটি একটি উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী ও নাবী হাইব্রিড জাতের আম। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। পরিপক্ক ফলের রঙ হলুদাভ সবুজ, ফলের আকার গোলাকার এবং গড় ওজন ৬৫০ গ্রাম। শাঁস হলুদ, শক্ত, সুগন্ধযুক্ত এবং খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৫.৫০%)। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৮.৪৬%। সংরক্ষণকাল ভালো এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৭-৯ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে ও ছাদ বাগানে চাষোপযোগী এবং রাণ্ডানিযোগ্য। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২৪ টন।

বারি আম-১৮ (হাইব্রিড): ২০২১ সালে মুজায়িত জাতটির নিবন্ধন নম্বর ০৪(০১)-৪৩/২০২১। এটি প্রতি বছর ফলদানকারী, উচ্চ ফলনশীল এবং মাঝ মৌসুমী জাত। জানুয়ারি মাসের শেষ হতে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে গাছে মুকুল আসে এবং জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার, গড় ওজন ২৪০ গ্রাম, পাকা ফলের রঙ হলুদ, শাঁস হলুদ এবং বিশেষ সুগন্ধযুক্ত। ফল খুব মিষ্টি (টিএসএস: ২৪.৬৭%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৬%। সংরক্ষণকাল মধ্যম এবং কক্ষ তাপমাত্রায় ৫-৭ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি সারা দেশে ও ছাদ বাগানে চাষোপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বংশবিস্তার: বীজের মাধ্যমে সহজেই আমের বংশবিস্তার করা যায়। তবে এতে মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে না। এজন্য অঙ্গজ পদ্ধতিতে আমের বংশবিস্তার করা উত্তম। সাধারণত ১০-১২ মাস বয়স্ক রুটস্টক এর সাথে ৩-৪ মাস বয়স্ক সায়ন ভিনিয়ার/ক্রেফট পদ্ধতিতে কলম করা হয়। কলমের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো মে-সেপ্টেম্বর মাস তবে শীত কাল ব্যতিত বছরের যে কোন সময়ে কলম করা যায় সেক্ষেত্রে সফলতার হার কিছুটা কম হতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে বছরের যে কোন সময়ে কলম করা যায়।

উৎপাদন পদ্ধতি

স্থান নির্বাচন: আম উৎপাদনের জন্য নির্বাচিত স্থান এবং পার্শ্ববর্তী জমির ইতিহাস ও মাটির নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক উক্ত স্থানে ইতোপূর্বে উৎপাদিত ফসল ও ফসলে প্রয়োগকৃত রাসায়নিক/জীবাণু সার, বালাইনাশক ও জৈবিক দূষণ নিরূপণ ও বর্তমান ফসলে সংক্রমণের ঝুঁকি শনাক্ত হলে তা ঝুঁকিমুক্ত/সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত আমে কোনরূপ সংক্রমণ ঘটেনি এতদসংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: বর্ষার পানি দাড়ায় না এবং সারাদিন সূর্যের আলো পড়ে এমন উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। সমতল ভূমিতে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে। পাহাড়ী এলাকায় জমির ঢাল ৪৫ ডিগ্রীর কম হতে হবে। পাহাড়ের ঢালে টেরেস তৈরি করে চারা/কলম রোপণ করা হলে ভূমি ক্ষয় কম হবে।

বংশ বিস্তারের উপাদান সংগ্রহ: চারা/কলমের গুণগণমান সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন: জাতের বিশুদ্ধতা, জাতের নাম, ব্যাচ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও চারা/কলম বিক্রেতার নাম, ঠিকানা ও ক্রয়ের তারিখ সংরক্ষণ করতে হবে।

চারা/কলম, রুটস্টক বা সায়ন অবশ্যই নিবন্ধিত নার্সারি (সরকারি/কৃষি সংস্থা/স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নার্সারি) হতে সংগ্রহ করতে হবে।

কলম নির্বাচন ও রোপণ পদ্ধতি: রোপণের জন্য নির্বাচিত আমের চারাটি অবশ্যই ভাল জাতের, এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা হতে হবে। সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে রোপণ করা উত্তম।

রোপণের সময়: জুন-জুলাই মাস কলমের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও চারা লাগানো যায়। তবে অতিরিক্ত বর্ষায় চারা না লাগানোই উত্তম।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ মিটার ঝ ৬ মিটার থেকে ১০ মিটার ঝ ১০ মিটার দূরত্বে ১ মি. ঝ ১ মি. আকারের গর্ত খনন করে খননকৃত গর্ত ৪/৫ দিন উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে গর্তের মাটি ভালোভাবে রোদে শুকাবে এবং রোদের তাপে জীবাণুসমূহ মারা যাবে ও অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হবে। গর্ত খননের ৪/৫ দিন পর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৩০ গ্রাম এমওপি, ৩১০ গ্রাম জিপসাম, ৩০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ৬০ গ্রাম বোরিক এসিড গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে

উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে। তার পর গর্তটি স্বচ্ছ পলিথিন দ্বারা ভালো ভাবে ঢেকে রাখতে হবে। এতে গর্তেও মাটি শোধন হবে হবে।

চারার/কলম রোপণ: গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর ১ বছর বয়সের নির্বাচিত চারাটি রোপন করতে হবে। পলিব্যাগে উৎপাদিত চারা রোপণের পূর্বে সাবধানে চারার গোড়ার পলিব্যাগ অপসারণ করতে হবে। যাতে চারার গোড়ার মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। এর পর গোড়ার মাটির বলসহ চারাটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে চারদিকে মাটি দিয়ে গোড়ার মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। চারা রোপণের পর পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন: বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষা শেষে আগাছা দমন করতে হবে। জমিতে চাষ দিয়ে অতি সহজেই আগাছা দমন করা যায়। পাহাড়ান্তরে বৃষ্টি কটোর বা হাসুয়ার সাহায্যে নিয়মিত আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ট্রেনিং ও সুন্দর কাঠামো প্রদান: গাছের সবল ও সুন্দর কাঠামো তৈরীর জন্য গাছকে ছাটাই করা হয় তাকে ট্রেনিং বলে। সাধারণত: গাছের ২/৩ বছর বয়স পর্যন্ত মাটি থেকে ১ মিটার উচ্চতায় প্রধান কাণ্ডের পাশে গজানো শাখা-প্রশাখা ছাটাই করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফ্রনিং ও ট্রেনিং এর গুরুত্ব রয়েছে।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ: আম সংগ্রহের সাথে সাথেই এ কাজটি করার জন্য আম চাষীদের পরামর্শ দেয়া হয়। গাছের মরা ও রোগাক্রান্ত ডালপালা, যে সকল ডালপালা অন্য গাছের ভিতরে প্রবেশ করেছে তা এবং গাছের আকৃতি সুন্দর রাখতে বড় ডালপালার কিছু অংশ কটন করতে হবে। এছাড়া গাছের ক্যানোপি অত্যন্ত ঘন হলে গাছের ভিতরের কিছু ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। আম সংগ্রহ করার পর পুষ্পমঞ্জুরীটি গাছে লেগে থাকলে সেটি অপসারণ করতে হবে। এর ফলে গাছে দ্রুত নতুন কুশি জন্মাবে ও ফুল আসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আম সংগ্রহ করার পর একটি গাছে যত বেশি নতুন কুশি আসবে ততই পরের মৌসুমে ফলন বেশি হবে। তাই জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে একটি ফলবান গাছে যত বেশি কুশি আনা যাবে ততই মঙ্গল। অর্থাৎ আম চাষে ডালপালা ছাঁটাইকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু বেশিরভাগ কৃষক এ বিষয়টি জানেন না অথবা গুরুত্ব দিয়ে সময়মত কাজটি করেন না।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন: চাড়াগাছের বয়স দুই বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে। তবে গাছের কাঠামো শক্ত হলে এবং শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বেশি হলে এর আগেও ফল রাখা যেতে পারে।

গাছে সার প্রয়োগ: রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়তে হবে। চারা লাগানোর পূর্বে গর্তে এবং বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

গাছের বয়স (বছর)	সার ব্যবস্থাপনা (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈব সার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড	
গর্ত তৈরিতে	-	৫০০	২০০	৩১০	৩০	৬০	১০
০-১	২২৫	১৫০	১০০	১২৫	১৪	২৯	১২
২-৪	৪৭০	২৫০	১৮০	১৮৮	১৪	২৯	১৫
৫-৭	৮৫০	৪০০	২৪০	৩১৩	১৪	২৯	২০
৮-১০	১০৮৫	৫০০	৩০০	৪৩৮	২২	৪৭	২৫
১১-১৫	১০৮৫	৭৫০	৪০০	৫০০	২২	৪৭	৩০
১৬-২০	১৮৫০	১০০০	৪৬০	৬২৫	২৮	৫৯	৪০
>২০	২২৫০	১৫০০	৬০০	৮১৩	২৮	৭১	৫০

উল্লিখিত সার ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ মে-জুন মাসে এবং দ্বিতীয় ভাগ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। তবে জিপসাম ও জিংক সালফেট বছরে একবার প্রয়োগ করলেই চলবে। সার গাছের ক্যানোপি যে দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হয় সে বরাবর মাটিতে ছিটিয়ে বা রিং/নালা করে তাতে প্রয়োগ করা যায়। মাটিতে রসের ঘাটতি হলে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে। চিত্রে আম গাছে রিং করে সার প্রয়োগের পদ্ধতিটি দেখানো হলো।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছে মুকুল বের হবার ৩ মাস আগে থেকে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর) সেচ দেওয়া বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে এক বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আর এক বার সেচ



প্রয়োগ করতে হবে। পরিবর্তিত বেসিন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া ভালো, এই পদ্ধতিতে সেচ দিলে পানি অপচয় কম হয়। চিত্রে আম গাছে সেচ প্রয়োগের পদ্ধতিটি দেখানো হলো। শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের পর গাছের গোড়ায় আচ্ছাদন বা মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়। আম গাছ সুল্ল সময়ের জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারলেও, দীর্ঘমেয়াদি জলাবদ্ধতায় গাছের ক্ষতি হয়। এজন্য বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যিক।



অনুন্নত আম গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর: এদেশে বাড়ির আশে-পাশে, বাগানে অনেক অনুন্নত গাছ দেখা যায়। এ সমস্ত গাছে ভালো ফলন পাওয়া যায় না বা আমের গুণগতমান ভালো নয়। এক্ষেত্রে পুরাতন গাছকে কেটে না ফেলে তাকে উন্নত জাতে রূপান্তর করা যায়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুন্নত আম গাছের সমস্ত প্রশাখা কেটে দিতে হবে। এবং কর্তিত স্থানে বর্দো পেস্ট (প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন) এর প্রলেপ দিতে হবে। এপ্রিল-মে মাসে কর্তিত প্রতিটি প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ডালসমূহ হতে ১/২টি ডাল রেখে অবশিষ্ট ডাল অপসারণ করতে হবে এবং জুন-জুলাই মাসে অবশিষ্ট ডালসমূহে উন্নত গাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ করে গ্রাফটিং করতে হবে। কলমের নিচ থেকে কুশি বের হলে সেগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। এভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে অনুন্নত আম গাছটি উন্নত জাতে রূপান্তরিত হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখা দরকার। চারা গাছের গোড়া পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত নিড়ানী দিতে হবে এবং ফলন্ত গাছের ক্ষেত্রে বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই ও প্রতিকার

এ্যানথ্রাকনোজ: *Colletrotrichum gloesporioides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। ছত্রাকজনিত এই রোগের বিস্তৃতি প্রধানত আর্দ্র ও বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে অধিক পরিলক্ষিত হয়। পাতা, কচি কান্ড, মুকুল ও ফল সব ক্ষেত্রেই এই রোগ দেখা যায়। আক্রান্ত অংশ প্রথমে ধূসর বাদামী এবং পরে কালচে রং ধারণ করে। আক্রান্ত কচি ডাল আগা থেকে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে মরে যায়। মুকুল ও কচি ফল ঝরে পড়ে, অ-পরিপক্ক ফল ফেটে যায় এবং পরিপক্ক ফল পচে যায়।

প্রতিকার:

- ❖ প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পরপরই রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।



- ❖ ফুল/মুকুলে রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ডায়থেন এম-৪৫/ম্যানকোজেব/ইভোফিল এম-৪৫ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফলের পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার আনুমানিক ১০-১৫ পূর্বে প্রথম স্প্রে, এবং ফল মটর দানার মত হলে দ্বিতীয় বার স্প্রে করতে হবে। এতে কচি ফল রক্ষা পাবে এবং ফল ঝরে পড়া কমবে। কীটনাশকের সাথে এসব ছত্রাকনাশক মিশিয়ে একত্রে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ❖ বড় ফলের রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ফলের ব্যাগিং করতে হবে অথবা রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ডায়থেন এম-৪৫/ম্যানকোজেব/ইভোফিল এম-৪৫ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ফলের সংগ্রহোত্তর রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে ফল সংগ্রহের ৫-৭ দিন পূর্বে ম্যানকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ডায়থেন এম-৪৫/ম্যানকোজেব/ইভোফিল এম-৪৫ ইত্যাদি ছত্রাকনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ❖ সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে ৫৫° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে কার্যকরভাবে পরিপক্ক ফলের এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন করা যায় এবং ফলের সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি পায়।

পাউডারী মিলডিউ: *Oidium mangiferae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে আমের পাতা, পুষ্প মঞ্জুরী ও শাখা-প্রশাখার উপর সাদা গুঁড়ার মত ছত্রাকের স্পোর বা বীজকনা দেখা যায়। এর ফলে ফুল ও গুটি শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পুষ্প মঞ্জুরীর বৃদ্ধি ও গুটি বাঁধার সময় মেঘলা দিন ও উচ্চ আর্দ্রতার সাথে যদি রাতে নিম্ন তাপমাত্রা থাকে তবে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

প্রতিকার: প্রতি লিটার পানিতে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন থিওভিট ২ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম (ব্যাবিস্টিন/অটোস্টিন/নোইন) ৫০ ডব্লি উডিজি ১ গ্রাম অথবা প্রোপিকোনাডল (টিল্ট/অন্য নামের) ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। প্রথমবার গাছে মুকুল আসার ১০-১৫ দিন পূর্বে, ২য় বার গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার পূর্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে এবং তৃতীয়বার আমের গুটি বাধার পর স্প্রে করতে হবে।



গুটি মোল্ড: *Capnodium mangiferae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। আমের শোষক পোকা যেমন-হপার ও মিলিবাগ গাছের পাতা, মুকুল, কচি ডালে যেখানে মধুরস নিঃসরণ করে সেখানে এই ছত্রাক বিস্তার লাভ করে এবং কাল আবরণ তৈরির মাধ্যমে রোগের সংক্রমণ ঘটায়। আক্রান্ত পাতায় সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।



প্রতিকার: আমের শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক (ইমিটাফ/টিডো) ২০ এসএস ১ লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে এবং সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন থিওভিট ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। বাগানের আগাছা ও গাছের রোগাক্রান্ত অংশ ধ্বংস করতে হবে।

আগা-মরা/ডাইব্যাক: *Botryosphaeria rhodina* নামক ছত্রাক এ রোগের প্রধান কারণ। এ রোগের আক্রমণে গাছের কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মরে যেতে থাকে এবং গাছের আম ঝরে পড়ে। বড় গাছের ক্ষেত্রে উপরের অংশ হতে ডালপালা মরে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গাছটি মারা যায়।



প্রতিকার: আক্রান্ত ডগা কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে বোর্দো পেষ্টি এর প্রলেপ দিতে হবে। বোর্দো মিক্সার (প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম তুঁতে ও ১০ গ্রাম চুন) অথবা ম্যানকোজেব ৮০% (ইন্ডোফিল-এম ৪৫/অন্য নামের) ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

গামোসিস বা আঁঠাঝরা: আম গাছে

Lasiodiplodia theobromae

নামক এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে

গামোসিস বা আঁঠাঝরা রোগ হয়।

সংক্রমণের প্রথমিক পর্যায়ে গাছের

প্রধান কাণ্ড থেকে এক প্রকার আঁঠালো

রস বা আঁঠা বের হয়। আক্রান্ত বাকলের

কিছু কিছু জায়গা ফেটে যেতে পারে।

আঁঠা ঝরার পরিমাণ বেড়ে গেলে

আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয় ও পরে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। কোনো কোনো সময় মরা ডালের পাতা ঝরে না পড়ে ডালের সাথে লেগে থাকে। আক্রমণ বেশি হলে আক্রান্ত ডগাটি শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত গাছ ক্রমান্বয়ে মারা যায়।



প্রতিকার: গাছ ও ফল বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বছরে দুইবার মরা ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। নিয়মিত পরিচর্যা যেমন: সুষম সার প্রয়োগ, সেচ প্রদান, রোগ ও পোকা দমন করতে হবে। আক্রান্ত ডগা বা শাখা-প্রশাখা কেটে ফেলতে হবে এবং কর্তিত অংশে বোর্দো পেস্ট লাগাতে হবে। আক্রান্ত স্থানের চারিদিকে কিছু সুস্থ অংশসহ বাকল ভালভাবে তুলে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং টেঁছে ফেলা অংশ বোর্দো পেস্ট বা আলকাতরা প্রলেপ দিতে হবে। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড, শাখা প্রশাখায় বোর্দো মিক্সার অথবা কপার গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: কুপ্রাভিট ২-৩ গ্রাম অথবা কার্বেন্ডাজিম (ব্যাবিস্টিন/অটোস্টিন/নোইন) ৫০ ডব্লি উডিজি ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আমের বোঁটা পচা রোগ: *Lasiodiplodia natalensis* নামক

ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। সাধারণত পরিপক্ক আমে এই রোগের

প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে আমের বোঁটার দিক

থেকে পচন শুরু হয়। যা ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে নামে এবং ধিরে ধিরে

সমস্ত ফলটিই পচে যায়।



প্রতিকার:

- ❀ পরিষ্কার শুষ্ক দিনে বোঁটা সহ ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- ❀ সংগ্রহের পর খবরের কাগজ বা খড় বিছিয়ে তাতে বোঁটা নিচের দিকে দিয়ে আমের কষ ঝরাতে হবে যাতে কষ আমের গায়ে না লাগে।
- ❀ আম সংগ্রহ, পরিবহন ও সংরক্ষণের সময় যাতে কোন ক্ষতের সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সংগৃহীত আম ৪৩° সে. তাপমাত্রায় ৬% বোরাক্স মিশ্রিত পানিতে ৩ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- ❀ সংগৃহীত ফল ৫২° সে. তাপমাত্রায় পানিতে ১০ মিনিট অথবা ৫৫° সে. তাপমাত্রায় পানিতে ৫ মিনিট ডুবানোর পর গুদামজাত করা।

অনিষ্টকারী পোকা মাকড় ও দমন ব্যবস্থা

আমের হপার: আমের ক্ষতিকারক পোকাগুলোর মধ্যে হপার বা শোষক পোকা (*Idiocerus spp.*) অন্যতম। ফুল আসার সময় এই পোকাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এটি গাছের বাকলের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এরা সক্রিয় হয়। পূর্ণাঙ্গ পোকা ও নিম্ফ



উভয়ই ক্ষতিকর হলেও নিম্ফ বেশি মারাত্মক। এরা কচি ডগা ও মুকুল থেকে রস চুষে খায়। ফলে মুকুল শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে ঝরে যায়। এছাড়া নিম্ফগুলো রস চোষার সাথে সাথে পায়ু পথে আঠালো মধুরস নিঃসরণ করে যা মুকুল ও গাছের পাতায় আটকে থাকে। মুকুলের পরাগায়ন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত করে। এই মধুরসে শুটি মোল্ড জন্মে যা পরে কাল হয়ে যায়। মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এদের প্রকোপ বেশি হয়।

প্রতিকার: ফল সংগ্রহ শেষে ফল গাছের অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। এতে শোষক পোকার আক্রমণ ৩০-৪০ শতাংশ কমে যায়। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে একবার এবং এর একমাস পর আরো একবার ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/অন্য নামের) ১০ ইসি অথবা ০.৫ মিলি হারে ডেল্টামেথ্রিন (ডেসিস/অন্য নামের) ২.৫ ইসি অথবা ফেনথ্যালিারেট (সুমিসাইডিন/অন্য নামের) ২০ ইসি নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে আম গাছের কাণ্ড, ডাল, পাতা এবং মুকুল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করে হপার দমন করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুম শেষে বছরে একবার পূর্ণ বয়স্ক আম গাছের অপ্রয়োজনীয় মৃত, অর্ধমৃত ডালপালা ছাঁটাই করে আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করলে হপারের প্রাদুর্ভাব প্রায় ৩০-৮০ ভাগ কমে যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা: ফল ছিদ্রকারী পোকা (*Denolis sublimbalis*) আমের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে আমের সরু প্রান্তে বিন্দুর মত ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং প্রথমে শাঁস ও পরে আটি খাওয়া শুরু করে। প্রাথমিক অবস্থায় ছিদ্র পথ হতে সাদা ফেনা বের হয় এবং পরবর্তী কালে আক্রান্ত স্থান ফেটে যায় ও পচন ধরে এবং আক্রান্ত আম অচিরেই ঝরে পড়ে।



প্রতিকার:

- ❀ ফল বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ফল বাগান পরিদর্শন করতে হবে।
- ❀ মার্চ-এপ্রিল মাসে ঝরে যাওয়া আক্রান্ত কচি ফল মাটি থেকে সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। অথবা আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটির ১.৫ ফুট গভীরে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে।

- ✿ ফলের গুটির বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে ব্যাগিং করতে হবে, এতে ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে।
- ✿ জৈব বালাইনাশক হিসাবে স্পেনোস্যাড (টেসার ৪৫ এসসি) ০.৪ মিলি/লি. পানি হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে এবং মাটিতে ৫ গ্রাম/লি. হারে ৩০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।
- ✿ সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার রাসায়নিক কীটনাশক এসিটামিপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক ১.৫ মিলি/লি: অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা: ফলের মাছি পোকা (*Bactrocera dorsalis*) আমের একটি ক্ষতিকর পোকা। আম পাকার সময় স্ত্রী মাছি পোকা ডিম পাড়ার অঙ্গের সাহায্যে ফলত্বক ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ২-৩ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া বা ম্যাগট বের হয় এবং ফলের শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত আম বাইরে থেকে বোঝা যায়না কিন্তু কাটলে আমের ভিতরে অসংখ্য কীড়া দেখা যায়। এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পরে।



প্রতিকার: পরিপক্ক কিন্তু সবুজ আম গাছ থেকে সংগ্রহ করে এ পোকাকার আক্রমণ এড়ানো সম্ভব। পোকাক্রান্ত আমগুলো সংগ্রহপূর্বক মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে। অথবা ফল সংগ্রহের এক-দেড় মাস পূর্বে মিথাইল ইউজেনলযুক্ত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকাকার আক্রমণ রোধ করা সম্ভব। তবে আমের গুটির বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে দুই স্তরের বাদামী ব্যাগ দিয়ে ফল ব্যাগিং করা সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি।

আমের উইভিল বা ভোমরা পোকা: আমের উইভিল পোকা (*Sternonchus spp.*) দেশের পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে এ পোকাকার আক্রমণ বেশি দেখা গেলেও সম্প্রতি সারাদেশেই এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্ত্রী পোকা মার্চ-এপ্রিল মাসে কঁচি আমের গায়ে গুঁড়ের সাহায্যে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি মিলিয়ে যায়। ডিম পাড়ার ৭ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে কীড়া



বের হয় এবং কীড়াগুলো ফলের শাঁসের মধ্যে আঁকাবাঁকা সুরঙ্গ তৈরি করে খেতে থাকে। বাইরে থেকে ভাল মনে হলেও আক্রান্ত আমের ভিতরেই কীড়াগুলো পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ পোকায় রূপান্তরিত হয় এবং উইভিল ভিতর থেকে আমের খোসা ছিদ্র করে বের হয়ে যায়। একবার কোন গাছে এ পোকাকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

প্রতিকার: মুকুল আসার পূর্বে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়। আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/অন্য নামের) ১০ ইসি জাতীয় কীটনাশক মিশিয়ে কাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মিলিবাগ: মিলিবাগ (*Drosicha mangiferae*) আমের একটি ক্ষতিকর পোকা। মে মাসের দিকে স্ত্রী পোকা গাছের গোড়ায় মাটির ৫-১৫ সেমি গভীরে ডিম পাড়ে। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় এবং দলবদ্ধভাবে গাছের উপরের দিকে বেয়ে বেয়ে উঠতে শুরু করে। এরা কচি ডগা ও মুকূল থেকে রস চুষে খায় ফলে এগুলো শুকিয়ে যায় এবং ফলন মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। এছাড়া রস চোষার সাথে সাথে এরা আঠালো মধুরস নিঃসরণ করে যা ফুল, ফল ও গাছের পাতায় আটকে যায় এবং সেখানে গুটি মোল্ড জন্মে।



প্রতিকার: আক্রান্ত পাতা ও ডগা সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মিলিবাগের আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলে গাছের গোড়ার চারদিকে গরমের সময় খুঁড়ে দিতে হবে।

নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে নিম্ফসমূহ গাছ বেয়ে উপরে উঠে তাই এই সময় গোড়া হতে ১ মিটার উপরে র‍্যাপিং টেপ দিয়ে (৪-৫ ইঞ্চি চওড়া) মুড়িয়ে দিতে হবে ফলে নিম্ফসমূহ ট্যাপের নিচে জড়ো হবে এই অবস্থায় কার্বারিল ৮৫ এসপি ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে জমাকৃত নিম্ফের উপর স্প্রে করে পোকাকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

এ সময় মাটি থেকে ৩০-৪৫ সেমি উপরে গাছের কাণ্ডে গ্রীজ ও আলকাতরা ১:২ অনুপাতে অথবা রেজিন ও কেস্টর অয়েল ৪:৫ অনুপাতে মিশিয়ে আঠালো বন্ধনী আকারে প্রয়োগ করে এ পোকাকার প্রাদুর্ভাব হ্রাস করা সম্ভব।

যেহেতু এ পোকাটির বহিরাবরন ওয়াক্সি পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে সেহেতু পরীক্ষিত কীটনাশক ছাড়া এটি দমন করা দুরূহ। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্লোরপাইরিফস (ডারসবান ২০ ইসি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি হারে) এবং তার ২-৩ দিন পর কার্বারিল ৮৫ এসপি জাতীয় কীটনাশক বা মিপসিন ৭৫ ডরিলিপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে আক্রান্ত অংশে স্প্রে করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার এভাবে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক পটাশিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড (ফাইটোক্রিন) ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আমের পাতা কাটা উইভিল: আমের পাতা কাটা উইভিল (*Deporaus marginatus*) গাছের নতুন পাতা কেটে মাটিতে ফেলে দেয়। সদ্য রোপণকৃত বা নার্সারিতে সংরক্ষিত চারা গাছ এ পোকাকার আক্রমণে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।



প্রতিকার: মাটি থেকে পোকাকার ডিমযুক্ত নতুন কাটা পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করে এ পোকাকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলা সম্ভব। নার্সারিতে নতুন বের হওয়া পাতাসহ ডগাকে মশারীর নেট দিয়ে ঢেকে দিলে পোকাকার আক্রমণ কম হয়। গাছে কচি পাতা বের হওয়ার সাথে সাথে কচি পাতায় প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস) ১০ ইসি অথবা ১ মিলি হারে ফেনিট্রোথিয়ন (সুমিথিয়ন/ ফলিথিয়ন/এথোথিয়ন) ৫০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কান্ডের মাজরা পোকা: কান্ডের মাজরা পোকা (*Batocera rufomaculata*) ছোট-বড় সব ধরনের গাছের একটি ক্ষতিকর পোকা। পোকাকার লার্ভা কান্ড ছিদ্র করে কান্ড বা শাখা-প্রশাখায় সুরঙ্গ সৃষ্টি করে মজ্জা অংশ খেতে থাকে। এতে আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ মারা যায়, আক্রান্ত শাখা সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং প্রকোপ বেশি হলে সম্পূর্ণ গাছটিই মারা যায়। সুরঙ্গ পথের মুখে পোকাকার মল দ্বারা সৃষ্ট শক্ত ছোট বল দ্বারা এই পোকাকার উপস্থিতি শনাক্ত করা যায়।



প্রতিকার: ছিদ্র দিয়ে সূঁচালো লোহার শিক ঢুকিয়ে খুঁচিয়ে পোকা মারা সম্ভব। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে আক্রমণের সুরঙ্গমুখ পরিষ্কার করে তার মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল ভেজানো তুলা ঢুকিয়ে সুরঙ্গ মুখ কাদা বা পুডিং দিয়ে বন্ধ করে দিলে সুড়ঙ্গে অবস্থিত পোকা মারা যায়।

আম পাতার গল মাছি: পাতার গল মাছি (*Procontarinia mattheiana*) বিভিন্ন প্রজাতির উপর ভিত্তি করে আক্রান্ত পাতায় ধূসর, সবুজ বা বাদামী বর্ণের গোলাকার ও উচু বসন্তের মত গুটি হয়। মার্চ, জুলাই ও অক্টোবর মাসে স্ত্রী পোকা পাতার নিচের দিকে ডিম পাড়ে। এর পর লার্ভা বের হয়ে পাতার ভেতরে টিস্যুতে ঢুকে যায়, এর ফলে পাতা উপরের দিকে ফুলে উঠে। লার্ভাগুলো গল এর ভেতরে থেকে পাতার রস চুষে খায় এবং পাতার কার্যক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে।



প্রতিকার: বর্ষার শেষে আক্রান্ত পাতা বা পাতাসহ আক্রান্ত ছোট ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাইমেথয়েট (রগর/রক্সিয়ন/টাফগার) ৪০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে আমের নতুন পাতায় ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করে এ পোকাকার আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব।

আমের পাতা খেকো গুঁয়ো পোকা: আমের পাতা খেকো গুঁয়ো পোকা (*Euproctis fraterna*) আম গাছের একটি ক্ষতিকর পোকা। পোকাকার আক্রমণে গাছ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পত্রশূন্য হয়ে পড়ে। গুঁয়ো পোকা পত্রফলক সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে ফলে পাতার শুধু মধ্যশিরাটি বা পার্শ্বশিরাগুলো দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে অসময়ে নতুন বিটপ বের হয় ফলে গাছে ফুল আসে না।



প্রতিকার: পূর্ণতাপ্রাপ্ত গুঁয়ো পোকা কীটনাশক প্রয়োগে মারা খুব কঠিন বিধায় আম গাছে গুঁয়ো পোকাকার ছোট ছোট কীড়া দেখা দেয়া মাত্র সেগুলো পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ২ মিলি হারে ডাইমেথয়েট (রগর/রক্সিয়ন/টাফগার বা অন্য নামের) ৪০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করলে এ পোকাকার আক্রমণ কমানো সম্ভব।

শারীরবৃত্তীয় ও অন্যান্য সমস্যা

ব্ল্যাক টিপ (Black tip): এ ক্ষেত্রে সাধারণত প্রথমে আমের নিচের দিকে ছোট একটা জায়গা বিবর্ণ হয়ে যায়, আন্তে আন্তে তা সম্পূর্ণ বিস্তার লাভ করে এবং কালচে হয়ে যায়। আম বাগানের নিকটবর্তী স্থানে ইটের ভাটা থাকলে চিমনির নির্গত (কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, এসিটাইল) ধোঁয়া এ লক্ষণ সৃষ্টি করে।



প্রতিকার: আম বাগান ইটের ভাটা থেকে পূর্ব-পশ্চিমে কমপক্ষে ১.৬ কি.মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ০.৮ কি.মি. দূরে স্থাপন করতে হবে। চিমনির উচ্চতা কমপক্ষে ১৫-১৮ মি. হতে হবে। বোরাক্স ০.৬% এবং কস্টিক সোডা ০.৪% ফুল আসার আগে, পরে এবং গুটি বাঁধা পর্যায়ে তিনবার স্প্রে করলে এসিড গ্যাসকে প্রশমিত করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পাতা পোড়া: সাধারণত পটাশিয়ামের অভাবে পাতা পোড়া লক্ষণ দেখা যায়। এক্ষেত্রে বয়স্ক পাতার আগা এবং কিনারা পুড়ে যায়। লবনাক্ত মাটিতে বা যে মাটিতে সামান্য লোনা পানি বা পটাশিয়ামের উৎস হিসাবে মিউরিয়েট অব পটাশ ব্যবহার করা হয় সে মাটিতে সাধারণত পটাশিয়ামের অভাব দেখা যায়।



প্রতিকার: পটাশিয়ামের উৎস হিসেবে পটাশিয়াম সালফেট সার ব্যবহার করতে হবে। তীব্র অবস্থায় নতুন গজানো পাতায় ৪-৫ বার পটাশিয়াম সালফেট (৫%) ১৫ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

স্পঞ্জি টিস্যু (Spongy tissue): এ ক্ষেত্রে আম পাকার সময় আমের শাঁসের মধ্যে হলদে, অস্বাদযুক্ত স্পঞ্জ এর মত (বায়ুকুঠুরীসহ অথবা ছাড়া) টিস্যু তৈরি হয় যা খাওয়ার অযোগ্য। ফলের বৃদ্ধি বা পাকার সময় বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও পাকা ফল কাটলে দেখা যায়। পুষ্টিগত অসামঞ্জস্যতা, অতিরিক্ত পাকিয়ে ফল সংগ্রহ করা, আম পাড়ার পর রোদে রাখা বা মাটির উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার কারণে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণেও এ সমস্যা হয়ে থাকে।



প্রতিকার: মাটির তাপমাত্রা কমাতে হবে। মালচিং এর মাধ্যমে মাটির তাপমাত্রা ২০°সে. পর্যন্ত কমিয়ে রাখা যায়। আমের যে সমস্ত জাতে এগুলো বেশি হয় সে সমস্ত জাত চাষ পরিহার যেতে পারে।

বিকৃতি (Malformation): বিকৃতি সাধারণত ২ প্রকার। যথাঃ অঙ্গজ এবং মঞ্জুরী বিকৃতি। অঙ্গজ বিকৃতি ছোট চারাগাছে এবং মঞ্জুরী বিকৃতি দেখা যায় ফলন্ত পর্যায়ে। *Fusarium moniliforme* ছত্রাকের সংক্রমণে এ সমস্যা হয়।



প্রতিকার: গাছের আক্রান্ত অংগ ছাঁটাই করতে হবে। বেনলেট ১ মিলি প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অক্টোবর মাসে ২০০ পিপিএম ন্যাফথালিন এসিটিক এসিড স্প্রে করতে হবে। রোগমুক্ত গাছ থেকে চারা সংগ্রহ করতে হবে।

ফল ফেটে যাওয়া (Fruit craking): ফলের বৃদ্ধিকালে দীর্ঘ শুষ্কতা বা পানির কমতি হলে ফলের ত্বক শক্ত হয়ে যায়। তারপর হঠাৎ অধিক বৃষ্টি বা পানি পেলে ফলের ভিতরের অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, এতে ভেতরের চাপ সহ্য করতে না পেরে খোসা ফেটে যায়।



প্রতিকার: ফলের বৃদ্ধি পর্যায়ে নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। মাল্টিং করতে হবে। বর্ষার শেষে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে বরিক এসিড অথবা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স সার প্রয়োগ করে এ সমস্যাটি সমাধান করা যায়।

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ (Alternate Bearing Habit): একান্তরক্রমিক ফল ধারণ বাণিজ্যিকভাবে আম চাষাবাদের একটি প্রধান সমস্যা। আমাদের দেশে চাষযোগ্য অধিকাংশ বাণিজ্যিক জাতগুলো যেমন খিরসাপাত, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, আশ্বিনা, ফজলি ইত্যাদি ফলধারণে একান্তরক্রমিক স্বভাব প্রদর্শন করে। তবে কোন গাছে এক বছর প্রচুর আম ধরলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য বছর কম আম ধরে। একান্তরক্রমিক ফল ধারণের কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কৌলিতাত্ত্বিক কারণ বা জাত বৈশিষ্ট্য, বিরূপ আবহাওয়াজনিত কারণ, বিটপের আকার ও বয়স, কার্বন-নাইট্রোজেন অনুপাত, হরমোনগত অসাম্যতা, সুষ্ঠু কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যার অভাব, অতিরিক্ত ফল ধারণ ইত্যাদি।

প্রতিকার: একান্তরক্রমিক ফল ধারণ রোধ কল্পে কিছু ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন: নিয়মিত ফলধারণ করে এই সমস্ত গাছ নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলো প্রতি বছর ভালো ফলন দেয় অর্থাৎ একান্তরক্রমিক ফল ধারণ এই জাতগুলিতে দেখা যায় না। এ জাতগুলো চাষাবাদের মাধ্যমে একান্তরক্রমিক ফল ধারণ সমস্যা রোধ করা সম্ভব। এ ছাড়া কৃষিতাত্ত্বিক পরিচর্যাসমূহ সময়মত যথাযথভাবে করা, অন ইয়ারে সমস্ত গাছ হতে ২০-৫০ ভাগ পুষ্পমঞ্জুরী ভেঙ্গে দেয়া, ফল সংগ্রহের পর গাছে সুপারিশকৃত মাত্রায় সার ব্যবস্থাপনা এবং অফ ইয়ারে সঠিক সময় ও সঠিক মাত্রায় কালটার (প্যাকলোবিউট্রাজল) প্রয়োগের মাধ্যমে একান্তরক্রমিক ফল ধারণ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব।

আমের গুটি বরা (Fruit dropping): আমের আবাদ করতে গিয়ে চাষীরা উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আমের গুটি বরা সমস্যা। জাতগত বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক কারণ, মাটিতে

আর্দ্রতার ঘাটতি, অতিবৃষ্টি, রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, কচি পাতার আধিক্য (source sink relation), গর্ভমুন্ডের নিম্ন পরাগগ্রাহীতা, বর্ষিষ্ণু ভ্রূনের পুষ্টিহীনতা, সুষম পুষ্টির অভাব, অসময়ে সার প্রয়োগ, দমকা বাতাস, শিলা বৃষ্টি, গাছের নিম্নতেজ ইত্যাদিও কারণে আমের গুটি ঝরে পড়ে পারে। খরাজনিত বা মাটিতে রসের অভাব জনিত কারণে আমের গুটি ঝরে পড়তে পারে। আমের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় মাটিতে রসের অভাব দেখা দেয়। মাটিতে রসের অভাব হলে আমের বাঁটায় দ্রুত নির্মোচন স্তর (abscission layer) তৈরী হয়। যার ফলে আমের গুটি অস্বাভাবিক হারে ঝরে পড়ে। সাধারণত আম গাছে প্রতি মুকুলে বা প্রতি থোকায় জাতভেদে ১-৩০ টি আমের গুটি ধরতে দেখা যায়। গুটি ধারণের ৩০-৪৫ দিনের মধ্যেই প্রতি থোকায় ১-২ টি গুটি থেকে অবশিষ্ট গুটিগুলো প্রাকৃতিক বা অভ্যন্তরীণ কারণে ঝরে পড়ে। এটি গাছ তার ফল ধারণের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করার জন্যই করে থাকে। আমের সুষম বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিকভাবে গুটি ঝরা অত্যন্ত প্রয়োজন। অতিরিক্ত গুটি ঝরে না পড়লে আমের আকার ছোট হয়ে যাবে এবং আমের গুণগত মান ও ফলন কমে যাবে।

প্রতিকার: মাটিতে রসের অভাবজনিত কারণে আমের গুটি ঝরে পড়লে সে ক্ষেত্রে করণীয় হলো নিয়মিত পানির সেচ প্রদান করা। আমের গুটি ধারণের পরপরই অর্থাৎ আমের গুটি মটর দানাকৃতি হলেই প্রথমে একবার গাছের গোড়ায় পানির সেচ প্রদান করতে হবে। প্রথম সেচ দেয়ার পর থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত ১৫ দিন অন্তর অন্তর পানির সেচ দিতে হবে। তবে আমগাছের গোড়ায় সেচকৃত অংশে মালচিং বা জাবড়া হিসেবে সহজলভ্য কচুরীপানা ব্যবহার করলে মাসে একবার সেচ দিলেই যথেষ্ট। তবে সেচ প্রদান সুবিধা না থাকলে শুধু পানি স্প্রে করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। তবে সেক্ষেত্রে আমের গুটি মটরদানাকৃতি হলে প্রতি সপ্তাহে একদিন সকালে পানি স্প্রে করতে হবে। এই সময়ে এক/দুইবার ভালো বৃষ্টিপাত হলে পানি স্প্রের প্রয়োজন হয় না। উল্লেখ্য যে, হঠাৎ করে প্রখর রৌদ্রে আমবাগানে সেচ না দেওয়ায় উত্তম। সেচের পাশাপাশি রাসায়নিক দ্রব্য বা হরমোন প্রয়োগ করেও আমের গুটি ঝরা কমানো যায়। যেমনঃ আমের গুটি মটর দানা আকৃতি হলে প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম ইউরিয়া সার অথবা ন্যাফথালিন এসিটিক এসিড ১২ পিপিএম হারে (NAA @12 ppm) মিশিয়ে হালকা সূর্যের আলোতে আমের গুটিতে স্প্রে করলে আমের গুটি ঝরা কমে যায়। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে কোনক্রমেই যেন প্রখর সূর্যালোকে NAA স্প্রে করা না হয়।

পরগাছা (Parasitic plant): আমাদের দেশে আমগাছে *Cuscuta reflexa*, *Dendrophthoe falcate*, *Loranthus spp.*, *Epiphytic orchids* প্রভৃতি দু-তিন প্রকার পরগাছা জন্মাতে দেখা যায়। স্থানীয়ভাবে পরগাছা ধারা নামে পরিচিত। ছোট গাছের চেয়ে বড় বা বয়স্ক আমগাছে পরগাছার আক্রমণ বেশি হয়। পরগাছার বীজ আমগাছের ডালে অঙ্কুরিত হয়ে বাড়তে থাকে এবং পরগাছা ডাল থেকে প্রয়োজনীয় পানি, খাদ্যরস, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি শোষণ করে বেঁচে থাকে। পরগাছার কোন শিকড় থাকে না, তারা শিকড়ের মতো এক প্রকার হস্টোরিয়া তৈরি করে। হস্টোরিয়া গাছের ডালে প্রবেশ করে ডাল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে। ফলে আক্রান্ত ডাল দুর্বল হয়ে পড়ে। এবং অনেক সময় মারা যায়। *Loranthus* জাতীয় পরগাছার পাতা দেখতে অনেকটা আমপাতার মতোই। তাই ভালোভাবে লক্ষ না করলে দূর থেকে পরগাছার উপস্থিতি বোঝা যায় না। তবে পরগাছায় ফুল ও ফল ধরলে দূর থেকে পরগাছার উপস্থিতি বোঝা যায়। পরগাছার বীজসহ ফল পাখিরা খায়, কিন্তু বীজ হজম না হওয়ায় তা পাখির মলের সাথে বের হয়ে আমের ডালে পতিত হয়ে অঙ্কুরিত হয় ও বাড়তে



থাকে। বর্ষাকালে পরগাছার বীজ বিস্তার লাভ করে। চিত্রে আম গাছে *Loranthus* জাতীয় পরগাছা দেখানো হলো

প্রতিকার: আক্রান্ত ডাল পরগাছার গোড়াসহ কেটে ফেলতে হবে। কাটা স্থানে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। পরগাছায় ফুল-ফল আসার আগেই অপসারণ করা উচিত।

আমের পরিপক্বতা: উপযুক্ত পরিপক্বতায় আম সংগ্রহ করতে হবে। সঠিকভাবে সংগ্রহের উপর আমের পক্বতা, গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে। অপরিণত অবস্থায় আম সংগ্রহ করলে ফলের ভেতরে সাদাটে শক্ত অংশ দেখা যায়, অল্পতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, আমের খোসা কুচকে যায় এবং জাতের প্রকৃত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না। অপরদিকে বেশি পাকা আম সংগ্রহ করলে পোকা ও রোগজীবানুর সংক্রমণ বেশি হয়, সংরক্ষণ ক্ষমতা কমে যায় এবং দুরবর্তী স্থানে পরিবহন সমস্যার সৃষ্টি হয়।

পরিপক্বতার চিহ্ন (Maturity indices): কিছু কিছু লক্ষণ দেখে আমের পূর্ণতা প্রাপ্তি শনাক্ত করা যায়। যেমন-

- ❖ আমের ক্ষেত্রে বোঁটা সংলগ্ন আমের কাধ মোটামুটি সমান হয়ে যাবে এবং ফলের পার্শ্বদেশ পুষ্ট হয়;
- ❖ আমের খোসার উপর সাদা পাউডারের ন্যায় আবরণ পড়বে এবং খোসার বর্ণ গাঢ় সবুজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে;
- ❖ আমের উপরের অংশের অর্থাৎ বোঁটার নিচের ত্বক সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে;
- ❖ ফলের শাঁস হালকা ক্রিম থেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করে;
- ❖ পরিপক্ব আম পানিতে ডুবালে তা সম্পূর্ণরূপে ডুবে যায়;
- ❖ প্রাকৃতিকভাবে দু'একটা আধপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ হয়;
- ❖ আমের বোঁটা থেকে যে আঠা বের হয় তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং একটা স্বচ্ছ বিন্দুর আকারে জমা হয়।

আম সংগ্রহের উপযুক্ত সময়: পরিপক্ব আম গাছ থেকে সংগ্রহ করার অনুমোদিত উপযুক্ত সময় হলো সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আম পারলে আমের কষ কম বের হবে। কষের দাগ থেকে ফলের খোসার উপর দৃষ্টির অগোচরে পোড়ার ন্যায় দাগের সৃষ্টি হয়। এতে করে রপ্তানী বাজার, সুপার মার্কেট এবং দামী হোটেলে প্রেরণের ক্ষেত্রে দাগযুক্ত ফলগুলো বাদ পড়ে যায়। এছাড়া বৃষ্টি হওয়ার পর পরই আম সংগ্রহ করা যাবে না।

ফল সংগ্রহ ও ফল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: আম পাড়ার পূর্বে শ্রমিকদের হাত অবশ্যই ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অনুজীবের অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য অবশ্যই ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আম গাছ হতে আমকে দুভাবে সংগ্রহ যায়, হাত দিয়ে এবং সংগ্রাহক ব্যবহার করে। আমগাছের উচ্চতা কম হলে আম সহজেই হাত দ্বারা পাড়া সম্ভব কিন্তু গাছ বড় হলে বা উচ্চতা বেশি হলে বাঁশের তৈরি আম সংগ্রহক



(mango harvester) বা ঠুঁসির সাহায্যে গাছ থেকে আম সংগ্রহ করা উচিত। একটি চিকন লম্বা বাঁশের মাথায় নেটের ব্যাগ দিয়ে ঠুঁসি তৈরি করা যায়। গাছের শাখা থেকে ঠুঁসির সাহায্যে আম সংগ্রহ করে সরাসরি সংগ্রহ পাত্রে স্থানান্তর করা হয়। মাঠে ব্যবহৃত ফল সংগ্রহের পাত্রের ধারালো বা অমসূন কিনারার কারণে সৃষ্ট কাটা বা ছিদ্রজনিত ক্ষত থেকে আমকে রক্ষার জন্য সংগ্রহ পাত্রের ভিতরের দিকে পরিষ্কার প্লাস্টিক, চটের বস্তা কিংবা পুরাতন খবরের কাগজ

বিছিয়ে নিতে হবে। ফলের গায়ে সৃষ্ট কাটা বা ছিদ্র মূলতঃ ফলের ভিতরের পানি বের হওয়া ও পঁচনের জন্য দায়ী ক্ষুদ্র অনুজীবের প্রবেশ পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ক্ষতযুক্ত ফল থেকে প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন উৎপন্ন হয়, যা ফলের পাকার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। মাঠে ফল সংগ্রহের পাত্র হিসেবে প্লাস্টিক ক্রেট উত্তম। জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র পাতি এবং ফল সংগ্রহের পাত্র অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

গাছ থেকে আম পাড়া এবং বাগানে আম হ্যান্ডলিংয়ের সময় ফলের অপচয় ও অবনতি কমানোর কলাকৌশল-

- ❀ অনুজীবের অনুপ্রবেশ ও সংক্রমণ ঠেকানোর জন্য আম পাড়ার আগে শ্রমিকদের হাতমুখ অবশ্যই পরিষ্কার পানি দ্বারা ধোত করতে হবে।
- ❀ ফলের গায়ে যাতে কষ লেগে না যায় সেজন্য ২-৩ সেমি বোঁটাসহ আম পাড়তে হবে।
- ❀ ক্ষত থেকে আমকে রক্ষার জন্য সংগ্রহপাত্রের ভেতরে দিকে পরিষ্কার প্লাস্টিক, চট বা পুরনো খবরের কাগজ বিছিয়ে নিতে হবে।
- ❀ ফাটা, আঘাতপ্রাপ্ত, খেঁতলানো বা ক্ষতযুক্ত আম অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে।
- ❀ আম ভর্তি পাত্র অত্যন্ত যত্নের সাথে মাটিতে রাখতে হবে। কোনোভাবেই সংগৃহীত আম সরাসরি মাটির ওপর ঢালা যাবে না। মাটির সংস্পর্শে এলে ফলগুলো অনুজীব দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। এজন্য মাটিতে ত্রিপুর অথবা মোটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর সংগৃহীত আম ঢালতে হবে।
- ❀ সংগৃহীত আমগুলোকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- ❀ সংগৃহীত ফলকে সূর্যালোক থেকে দূরে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে যাতে ফলের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বেড়ে না যায়।



আমের সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম: কোন নির্দিষ্ট মার্কেটের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সতেজ পণ্যের জন্য যে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়, সেগুলিকে একত্রে সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম বলে। এই কার্যক্রমগুলি মাঠে অথবা কালেকশন সেন্টারে কিংবা প্যাকহাউজে সম্পাদিত হতে পারে। প্যাকিং এরিয়া রোড বা বৃষ্টি থেকে নিরাপদ হতে হবে, সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং পোষা প্রাণীরা যাতে সেখানে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্যাকহাউজে কর্মরত সকল কর্মীদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে অনুজীবের সংক্রমণ ঠেকাতে হবে। প্যাকহাউজের আশেপাশের জায়গাগুলোও সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে আমের সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

ছাঁটাইকরণ বা ট্রিমিং: আমের বোটা ছাঁটাই বলতে ফলের সাথে লেগে থাকা বোঁটা অপসারণ বুঝায়। আমের সাথে লেগে থাকা বোঁটার ১-২ সেমি পরিমাণ রেখে বাড়তি অংশ কেটে ফেলতে হবে। অন্যথায় আমের কষ আমের গায়ে লেগে লেটেক্স বার্ণ হতে পারে।

আমের কষ অপসারণ: তাজা কষ আম থেকে বের করে দেয়াকে কষ অপসারণ বলে। কাজটি করার জন্য সাধারণত একটি ধারালো পরিষ্কার কাঁচি বা সিকেচারের সাহায্যে ফলের বোঁটা আমের কাঁধ বরাবর কেটে ফেলতে হবে। অতঃপর বোঁটা ছাঁটাইয়ের পর আমগুলোকে বিশেষভাবে তৈরি একটি প্লাস্টিক বা স্টিলের জালযুক্ত তাকে উপর করে

৩০ মিনিটের জন্য রাখতে হবে, যাতে কষ ভালোভাবে বের হয়ে যায়। কখনই চট বা বস্তার ওপর আম উল্টা করে রাখা যাবে না। এতে ফলের গোড়ার অংশে কষ লেপটে যাবে। তাছাড়া বোঁটা ছাঁটাইয়ের সাথে সাথে আমগুলোকে ১% ফিটকিরির দ্রবণে (৫০ লি. পানিতে ৫০০ গ্রাম ফিটকিরির পাউডার মেশাতে হবে) ১ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। ফিটকিরি আমের কষকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে ক্রেটে ফল ভরে ক্রেটসহ আমকে ফিটকিরির দ্রবণে ডুবিয়ে দেয়া যায়। অতঃপর ১ মিনিট পর ফলগুলো তুলে গায়ের পানি শুকিয়ে নিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

সার্টিং বা বাছাইকরণ: সংগৃহীত আমের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বাছাইকরণ একান্ত প্রয়োজন। আঘাতপ্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত, পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত এবং গাছ পাকা আম পৃথক করে রাখতে হবে কারণ এসব আম খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। আম সংগ্রহের পর গুণগতমানের ওপর ভিত্তি করে আমগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে হবে।



ভালো গুণাগুণসম্পন্ন নিরাপদ আমগুলো পরিপক্ব, উত্তম গঠন বিশিষ্ট, পরিষ্কার, রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত এবং যান্ত্রিক ক্ষত যেমন: কাটা, ফাটা, ছিদ্রযুক্ত, খেঁতলানো ইত্যাদি মুক্ত হতে হবে। এছাড়াও ফলগুলো অনুজীব, রাসায়নিক এবং বাহ্যিক দূষণ মুক্ত হতে হবে। অন্যদিকে ফল সংগ্রহের পূর্বে বিভিন্ন ক্রটি যুক্ত (পোকা যেমন- সিসিড ফ্লাই, ফুট ফ্লাই এবং থ্রিপস আক্রান্ত আম; অথবা রোগ যেমন- স্কাব কিংবা স্যুটি মোল্ড আক্রান্ত আম; ফল সংগ্রহ ও পরবর্তী হ্যান্ডলিংজনিত ক্ষত যেমন: কষের দাগ, খেঁতলানো, ঘর্ষণ ও চাপজনিত ক্ষত, কাটা, ফাটা ও ছিদ্রযুক্ত আম এবং অপরিপক্ব অবস্থায় পাকানো) আমগুলো সাধারণত বাতিল হিসেবে গণ্য হবে।

গ্রেডিং বা শ্রেণিকরণ: ফলের আকার, আকৃতি ও পরিপক্বতার ধাপ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিভুক্তকরণ কে গ্রেডিং বলে। যে কোন ফল প্যাকিং, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে সুবিধার জন্য প্যাকিং এর পূর্বে ছোট, মাঝারি এবং বড় এই তিন ভাগে ভাগ করা উচিত।

সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে গরম পানিতে আম শোধন: ফুটফ্লাই হলো আমের একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। এটি একটি কোয়ারেন্টাইন পেস্ট। বিদেশে রপ্তানির জন্য অবশ্যই আমকে এই পোকাকার এই পোকাকার ডিম, লার্ভা কিংবা পূর্ণঙ্গ পোকা মুক্ত হতে হবে। এ জন্যই প্রধানত গরম পানিতে আম শোধন করা হয়। এছাড়া সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে আমের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ হলো এ্যানথ্রাকনোজ ও স্টেম এন্ড রট। সুবজ থাকা অবস্থায় আমে এ দুইটি রোগ শনাক্ত করা যায় না। শুধুমাত্র ফল পাকার পর এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আমের সংগ্রহ পূর্ব এবং সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রোগ দুইটি নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব। রোগ দুইটি দমনের জন্য গরম পানিতে আম শোধন করা সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। গরম পানিতে শোধনের ক্ষেত্রে সবুজ পরিপক্ব আমকে ৫২-৫৫° সে. তাপমাত্রায় জাতভেদে ৫-১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয়। এ তাপমাত্রা সীমার মধ্যে রোগের জীবাণু মারা যায় কিন্তু ফলের কোনো ক্ষতি হয় না। যদি পানির তাপমাত্রা ৫২° সে. এর নিচে নেমে যায় তবে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা কমে যায়। আবার তাপমাত্রা ৫৫° সে. এর ওপরে উঠে গেলে আমের চামড়া-খোসা বলসে যায়। কাজেই সঠিকভাবে আম শোধনের জন্য পানির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বজায় রাখা আবশ্যিক। এ ক্ষেত্রে বারি আম শোধন যন্ত্র অত্যন্ত কার্যকর। এ যন্ত্র স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানির তাপমাত্রা ৫২-৫৫° সে. সীমার মধ্যে বজায় রাখে। আমকে গরম পানিতে ট্রিটমেন্ট করলে আমের রঙ কিছুটা হলুদ হয়, বেশ কিছুদিন রোগমুক্ত থাকে এবং আমের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমকে ৪৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৬০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে পোকা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ফলের গুণমান অধিক ভাল



থাকে। অষ্ট্রেলিয়াতে আম রপ্তানির ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াতেই আম শোধন করা বাধ্যতামূলক। শোধন শেষে প্যাকেজিং এর পূর্বে আমের গায়ের পানি অবশ্যই শুকিয়ে নিতে হবে। দ্রুত পানি শুকানোর জন্য আমসহ ক্রেটগুলিকে বড় স্ট্যান্ড ফ্যানের সামনে রাখা যেতে পারে।

প্যাকিং/প্যাকেজিং: আম সংগ্রহের পর ভোক্তার নিকট পৌছানোর জন্যে আমের যে ব্যবস্থাপনা করা হয় তাকে প্যাকেজিং বলে। পরিবহন ও পরবর্তী হ্যান্ডলিং কার্যক্রমের সময় ফলের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য যথাযথভাবে প্যাকেজিং করা আবশ্যিক। প্যাকেজিং উপাদান হতে হবে শক্ত কনটেইনার যেমন- প্লাস্টিক ক্রেট, বাঁশের ঝুড়ি, কার্টন বা ফাইবার বোর্ডের বাক্স যা প্যাকেটের ভেতরের পণ্যকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দেয়, সহজভাবে হ্যান্ডলিং করা যায়, আকর্ষণীয় ও সুবিধা জনক হয় এবং ভেতরের পণ্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ভোক্তার জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা যায়। আম দূরবর্তী স্থানে পাঠানোর জন্য প্যাকিং একান্ত প্রয়োজন। কেননা আমের শরীর বেশ নরম এবং সামান্য আঘাতে জখম হতে পারে এবং তাতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের জন্য স্বাভাবিক, উজ্জ্বল এবং পরিপুষ্ট আম বাছাই করে প্যাকিং করতে হবে। প্যাকিং এর সময় নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমাদের দেশে আম প্যাকিং এ প্রধানত বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয়। বাঁশের ঝুড়ির চাইতে ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্স আম পরিবহন অধিক কার্যকর। তবে সবচাইতে ভাল ব্যবস্থা হলো প্লাস্টিকের ক্রেট। আম পরিবহনের সময় প্রতিটি প্যাকেটের তলায় কিছু খড় বিছানো এবং প্রতিটি আমকে টিসু পেপার বা খবরের কাগজ দ্বারা মুড়িয়ে দেওয়া ভাল। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে ফলের নাম, জাতের নাম, প্রাপকের নাম, উৎপাদকের নাম ইত্যাদি লিখে রাখা উচিত। হ্যান্ডলিং, পরিবহন, পণ্যসহ ক্রেটগুলো উঠানো, সাজানো এবং নামানোর সময় সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে। ক্রেটগুলোকে কোনোভাবেই ওপর থেকে ফেলা যাবে না এবং সর্টিং-গ্রেডিংয়ের সময় খালি ক্রেটগুলোকে বসার সিট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।



অন্যদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে করুগেটেড ফাইবার বোর্ডের (CFB) কার্টন ব্যবহার করতে হবে। বক্সগুলির মাঝখান বরাবর একটি খাড়া ডিভাইডার থাকতে হবে এবং চারপাশের দেয়ালে বায়ু চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছিদ্র থাকতে হবে, যাতে কার্টনের ভিতরের তাপমাত্রা বেড়ে না যায়।

ক্রেট এর যত্ন: প্রতিবার ব্যবহারের পর ক্রেটগুলি সাবান বা ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। খালি ক্রেটগুলোকে পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে যাতে পোকামাকড় ও ইঁদুর এগুলোর ক্ষতি করতে না পারে। এছাড়া রাসায়নিক দ্রব্য ও খামার যন্ত্রপাতি থেকে ক্রেটগুলোকে আলাদা রাখতে হবে। ক্রেটগুলি যাতে জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ক্রেটগুলোকে বাইরের খোলা পরিবেশে রাখা যাবে না। তাছাড়া ফল বা সবজি পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক ক্রেটে কোনোভাবেই সার, কীটনাশক বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্রব্য রাখা বা পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

পরিবহন: পরিবহনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ফলকে ভালো অবস্থায় সর্বশেষ বাজারে সরবরাহ করা, যেখান থেকে ভোক্তারা এটি কিনবে। সরবরাহ চেইনের বিভিন্ন পয়েন্টে যেমন বাগান/মাঠ থেকে কালেকশন সেন্টার বা প্যাকহাউস, প্যাকহাউস/কালেকশন সেন্টার থেকে পাইকারি বাজার এবং পাইকারি বাজার থেকে খুচরা বাজার। আমাদের দেশে প্রধানত সড়ক পথেই আম পরিবহন করা হয় কারন এতে সময় অল্প লাগে। তাছাড়া বাগান থেকে বাজারে আম

নিরাপদ স্রবজি ও ফল উৎপাদন

পরিবহনের জন্য রিকসা, ভ্যান, নৌকা, ছোট ট্রাক ও গরুর গাড়িও ব্যবহার করা হয়। ট্রাক থেকে ফল ভর্তি ক্রেট বা প্যাকেট নামানো এবং বাজারের একস্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের কাজে চার চাকার হস্তচালিত টলি ব্যবহার করা যেতে পারে।



এটি পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক এবং পণ্যের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কম হয়। ফল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।

ফল পরিবহনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে:

- ❖ আম পরিবহনের ক্ষেত্রে আম ভর্তি কনটেইনারগুলো সাবধানতার সাথে ওঠানামা করতে হবে।
- ❖ যানবাহনে আম উঠানো, নামানো ও পরিবহনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন ফলের গায়ে বা প্যাকেটে আঘাত না লাগে।
- ❖ পরিবহনের ওপর আমের প্যাকেটগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন মাঝখানে বায়ু চলাচলের জন্য ফাঁকা জায়গা থাকে।
- ❖ প্রয়োজনে হালকা রঙের ত্রিপল বা কাপড় ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো তাপ শোষণ করে না।
- ❖ গাড়িতে সাজানো বা স্টেকিংয়ের সময় স্টেকের নিচের কনটেইনারগুলোকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।
- ❖ পরিবহনে বেশি সময় নষ্ট না করাই ভাল কারন তাতে আম পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ❖ পরিবহন শেষ হলেই প্যাকেট খোলা ও আম গুদামজাত করা উচিত।
- ❖ গাদাগাদি করে আম পরিবহন করলে নিচের আমে বেশি চাপ পড়ে ও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গুদামজাতকরণ: গাছ থেকে আম পাড়ার পর বিক্রয় পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে আমকে গুদামজাত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আম গাছ থেকে পাড়ার পরও তার মধ্যে বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। তাই আম গুদামজাত করার সময় নিম্নলিখিত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

- ❖ যে ঘরে আম রাখা হবে তা অবশ্যই বাতাস চলাচলের উপযোগী ও শীতল হতে হবে। গুদামঘরটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলে ভালো হয়। প্রয়োজনে ইলেকট্রিক ফ্যান ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ❖ আর্দ্র আবহাওয়ায় ও বন্ধ ঘরে আম তাড়াতাড়ি পাকে এবং সহজে পচন ধরে যায়। তাই পাকা আম বেশি দিন গুদামে সংরক্ষণ না করে তাড়াতাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।

আম সংরক্ষণ: উপযুক্ত পরিপক্ক-সবুজ আম (স্টেজ-২/৩) 12 ± 1 ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও $90 \pm 5\%$ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সংরক্ষণকৃত আম জাতভেদে ১৫-২৫ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

বাজারজাতকরণ: যে কোন জিনিস বাজারজাতকরণ একটি সুন্দর আর্ট। দক্ষ ব্যবসায়ীগণ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন যাতে ক্রেতাসাধারণ অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। আম বাজারজাতকরণের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম মেনে চলা উচিত।

- ❖ আমের ক্রেট বা প্যাকেটগুলো গাড়ি থেকে সাবধানতার সাথে নামাতে হবে যেন কোনো প্রকার যান্ত্রিক ক্ষতি না হয়।
- ❖ সটিং টেবিলের ওপর রেখে ফলগুলো পুনঃবাছাই করতে হবে এবং ক্ষতযুক্ত ফলগুলোকে আলাদা করতে হবে।

- ❖ বিশেষ বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্যে রেখে ফলের আকার, আকৃতি, বর্ণ ও পরিপক্বতার ওপর ভিত্তি করে আমগুলোকে পুনঃগ্রেডিং করতে হবে।
- ❖ বেশি পাকা আম আগে বিক্রয় করতে হবে।
- ❖ কোন আমে পচন দেখা মাত্রই তা আলাদা করতে হবে কারণ এর জীবানু অন্যান্য সুস্থ আমকে আক্রমণ করতে পারে।
- ❖ ছোট, মাঝারি ও বড় তিন সাইজের ফল বাছাই করে বাজারজাত করতে হবে।
- ❖ বাজারজাতকৃত আমের গাদায় জাতের নাম এবং দর লিখে রাখতে হবে।
- ❖ দোকানে আমগুলোকে পরিষ্কার তাক কিংবা পরিষ্কার পাত্রের মধ্যে রেখে প্রদর্শন করতে হবে।
- ❖ দিনশেষে অবিক্রীত আমগুলো ভালো বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হবে।



আমের গুরুত্বপূর্ণ জাতসমূহের পরিপক্বতা ও সংগ্রহের সময়সূচী

জেলা	গোপালভোগ	খিরসাপাত/হিমসাগর	ল্যাংড়া	বারি আম-২	হাড়িভাঙ্গা	ব্যানানা ম্যাংগো	বারি আম-৩	ফজলি	বারি আম-৪	বারি আম-১২
বান্দরবান	-	-	-	-	-	৬ জুন	১৬ জুন	-	১৯ জুন	-
রাঙ্গামাটি	-	-	-	-	-	৭ জুন	১৭ জুন	-	২০ জুন	-
সাতক্ষীরা	১৫ মে	২৬ মে	১০ জুন	-	-	-	১৮ জুন	-	-	-
খাগড়াছড়ি	-	-	-	-	-	৯ জুন	২০ জুন	-	২২ জুন	-
চুয়াডাঙ্গা	১৭ মে	২৯ মে	১১ জুন	-	-	-	২১ জুন	-	২৪ জুন	-
যশোর	১৭ মে	২৯ মে	১১ জুন	-	-	-	২১ জুন	-	২৪ জুন	-
মেহেরপুর	১৮ মে	৩০ মে	১২ জুন	-	-	-	২২ জুন	২৩ জুন	২৪ জুন	-
কুষ্টিয়া	২০ মে	৩০ মে	১১ জুন	-	-	-	২২ জুন	২৪ জুন	২৬ জুন	-
নাটোর	২৫ মে	৩০ মে	১২ জুন	১৬ জুন	-	১৬ জুন	২৫ জুন	২৬ জুন	৫ জুলাই	-
রাজশাহী	২৫ মে	৩০ মে	১২ জুন	১৬ জুন	-	১৮ জুন	২৫ জুন	২৬ জুন	৫ জুলাই	০১ আগস্ট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৬ মে	০৫ জুন	১৫ জুন	১৮ জুন	২০ জুন	২২ জুন	২৭ জুন	৩০ জুন	৬ জুলাই	০৫ আগস্ট
নওগাঁ	০১ জুন	০৮ জুন	১৭ জুন	-	২২ জুন	২৩ জুন	২৮ জুন	৩০ জুন	৮ জুলাই	১০ আগস্ট
রংপুর	৩০ মে	-	১৮ জুন	-	২৩ জুন	২৪ জুন	৩০ জুন	-	১৫ জুলাই	১২ আগস্ট
দিনাজপুর	০২ জুন	১৮ জুন	২০ জুন	-	২৪ জুন	২৮ জুন	০১ জুলাই	-	২০ জুলাই	১৩ আগস্ট
ঠাকুরগাঁও	০৪ জুন	-	-	-	২৬ জুন	৩০ জুন	০৪ জুলাই	-	২২ জুলাই	১৫ আগস্ট

ফলন

আমের ফলন গাছের বয়স, রোপণ দূরত্ব ও জাতভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ ছাড়া পরিচর্যা, জলবায়ু, পোকামাকড় প্রভৃতি বিষয়ও এর জন্য দায়ী। সাধারণত গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে ফলন বৃদ্ধি পেলেও ৫০ বছরের পর ফলন কমতে থাকে। কলমের গাছে ৩ বছর বয়সে প্রায় ২০-২৫ টি, ৫ বছর বয়সে ৪০-৪৫ টি, ১০ বছর বয়সের গাছে ৪০০-৬০০টি এবং ২০-৪০ বছর বয়স্ক গাছে ১০০০-৩০০০টি আম ধরে থাকে।

লিচু

লিচু (*Litchi chinensis*) হল Sepindaceae পরিবারের সদস্য। লিচু গাছ থেকে রসাল শাঁসযুক্ত ছোট ছোট ফল পাওয়া যায়। ফলটির বহিরাবরণ অমসৃণ ও লালচে গোলাপি বর্ণের। আবরণটির ভেতরে থাকে সুমিষ্ট রসাল শাঁস। চমৎকার গুণাগুণ সম্পন্ন এই শাঁস আকর্ষণীয়, সুস্বাদু ও রসালো। দক্ষিণ চায়না, উত্তর ভিয়েতনাম এবং মালয়েশিয়া লিচুর উৎপত্তিস্থল। টাটকা ফল হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি এর চাষ হয়। তবে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় অধিক লিচু উৎপন্ন হয়। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে লিচু থেকে সুস্বাদু খাদ্য উৎপাদন করা যায়। প্রতি বছর প্রায় ৮ হাজার হেক্টর জমি থেকে প্রায় ১ লক্ষ মেট্রিক টন লিচু উৎপন্ন হয় (বিবিএস ২০২৪)।

পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা লিচুতে ৮৪.১ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৫ গ্রাম খনিজ, ০.৫ গ্রাম আঁশ, ১.১ গ্রাম আমিষ, ০.২ গ্রাম চর্বি, ১৩.৬ গ্রাম শর্করা, ১০.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৭ মি.গ্রা. লৌহ, ০.০২ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ০.০৬ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-২, ৩১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ৬১ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

জলবায়ু ও মাটি

উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু লিচু চাষের জন্য উত্তম। উর্বর ও সুনিষ্কাশিত পলিমাটি, দো-আঁশমাটি, এঁটেল মাটি, চুনযুক্ত মাটি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের মাটিতে সাফল্যজনকভাবে লিচুর চাষ করা সম্ভব। সুনিষ্কাশিত পলিমাটি লিচু চাষের জন্য সর্বোত্তম। মাটির অম্ল-ক্ষারকত্ব (pH) ৫.৫-৬.৫ লিচুর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। ক্ষারীয় মাটিতে গৌন উপাদান সমৃদ্ধ সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। লিচু গাছ স্বল্পস্থায়ী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে তবে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়। লিচু অগ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল। সংক্ষিপ্ত ঠান্ডা, শুষ্ক, বরফমুক্ত শীতকাল এবং উচ্চ বৃষ্টিপাত ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্পন্ন দীর্ঘ উষ্ণ গ্রীষ্মকাল সমৃদ্ধ অঞ্চলে লিচু সবচেয়ে ভাল হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২০০ মিলিমিটার ও ৭০-৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা লিচু চাষের উপযোগী। লিচু গাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য মাটিতে মাইকরাইজা নামক ছত্রাকের উপস্থিতি প্রয়োজন। এজন্য পুরাতন গাছের গোড়ার মাটি নতুন গাছের বৃদ্ধি ও জন্য সহায়ক।

জাত

বাংলাদেশে অনেক জাতের লিচুর চাষ হয়। তারমধ্যে বেদানা, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ী, মোজাফফরপুরী, চায়না-৩, কদমী অন্যতম। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ফল বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিন নিরলস প্রচেষ্টায় ৫টি লিচুর জাত উদ্ভাবিত হয়েছে যার প্রতিষ্ঠানিক নাম বারি লিচু-১, বারি লিচু-২, বারি লিচু-৩, বারি লিচু-৪ ও বারি লিচু-৫। জাতগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে দেয়া হল।

বারি লিচু-১: নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। এ জাতটি ১৯৯৬ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-১/১৯৯৬। মাঘের (জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি) ১ম সপ্তাহে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের (মে মাসের মাঝামাঝি) ১ম সপ্তাহে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের গড় ওজন ২০ গ্রাম, ফল ডিম্বাকার ও রং লাল। শাঁস মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৫%। রাজশাহী ও পাবনা অঞ্চলের জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি লিচু-২: নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত এবং ১৯৯৬ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-২/১৯৯৬। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য উপযোগী। মধ্য মাঘে (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে) গাছে ফুল আসে এবং আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহে (জুনের মাঝামাঝি) ফল আহরণ উপযোগী হয়। পাকা ফলের রং গোলাপি লাল,

প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১৬ গ্রাম। শাঁস মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (বিক্রমান ১৬.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। হেক্টর প্রতি ফলন ৫-৬ টন।

বারি লিচু-৩: মাঝ-মৌসুমী ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উন্নত জাত। এ জাতটি ১৯৯৬ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-৩/১৯৯৬। মধ্য মাঘে (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে) গাছে ফুল আসে এবং মধ্য জ্যৈষ্ঠে (জুনের প্রথম সপ্তাহে) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের গড় ওজন ১৯ গ্রাম, ফল বেশি মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (বিক্রমান ১৯.০%)। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লাল। বীজ খুব ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৫%। সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ৫-৬ টন।

বারি লিচু-৪: মাঝ-মৌসুমী অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন লিচুর একটি উচ্চ ফলনশীল এবং উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত। এ জাতটি ২০০৮ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-৪/২০০৮। মধ্য মাঘে (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে) গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে (জুনের মাঝামাঝি) ফল আহরণ উপযোগী হয়। পাকা ফলের রং উজ্জ্বল লাল। ফলের গড় ওজন ২৭ গ্রাম, ফল মাংসল, রসালো ও খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২২.০%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের (রংপুর, দিনাজপুর) জন্য উপযোগী। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি লিচু-৫: নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি ২০১২ সালে মুক্তায়ন করা হয় যার নিবন্ধন নম্বর ০৪(০২)-০৯/২০১২। মাঘের ১ম সপ্তাহে (জানুয়ারির মাঝামাঝি) গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের ২য় সপ্তাহে (মে মাসের শেষে) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফলের রং আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল। ফলের গড় ওজন ২১ গ্রাম, সুস্বাদু এবং মিষ্টি (বিক্রমান ১৯%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৩%। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১২ টন। বৃষ্টিবহুল পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বংশ বিস্তার

বীজ থেকে সহজেই লিচুর বংশ বৃদ্ধি করা সম্ভব। তবে বীজ হতে বংশবৃদ্ধি হলে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি অপরিহার্য। লিচুর বংশবৃদ্ধির জন্য গুটি কলম একটি উত্তম পদ্ধতি হিসেবে সর্বত্রই স্বীকৃত। রোগ ও পোকা মাকড় মুক্ত সুস্থ গাছের এক-দুই বছর বয়সের যে সমস্ত ডাল ৪৫ ডিগ্রী কোনে হেলে আছে সে সব ডালেই গুটিকলমের জন্য উত্তম। জুন- জুলাই মাস লিচুর গুটি কলম বাঁধার উপযুক্ত সময়। ডালের আগা থেকে ৪০-৬০ সেন্টিমিটার নিচে ২-৩ সেন্টিমিটার পরিমাণ বাকল বৃত্তাকারে কেটে ফেলতে হয়। ডালের ক্যান্ডিয়াম স্তর অপসারণ করে জৈবসার সমৃদ্ধ কাদা মাটি দ্বারা কর্তিত অংশ আবৃত করে পলিথিন সীট দ্বারা বেঁধে রাখা হয়। শিকড় আসতে প্রায় দু'মাস সময় নেয়। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে শিকরের রং বাদামী রং ধারণ করলে তা ২-৩ টি ধাপে কেটে গুটি নামিয়ে পলিব্যাগ, মাটির টব বা বীজতলায় স্থাপন করার পর যথাযথ পরিচর্যা নিলে এগুলো বেশির ভাগ টিকে যায়। এ সময় এতে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গুটি কলম সংগ্রহ করার সময় শাখার অর্ধেক পাতা ফেলে দিলে কলমের সফলতা বৃদ্ধি পায়। এক বছর পর গুটি কলম মূল জমিতে রোপণের উপযোগী হয়। বংশ বৃদ্ধির জন্য লিচুতে ভিনিয়ার ও ক্রফট গ্রাফটিং করা যেতে পারে।

উৎপাদন কলাকৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরি: লিচুর জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। কয়েকটি চাষ দিয়ে জমি ভালভাবে তৈরি করতে হবে। মই অথবা লেভেলার দিয়ে জমি সমতল করতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে অবশ্যই বছবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে। বসত ভিটায় দু-একটি গাছ রোপণ করতে চাইলে জমি তৈরি না করে সরাসরি গাছ রোপণের জন্য গর্ত করলেই হবে। এছাড়া পুরাতন বাগান থেকে অল্প

কিছু মাটি গর্তে দিলে মাইকড়াইজার সমাবেশ ঘটান ফলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

রোপণ প্রণালী: সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর প্রণালীতে কলম রোপণ করতে হবে।

কলমের চারা নির্বাচন: রোপণের জন্য এক বছর বয়স্ক সুস্থ সবল গুটি কলম নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়: মে থেকে জুন মাস লিচুর কলম রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষ দিকে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য অক্টোবর) মাসেও লিচুর কলম রোপণ করা যায়।

গর্ত তৈরি: কলম রোপণের অন্তত ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৮-১০ মিটার দূরত্বে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি. আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ২০-২৫ কেজি পঁচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৪০০ গ্রাম এমওপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৪০-৬০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

কলম রোপণ: গর্তে সার প্রয়োগের ১৫ দিন পর মাটির বল সহ কলম গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। কলম রোপণের পর পরই খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং পানি সেচ ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার। বর্ষার শুরুতে এবং বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের প্রধান কাণ্ডটি যাতে ১.০-১.৫ মিটার সোজাভাবে বাড়তে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে।

মুকুল ভাঙ্গন: কলমের চারার ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-২০	২০ এর উর্ধ্ব
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	২০০০
টি এস পি (গ্রাম)	৪০০	১২০০	২০০০	৩০০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	১৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৫০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ: চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ের একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট

তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া একান্ত দরকার। অপরদিকে, বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে তার জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আন্তঃফসলের চাষ: লিচু গাছ ছোট থাকা অবস্থায় গাছের মাঝের ফাঁকা জায়গায় সরিষা, আদা, হলুদ ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজির চাষ করা যায়।

অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও রোগবালাই এবং অন্যান্য সমস্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা: ফল ছিদ্রকারী পোকা লিচুর অন্যতম প্রধান শত্রু। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বোঁটার নিকট দিয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এতে অনেক অপরিপক্ক ও পরিপক্ক ফল বারে যায়। এছাড়া বীজ খাওয়ার দরুণ করাতের গুড়ার মত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং বোঁটার কাছে জমে থাকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

দমনব্যবস্থা: বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির গভীরে পুতে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক (রিপকর্ড/সিমবুশ/সুমিসাইডিন /ডেসিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে) ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে শেষ স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়: লিচু গাছের পাতা, ফুল ও ফলে এর আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং এর নিচের দিকে লাল মখমলের মত হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে মরে যায়। আক্রান্ত ডালে ফুল, ফল বা নতুন পাতা হয় না এবং আক্রান্ত ফুলে ফল হয় না।

দমন ব্যবস্থা: ফল সংগ্রহের সময় মাকড় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এ্যাবামেকটিন গ্রুপের মাকড় নাশক (ভারটিম্যাক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে) নতুন পাতায় ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

লিচু গাছের মাজরা পোকা: এই পোকার কীড়া লিচু গাছের কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। আক্রান্ত অংশ রেশমি পর্দা দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। এরা ছাল খাওয়া শেষ করে পরবর্তীকালে কাণ্ড খেতে থাকে। অতি মাত্রায় আক্রান্ত হলে গাছের প্রাণরস সম্বলনে বাধার সৃষ্টি হয় এবং গাছের সজীবতা হ্রাস পায়। চারাগাছ আক্রান্ত হলে গাছ মারাও যেতে পারে।

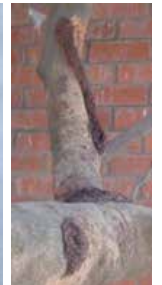
দমন ব্যবস্থা: আক্রমণ দেখা গেলে কীড়ার তৈরি ছিদ্র পথে সুচালো আগাযুক্ত লোহার শিক ঢুকিয়ে ভিতরে লুকিয়ে থাকা কীড়া মেও ফেলা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে আক্রান্ত অংশ পরিষ্কার করে এক খন্ড তুলা পেট্রোল, কেরসিন, ক্লোরফর্ম ইত্যাদিতে ভিজিয়ে গর্তের ভিতরে ঢুকিয়ে বা ন্যাফথলিনের গুড়া গর্তের ভিতরে দিয়ে ছিদ্রপথ কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।



ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত ফল



মাইট আক্রান্ত পাতা ও ফল



মাজরা পোকা আক্রান্ত কাণ্ড

বাদুর: লিচুর অন্যতম প্রধান শত্রু বাদুর। এরা পরিপক্ব ফলে আক্রমণ করে। ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক রাতের অসাবধানতায় এরা গাছের সমস্ত ফল বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। মেঘলা রাতে বাদুরের উপদ্রব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

দমন ব্যবস্থা: বাদুর তাড়ানোর জন্য রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত গাছ জালের সাহায্যে ঢেকে দিয়েও বাদুরের আক্রমণ রোধ করা যায়। বাগানে গাছের উপর দিয়ে শক্ত ও চিকন সুতা বা তার টাঙ্গিয়ে রাখলে বাদুরের চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়।

পাউডারী মিলডিউ: এ রোগের আক্রমণে লিচুর মুকুলে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত মুকুল নষ্ট হয় ও বারে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা: গাছে মুকুল আসার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে একবার এবং একমাস পর আর একবার থ্রোপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাক নাশক (টিল্ট ২৫০ ইসি নামক ছত্রাক নাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি লিটার অথবা কুমলাস/সালফোলাক/ ম্যাগসালফার প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে) স্প্রে করতে হবে।

লিচুর ফল পচা রোগ: অ্যানথ্রাকনোজ বা লিচুর ফল পচা রোগ একটি ছত্রাকজনিত রোগ, যা লিচুর ফল, পাতা, কাণ্ড এবং ফুলে আক্রমণ করে। এটি ফলের পেরিকার্পে বাদামী বা কালো ক্ষত সৃষ্টি করে এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফল পচে যায়। এর ফলে লিচুর গুণগত মান এবং ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

দমন ব্যবস্থা: বাগান পরিষ্কার রাখতে হবে, আক্রান্ত মরা ডালপালা অপসারণ করে কাটা অংশে বর্দোপেষ্ট লাগাতে হবে, গাছের নিচে পড়া মরা পাতা কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছে মুকুল আসার পর ফুল ফোটার পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা অটোস্টিন ২.০০ গ্রাম মিশিয়ে সমস্ত মুকুল ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এর এক মাস পর আর একবার ফল মটর দানার মত হলে আরেকবার গাছের পাতা, ফল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। পচা ফল সংগ্রহ করে গাছ থেকে দূরে মাটির নিচে পুতে ফেলতে হবে এবং ফলের রং ধারণ পর্যায়ে আর একবার স্প্রে করতে হবে।

ফল ফেটে যাওয়া: বাড়ন্ত ফলের ত্বক বলসে যাওয়া এবং ফেটে যাওয়া লিচুর একটি মারাত্মক সমস্যা। উচ্চ তাপমাত্রা, নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং মাটিতে রসের ঘাটতি থাকলে এ সমস্যা বেশি হয়। দীর্ঘ খরার পর হঠাৎ অধিক বৃষ্টি হলে এ সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করে। জাত ভেদেও খোসা বলসে যাওয়া ও ফল ফেটে যাওয়া সমস্যার তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ক্যালসিয়াম ও বোরনের অভাবেও ফল ফাটার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার: ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় নিয়মিত সেচ দিতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম বোরিক এসিড মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ধান, গম বা ডাল জাতীয় ফসলের খড় দ্বারা মালচিং করতে হবে।

ফল ঝরা: লিচুতে প্রাথমিক ফল ধারণ হার অনেক বেশি হলেও ফল ঝরে যাওয়ার দরুণ শেষ পর্যন্ত খুব কম পরিপক্ব ফল আহরণ করা সম্ভব হয়। ধরার পর থেকে শুরু করে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত ফল ঝরা চলতে থাকে। ফল ধরার ২-৪ সপ্তাহ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফল ঝরে। মাটিতে রসের অভাব, অতি উচ্চ তাপমাত্রা ও ফলছিদ্রকারী পোকের আক্রমণ ফল ঝরার প্রধান কারণ।

প্রতিকার: নিয়মিত পরিমিত পরিমাণ সার ও সেচ প্রদান এবং ধান, গম অথবা ডাল জাতীয় ফসলের খড় দ্বারা মালচিং করতে হবে। ফলছিদ্রকারী পোকা দমন করতে হবে।

পরিপক্বতার লক্ষণ:

- ✿ ফলের খোসার কাঁটাগুলো অনেকটা সমান হয়ে যাবে
- ✿ খোসায় অ্যানথোসায়ানিন উৎপন্ন হওয়ায় এটি লালচে রং ধারণ করবে

- ❀ ফল পরিপুষ্ট, রসালো ও মিষ্টি হবে
- ❀ ভিটামিন সি জাতভেদে ৪০-৮০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম এ উন্নীত হবে

ফল সংগ্রহ ও ফলন

লিচু একটি নন-ক্লাইমেকট্রিক স্বভাবের ফল। কাজেই ভালভাবে পরিপক্ব হওয়ার পরই কেবল এটি গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ব কিংবা আধা-পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করলে সেগুলি আর পাকবে না এবং গুণগতমানও ভাল হবে না।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

ফল পাকার সময় খোসা আকর্ষণীয় খয়েরী, লাল বা সবুজ মিশ্রিত লাল রং ধারণ করে ও খোসার কাঁটাগুলি সমান হয়ে যায়। লম্বা বোঁটাসহ ফলের খোকা সংগ্রহ করতে হবে। মঞ্জুরীর গোড়া থেকে পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে খোকায় খোকায় লিচু সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির পর পরই গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ এতে ফল পঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল সংগ্রহের সময় ফলবান ও ফলবিহীন বিশেষ করে লিচু মাকড়াক্রান্ত পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে দিতে হয়। যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচু গাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচু গাছ থেকে বছরে ৫০০০-১০০০০ (১০০-১৫০ কেজি) লিচু সংগ্রহ করা যায়। সংগ্রহীত ফল পলিথিন কিংবা কাগজের লাইনার যুক্ত প্লাস্টিক ক্রেট কিংবা বাঁশের বুঁরিতে রাখতে হবে

সার্টিং ও গ্রোডিং: ফলের খোকা থেকে রোগ-পোকাক্রান্ত ও বিকৃত আকারের ফলগুলো আলাদা করে ফেলতে হবে। অতঃপর ফলের আকার ও ওজন অনুযায়ী গ্রোড-১ ও গ্রোড-২ ভাগে ভাগ করতে হবে।

প্যাকেজিং: ১০০/২০০ লিচুর খোকাকে ০.৫% ছিদ্রযুক্ত পাতলা পলিথিন ব্যাগে প্যাকেট করত হবে। অতঃপর এরকম প্যাকেটকে পাস্টিক ক্রেট কিংবা বাঁশের বুঁড়িতে স্তরে স্তরে সাজিয়ে বাজারজাত করতে হবে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে লিচুর পাতার লাইনার দিতে হবে। এতে পরিবহনের সময় লিচুর গায়ে কোন আঘাত লাগবে না।

সংরক্ষণ: সাময়িকভাবে সংরক্ষণের জন্য লিচুকে ৭-১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় রাখতে হবে।

বাজারজাতকরণ

ফল গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরই ঠান্ডা, শুকনা ও বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রাখতে হয়। লিচু ফল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং ত্বক বাদামী রং ধারণ করে পচে যায়। তাই গাছ থেকে সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করা দরকার।

কলা

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা অন্যতম ফল। ভারত থেকে পাপুয়া নিউ গিনি এবং মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উষ্ণ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চল কলার উৎপত্তিস্থল বলে মনে করা হয়। তবে, কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এটি ১০,০০০ বছর আগেও ছিল এবং এটি বিশ্বের প্রথম ফল যা চাষ করা হয়ে থাকে। কলার উৎপত্তিস্থল নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও, অধিকাংশ বিজ্ঞানী একমত যে, এর প্রধান বন্য পূর্বপুরুষ হল *Musa acuminata* প্রজাতি, যা ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া পযন্ত পাওয়া যায়। অনেক গবেষক আরও মনে করেন যে, পাপুয়া নিউ গিনিতেই প্রথম আবাদযোগ্য কলার উদ্ভব হয়েছিল। প্রাচীন ভারতেও কলার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন তার সৈন্যদের নিয়ে ভারতে আসেন, তখন তিনিও ভারতে কলা দেখেছিলেন বলে জানা যায়। কলা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ফল যা সারা বছর প্রায় একই হারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে উৎপাদিত বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলার উৎপাদনই সবচেয়ে বেশি। ইহা সুস্বাদু, সহজলভ্য ও পুষ্টিকর এবং এর ফলন অন্যান্য ফল ও ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি। কলা মূলত ক্যালরি সমৃদ্ধ ফল। পাকা কলা ফল হিসাবে সবার নিকট সমাদৃত, আবার কাঁচা কলার ভর্তা, ভাজি, তরকারী ও চপ অনেকের প্রিয় খাদ্য। আমাদের দেশে বর্তমানে বগুড়া, রংপুর, যশোর, বরিশাল, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হচ্ছে। বাৎসরিক উৎপাদন প্রায় ৮৪০৩৬২ মেট্রিক টন এবং আবাদী জমি প্রায় ৪৯৬১৬.৭৫ হেক্টর (বিবিএস ২০২৪)।

পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা কলায় ৬২.৭ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৯ গ্রাম খনিজ, ০.৪ গ্রাম আঁশ, ৭.০ গ্রাম আমিষ, ০.৮ গ্রাম চর্বি, ২৫.০ গ্রাম শর্করা, ১৩.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ০.৯ মি.গ্রা. লৌহ, ০.১ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-২, ২৪ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ১০৯ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

জাত

বাংলাদেশে অনেক জাতের কলা আছে। জাতগুলোকে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দু'ভাগে ভাগ করা হয়- পাকা কলা ও কাঁচকলা বা আনাজী কলা। পাকা কলার জাতের মধ্যে অমৃতসাগর, সবরী, চাঁপা, কবরী ও মেহেরসাগর অন্যতম। কাঁচকলা জাতের মধ্যে ভেড়ার ডগ, চোয়ালপাউশ, বড়ভাগনে, বেছলা, মন্দিরা, বিয়ের বাতি, কাপাসি, কাঁঠালী, হাটহাজারী, আনাজী ইত্যাদি। বিএআরআই এ পর্যন্ত কলার ৫টি উচ্চ ফলনশীল জাত মুক্তায়ন করেছে। নিচে বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হ'লঃ

বারি কলা-১: উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি ২০০০ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(১৩)-১/২০০০। এটি মেহেরসাগর জাতের কলা। গাছ অমৃতসাগর জাতের গাছের চেয়ে খাট, অথচ ফলন দেড় থেকে দুই গুণ বেশি। প্রতি কাঁদির ওজন প্রায় ২৫ কেজি, কাঁদিতে ৮-১১ টি ফানা থাকে। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের কাঁদিতে ১৫০-২০০ টি কলা পাওয়া যায়। ফলের গড় ওজন ১২৫ গ্রাম, পাকা কলার রং উজ্জ্বল হলুদ এবং খেতে সুস্বাদু ও মিষ্টি (ব্রিস্কমান ২৪%)। হেক্টর প্রতি ফলন ৫০-৬০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-২: উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি ২০০০ সালে মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(১৩)-২/২০০০। এটি কাঁচকলার একটি জাত। এ জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত ফিয়া (FHIA-3) নামে একটি উচ্চফলনশীল কাঁচকলার হাইব্রিড জাত। গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারি আকারের। এ জাতের কলার কাঁদির ওজন ১৫-২০ কেজি। কলা মাঝারি, ফলের গড় ওজন ১০০ গ্রাম, গাঢ় সবুজ রংয়ের, সহজে সিদ্ধ হয় এবং ক্ষেতেও ভাল। এ জাতের গাছ পানামা ও সিগাটোকা রোগ প্রতিরোধী। হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৩: কবরী কলার উচ্চ ফলনশীল জাতটি ২০০৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(১৩)-৩/২০০৫। প্রতি কাঁদিতে গড়ে ১৪১ টি কলা হয় যার গড় ওজন ২৩.৮ কেজি। ফল

মধ্যম আকারের, ফলের গড় ওজন ১৪৪ গ্রাম। হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন। পাকা ফল হলুদ রংয়ের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠালো, সুস্বাদু ও মিষ্টি (ব্রিক্‌মান ২৫.৫%)। ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৪: পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত চাঁপা কলার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি ২০০৫ সালে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়ন করা হয় এবং নিবন্ধন নম্বর ০৪(১৩)-৪/২০০৬। প্রতি কাদিতে ফলের গড় সংখ্যা ১৭৮টি যার গড় ওজন প্রায় ১৯ কেজি। ফল মাঝারি আকারের গড় ওজন ৯৭ গ্রাম। ফল পাকা হলুদে রংয়ের সম্পূর্ণ বীজ বিহীন এবং কিছুটা টক মিষ্টি (ব্রিক্‌মান ২০%) স্বাদের। হেক্টর প্রতি ফলন ৪০-৪৫ টন। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৫: কাঁচা কলার একটি উচ্চফলনশীল জাত। এটি ২০১৭ সালে মুক্তায়ন করা হয় যার নিবন্ধন নম্বর ০৪(১৩)-০৫/২০১৭। গাছ বেশ শক্ত এবং মাঝারি আকারের। ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। প্রতি কাদিতে ফলের সংখ্যা ৯৫-১০০টি যার গড় ওজন প্রায় ২২-২৫ কেজি। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬২%। হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বংশ বিস্তার

কলা গাছের রাইজম বা গোড়া থেকে অঙ্গজভাবে উৎপন্ন সাকার বা তেউরের সাহায্যে কলার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। গাছের গোড়া থেকে দু'ধরনের তেউড় বা চারা বের হয়, যথা-অসি তেউর ও পানি তেউর। অসি তেউর বের হয় মূল কন্দ থেকে। অসি তেউড়ের পাতা সরু, গুড়ি বড় এবং চারা শক্তিশালী। এর ভূয়াকান্ড ক্রমশঃ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু, দেখতে অনেকটা তলোয়ারের মত। এ ধরনের সাকার বা তেউর কলার বংশ বিস্তারের জন্য উত্তম। অপরদিকে, পানি তেউড় বের হয় বস্তুতঃ রোগাক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত গাছ থেকে অথবা ফল আহরণের পর। পানি তেউড়ের পাতা চওড়া, গুড়ি দুর্বল ও ছোট এবং ভূয়াকান্ডের ব্যাস আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের হয়। এ ছাড়া টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে কলা গাছের চারা তৈরি করা যায়।

টিস্যুকালচার চারা ব্যবহারের সুবিধাদি

- ✿ চারা তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ও চারার মৃত্যুহার কম এবং সব চারার বৃদ্ধি সমান হয়।
- ✿ সব গাছের ফুল প্রায় একই সাথে আসে এবং সব গাছের ফল প্রায় একই সাথে আহরণ করা যায়।
- ✿ ফল পেতে সময় কম লাগে ও ফলন বেশি হয়।
- ✿ চারা রোগমুক্ত থাকে ফলে রোগ ব্যবস্থাপনা কম নিতে হয় ও শ্রমিক খরচ কম লাগে।
- ✿ বাণিজ্যিক চাষের জন্য উপযোগী।

মাটি ও জলবায়ু

পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উর্বর দো-আঁশ ও বেলে দো-আঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম। গাছের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তাপমাত্রা ১৫-৩৫° সে। তাপমাত্রা ১৩° সে এর নিচে নামলে কলা গাছে শৈত্যাঘাত দেখা যায়। প্রতি মাসে গড়ে ১২০ সেমি বৃষ্টিপাত কলা চাষের জন্য অনুকূল। শুষ্ক আবহাওয়া বা দীর্ঘকালীন খরা, শিলাবৃষ্টি, ঝড়, সাইক্লোন ও বন্যা কলা চাষের অন্তরায়।

উৎপাদন কলাকৌশল

জমি তৈরি ও গর্ত খনন: চাষাবাদের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি ভালভাবে চাষ করে চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পূর্বে ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার থেকে ২.০ মিটার × ২.০ মিটার দূরত্বে ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত খনন করে খননকৃত গর্ত ৪/৫ দিন উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে গর্তের মাটি ভালোভাবে রোদে শুকাবে এবং রোদের তাপে জীবাণুসমূহ মারা যাবে ও অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হবে। গর্ত খননের ৪/৫ দিন পর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার, ৪০০ গ্রাম টিএসপি, ১৫০ গ্রাম এমওপি, ১০০ গ্রাম

জিপসাম, ১০ গ্রাম জিংক সালফেট ও ২৫ গ্রাম বোরিক এসিড গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে। তার পর গর্তটি স্বচ্ছ পলিথিন দ্বারা ভালো ভাবে ঢেকে রাখতে হবে। এতে গর্তেও মাটি শোষণ হবে হবে।

চারা নির্বাচন: বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য টিস্যুকালচার চারা নির্বাচন করাই উত্তম। তবে টিস্যুকালচার চারা না পাওয়া গেলে অসি তেউর লাগাতে হবে। রোগমুক্ত বাগান থেকে তিন-চার মাস বয়স্ক সুস্থ সবল অসি তেউর সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণত বেটে জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সেন্টিমিটার এবং লম্বা জাতের ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের ১.৫-২.০ কেজি ওজনের চারা লাগানো হয়।

রোপণের সময়: বছরের যে কোন সময়েই কলার চারা রোপণ করা যায়। তবে অতিরিক্ত বর্ষা ও অতিরিক্ত শীতের সময় চারা না লাগানোই উত্তম। বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য নভেম্বর) মাস চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়, এসময় চার রোপন করলে সাইক্লোনের প্রভাব এড়ানো যায়। এসময় মাটিতে যথেষ্ট রস থাকে, ফলে সেচের প্রয়োজন হয় না। এ সময়ে রোপিত চারার ফলন সবচেয়ে বেশি। কলার চারা রোপণের দ্বিতীয় সর্বোত্তম সময় হলো মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ) মাস। এ সময় চারা রোপণের জন্য পানি সেচ অত্যাবশ্যিক।

চারা রোপণ: সাধারণত রোপণের ১৫-২০ দিন পর তৈরি করা গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে সরিয়ে ঠিক মাঝ বরাবর চারা রোপন করতে হবে। চারা রোপনের পর গাছের গোড়ার চারপাশের মাটি হাত দিয়ে ভালোভাবে চেপে দিতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে চারা রোপণের পর পানি দিয়ে জমি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ: সারের প্রয়োগ নির্ভর করে কলার জাত, জমির উর্বরতা, আবহাওয়া, রোপনের সময় ইত্যাদির উপর। চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য এবং ফলন্ত গাছে আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফলন পেতে হলে নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যিক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতি বছর সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

সারের নাম	গর্ত প্রতি সারের পরিমাণ	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ			
				৬ মাস পর	মোচা আসার পর
গোবর/আবর্জনা পঁচা সার	১০ কেজি	-	-	-	-
ইউরিয়া	-	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-
এমওপি	১৫০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	১০০গ্রাম	১০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ গ্রাম	-	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	১০ গ্রাম	-	-	১০ গ্রাম	-
বরিক এসিড	২৫ গ্রাম	-	-	-	২৫ গ্রাম

গর্তে প্রয়োগকৃত সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক অক্সাইড ও বরিক এসিড গর্ত তৈরির সময় গর্তে দিতে হয়। চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম এমওপি ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চতুর্দিকে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

পানি সেচ ও নিকাশ: শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর জমিতে সেচ দেয়া দরকার। আবার বর্ষার সময় বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে, তার জন্য নালা করে অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়।

সাকার বা চারা ছাঁটাই: কলার কাঁদি বের হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন চারা রাখা উচিত নয়। তাই নিয়মিত চারা অপসারণ করতে হবে। কাঁদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর মুড়ি ফসলের জন্য গাছপ্রতি মাত্র একটি চারা রেখে বাকি চারাগুলো মাটির সমতলে কেটে ফেলতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: সময়মত বেড়া নির্মাণ, আগাছা দমন, ঠেস দেয়া, অপ্রয়োজনীয় পাতা পরিষ্কার, গোড়ায় মাটি দেয়া, মোচা অপসারণ, কাঁদি ঢেকে দেয়া ইত্যাদি কাজ করা দরকার।

আন্তঃফসলের চাষ: আশ্বিন-কার্তিক মাসে রোপিত চারার ৩-৪ মাস তেমন বৃদ্ধি না হওয়ায় দুই-তৃতীয়াংশ জায়গা পতিত থাকে। তখন কলা বাগানে কলার ক্ষতি না করে আন্তঃফসল হিসাবে শীতকালীন শ্বাক-সবজী, পেঁয়াজ, আলু, মুলা, পালংশাক, গাজর, ধনিয়া, মসুর, সরিষা ইত্যাদি চাষ করে বাড়তি আয় করা সম্ভব। আন্তঃফসলের চাষ করতে হলে অতিরিক্ত কিছু সারও প্রয়োগ করতে হবে যাতে কলা ফসলের খাদ্যের ঘাটতি না হয়।

মুড়ি ফসল

প্রথম ফসলের চেয়ে মুড়ি ফসলের ফলন বেশি হয়। তাছাড়া মুড়ি ফসলের উৎপাদন খরচ কম এবং ফসলও একমাস আগে পাওয়া যায়। তবে মুড়ি ফসল চাষের ক্ষেত্রে তিন বছরের বেশি কোন মুড়ি ফসল চাষ করা ঠিক নয়। কারণ এতে ফলন কমে যায় এবং রোগবালাই এর আক্রমণ বেশি হয়। তবে মুড়ি ফসল চাষের ক্ষেত্রে ফল সংগ্রহের সময় প্রথম ফসলের গাছটিকে মাটির প্রায় ১ মিটার উপরে কাটতে হয়। তারপর নির্বাচিত চারা ব্যতীত অন্য সব চারাসহ মাতৃগাছের গুঁড়ি বা মোথা তুলে ফেলে ঐ স্থান সার মিশানো মাটি দ্বারা ভরাট করে দিতে হয়। অন্যান্য পরিচর্যা সাধারণ কলা বাগানের মতই করতে হয়।

শস্য আবর্তন (Crop rotation)

কলা মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করে ফলে একই জমিতে বছরের পর বছর কলা চাষ করলে জমি উর্বরতা নষ্ট হয় এবং রোগ ও পোকাকার আক্রমণ বেশি হয়। ফলে ফলন কমে যায় এবং মাটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এজন্যে পরপর চার বারের বেশি কলার চাষ করা উচিত নয়। ৩-৪ বছর পর কলা গাছ উঠিয়ে ফেলে অন্য ফসল যেমন শাক-সবজি ও অন্যান্য ফলের চাষ করলে মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং অন্য ফসল ভাল হয়। পানামা রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য সম্ভব হলে ৩ বছর পর একবার বোরো ধান আবাদ করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা: পূর্ণাঙ্গ বিটল পোকা কলার কচি পাতা ও কচি কলার সবুজ অংশ চেঁচে খেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ সৃষ্টি করে। কলা বড় হওয়ার সাথে সাথে দাগগুলো আকারে বড় হয় এবং কালচে বাদামী রং ধারণ করে। কলার গায়ে বসন্ত দাগের মত দেখায় এবং এর বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার: ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে কলার কাঁদি ব্যাগিং করে এ পোকাকার আক্রমণ থেকে কলাকে রক্ষা করা যায়। এ ক্ষেত্রে মোচা থেকে কলা বের হওয়ার আগেই কাঁদির চেয়ে বড় আকারের দু'মুখ খোলা বিশিষ্ট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগের এক মুখ দিয়ে মোচাকে আবৃত করে কাঁদির সাথে আলতোভাবে বেধে দিতে হয় এবং নিচের অংশ খোলাই থাকে। নিচের মুখ খোলা থাকলে মোচার উচ্চিষ্ট অংশ সহজে নিচে পড়ে যেতে পারে। পলিথিন ব্যাগে ০.৫-১.০ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট কমপক্ষে ২০-২৫ টি ছিদ্র রাখতে হবে যাতে কাঁদির ভিতর সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে। কাঁদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার এক মাস পর পলিথিন খুলে তা অন্য কাঁদিতে ব্যবহার করা যায়। তখন কলার চামড়া শক্ত হয়ে যায় বিধায় বিটল পোকা কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ প্রযুক্তি শীতকালে ব্যবহার করলে কলার রং সুন্দর হয়, আকারে বড় হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়।

রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে একবার, ছড়ি থেকে প্রথম কলা বের হওয়ার পর একবার এবং সম্পূর্ণ কলা বের হওয়ার পর আরো একবার মোট তিনবার ডায়াজিনন ৬০ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি) বা ফেনভেলারেট জাতীয় কীটনাশক (ফেনফেন ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মিলি) স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যেতে পারে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

পানামা: পানামা কলার সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ বর্তমানে যা ফিউজারিয়াম উইল্ট নামে পরিচিত। সবরি কলা এ রোগের প্রতি খুব বেশি সংবেদনশীল। এটা ফিউজেরিয়া/ম নামক ছত্রাক দ্বারা হয়ে থাকে এবং এ ছত্রাক মাটিতেই থাকে। প্রথমে আক্রান্ত গাছের নিচের পাতাগুলির কিনারা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তারপর আস্তে আস্তে মধ্যশিরার দিকে অগ্রসর হয় এবং গাঢ় বাদামী রং ধারণ করে। পরবর্তীতে উপরের পাতাগুলো হলুদ হতে শুরু করে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত গাছের পাতার পত্রবৃত্ত ভেঙ্গে ঝুলে পড়ে। ফলে ছদ্মকাণ্ডটি শুধু স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক সময় ছদ্মকাণ্ডের গোড়া লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। ছদ্মকাণ্ড এবং শিকড় আড়াআড়িভাবে কাটলে খাদ্য সঞ্চালন নালীর মধ্যে লালচে-কালো রং এর দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার: রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে হবে, শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে জমিতে গাছ প্রতি ২০০ গ্রাম সরিষার খৈল এবং ৩ গ্রাম ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে কাজ না হলে রোগাক্রান্ত গাছ শিকড় ও চারাসহ তুলে জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। পানামা রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য সম্ভব হলে ৩ বছর পর জমিতে একবার বোরো ধান আবাদ করা যেতে পারে। আক্রান্ত জমিতে ৩-৪ বছর কলার চাষ করা যাবে না। জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে। জমি তিন মাস পানি দ্বারা ডুবিয়ে রেখেও রোগমুক্ত করা যায়। পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে। পানামা মুক্ত চাষাবাদের জন্য টিস্যুকালচার চারা ব্যবহার করা উত্তম।

সিগাটোকা: এ রোগের প্রথম লক্ষণ হলো গাছের তৃতীয় অথবা চতুর্থ কচি পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ পড়া। তারপর দাগগুলো আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় এবং বাদামী রং ধারণ করে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পাতাকে আগুনে পোড়া মনে হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাছের ফলন ১০-১৫% কম হয়।

প্রতিকার: রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে। আক্রান্ত পাতা বা পাতার অংশ বিশেষ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সঠিক দূরত্বে গাছ লাগানো যাতে বাগানের সব কলা গাছ ঠিকমত আলো-বাতাস পায়। গাছের পাতায় রোগের লক্ষণ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম ফ্রপের ছত্রাকনাশক (স্কের প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা নোইন বা ব্যাভিষ্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা একোনাভল/ফলিকোর প্রতি লিটার পানিতে ০.১ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার) স্প্রে করতে হবে।

হাট রট: এটি একটি ব্যাক্টেরিয়া জনিত রোগ। এ রোগের লক্ষণ হলো গাছের শীর্ষ পাতা কাল হয়ে পচে যায়। কলার কচি পাতা আগা থেকে ক্রমে নিচের দিকে কালো হয়ে পচে যায়। পরবর্তীতে সম্পূর্ণ পাতা বা পাতার মধ্য শিরা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত অংশ প্রথমে হলুদ, পরে কালো হয়ে পচে যায়।

প্রতিকার: রোগমুক্ত চারা রোপণ করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত, সুনিষ্কাশিত ও পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে নির্ধারিত দূরত্বে বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে। শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে, আক্রান্ত গাছ উপড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে। এ রোগ মুক্ত চাষাবাদের জন্য টিস্যুকালচার চারা ব্যবহার করা উত্তম।

বাঞ্চি টপ বা গুচ্ছ মাথা রোগ: এটি ভাইরাসজনিত রোগ। আক্রান্ত গাছের পাতা সরু, খাটো ও উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাকানো ও সমতল হলুদ রং এর হয়। একটি পাতা বের হয়ে বৃদ্ধি পাবার আগেই আরো একটি পাতা বের হয় কিন্তু পত্রবৃত্ত যথাযথভাবে বৃদ্ধি পায় না। এমনভাবে অনেকগুলো পাতা গুচ্ছাকারে দেখায়। গাছ ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে কখনো কখনো মোচা বের হয় না। ফুল আসার আগে আক্রান্ত হলে গাছে মোচা বের হলেও স্বাভাবিক ফল হয় না। জাব পোকের মাধ্যমে এরোগ ছড়ায়।

প্রতিকার: বাঞ্চি টপ রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে। রোগ মুক্ত চারা রোপণ করতে হবে। ভাইরাসের বাহক জাব পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (এডমায়ার ২০০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মিলি) অথবা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) কীটনাশক ১৫ দিন অন্তর গাছে স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত

গাছের গোড়া সাকারসহ উঠিয়ে কুচি কুচি করে কেটে শুকিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছের সাকার রোপণ করা যাবে না। টিস্যু কালচারের চারা ব্যবহার করতে হবে।

কৃমি রোগ বা নেমাটোড: নেমাটোড কলার একটি মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন প্রজাতির কৃমি কলার গাছের শিকড় ও গোড়ায় দু'ভাবে ক্ষতি করে থাকে। প্রথমত কৃমি আক্রান্ত শিকড়ে অতি সহজে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করে। শিকড়টি অতি সহজেই কালো হয়ে পচে যায়। ফলে মাটি হতে গাছ আর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। গাছ দুর্বল ও অপুষ্টিতে ভোগে। কলার ফলনও ব্যাপক ভাবে কমে যায়। দ্বিতীয়ত শিকড়ের মাটি আকড়িয়ে থাকার যে ক্ষমতা সেটা না থাকায় ফলন্ত গাছ অতি সহজেই ঝড়ে বা বাতাসে গোড়াসহ উপড়ে পড়ে যায়।

প্রতিকার: ২-৩ বছরের জন্য শস্য পর্যায় অনুসরণ। কলার গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে আক্রান্ত জমি ৬-৮ সপ্তাহ পানিতে ডুবিয়ে রাখা। ১০-১২ মাসের জন্য কলার জমি পতিত রাখা। রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষকরা। রোগমুক্ত জমি হতে সুস্থ সবল চারা সংগ্রহ। টিস্যুকালচারের মাধ্যমে তৈরি চারা ব্যবহার। আক্রান্ত চারা ব্যবহার করলে সে ক্ষেত্রে লাগানোর আগে চারার গোড়ার কাল দাগ সম্পূর্ণ চেঁছে ফেলা। আক্রান্ত চারা গরম পানিতে (৫৫°C সে তাপমাত্রায় ২০ মিনিট) ডুবিয়ে রাখা। বছরে ৩-৪ বার জমিতে কার্বোফুরান ফ্রপের পেষ্টিসাইড (ফুরাডান ৫ জি বা বিস্টাবেন ৫ জি ৪৫-৬০ কেজি প্রতি হেক্টর বা রাগবি ১০ জি ৩০ কেজি প্রতি হেক্টর) প্রয়োগ করা।

শারীরবৃত্তীয় সমস্যা ও ব্যবস্থাপনা

কলার মধ্যে শক্ত বা দলকচড়া (Clod) হয়: শারীরবৃত্তীয় কারণে পেকটিন, লিগনিন ও অন্যান্য পলিস্যাকারাইড বৃদ্ধি পেয়ে, নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাবে (১২°C সে এর কম) এবং অতিপক্ক ফল সংগ্রহের কারণে কলার মধ্যে দলকচড়া হতে পারে। বাগানে পটাশের অভাবে এর প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার: সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে কলার সংগ্রহ করতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারি মাসে চারা রোপণ করতে হবে যাতে প্রচণ্ড শীত বা নিম্ন তাপমাত্রা পরিহার করে পরিপক্ক কলার সংগ্রহ করা যায়। পরিমিত পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে এবং নিয়মিত সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

কলার সংগ্রহ

ঋতু ভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যেই সাধারণত অধিকাংশ জাতের কলাই পরিপক্ক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করলে কলার গায়ে শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলেই বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। কাটার পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

কলার সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা

কলার সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে প্রচলিত ও গতানুগতিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার কারণে উৎপাদিত কলার শতকরা প্রায় ২৫ ভাগই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য গুণগতমান বাজায় রেখে নিরাপদ কলা ভোক্তার নিকট সরবরাহ করার লক্ষ্যে ভ্যালু চেইনে প্রত্যেক ধাপে উন্নত সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ও উত্তম চর্চা ব্যবহার করা আবশ্যিক। বিশেষ করে প্যাকেজিং, পরিবহনে উঠানো-নামানো এবং বাজারজাতকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ষণাবেহালার কারণে কলার গায়ে আঁচড় লাগে ও কালো দাগ পড়ে এবং এতে কলার গুণগতমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কলার গায়ে এভাবে ক্ষত তৈরি হলে এর সকল ধরনের জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার বিশেষ করে শ্বসন ও ইথিলিন উৎপাদনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং এর ফলে কলার গুণগতমান দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং বাজারজাতকরণেও সমস্যা দেখা দেয়।

কলায় ৮৫-৯০ ভাগই পানি থাকে। গাছ থেকে সংগ্রহের পর কলার খোসার মধ্যে দিয়ে প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পানি বের হতে থাকে, যা আর পূরণ হয় না। উচ্চ তাপমাত্রা ও কম আর্দ্রতায় পানির এই অপচয়ের মাত্রা বেশি হয়।

এতে একদিকে যেমন ফল কুঁচকে নরম হয়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি ফলের ওজন কমে যায় এবং সর্বোপরি আর্থিক ক্ষতি হয়। কাজেই কলার গুণগতমান বজায় রাখার জন্য ফল থেকে পানির অপচয় যতটা সম্ভব রোধ করতে হবে।

সংগ্রহের জন্য কলার উপযুক্ত পরিপক্বতা নিরূপণ: বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত কলা সাধারণত: সবুজ অবস্থায় বিভিন্ন পরিপক্বতার পর্যায়ে গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। কলা সংগ্রহোপযোগী পরিপক্বতায় পৌঁছানোর সবচেয়ে কমন চিহ্ন হলো এর ফলগুলো পরিপুষ্ট (Fullness) হবে, ফলের গায়ের কোনাকার রেখাগুলো মোটামুটি সমান হয়ে যাবে এবং ফুল কালো হয়ে বারে পড়বে। কোন কোন জাতের কলার কোনার রেখাগুলো যখন ৩/৪ ভাগ সমান হয় তখন সংগ্রহের উপযোগী হয়। তবে কলা যখন পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হয়, কোনাকার শিরাগুলো সমান হয়ে মোটামুটি গোলাকার ধারণ করে এবং খোসার বর্ণ গাঢ় সবুজ থেকে পরিবর্তিত হয়ে হালকা বর্ণ ধারণ করে তখনই সংগ্রহের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অন্যদিকে অপরিপক্ব অবস্থায় গাছ থেকে সংগ্রহিত কলার গুণগত মান ভাল হয় না এবং কাংখিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না।

গাছ থেকে কলা সংগ্রহ পদ্ধতি: কলার উত্তম সংগ্রহোত্তর গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য গাছ থেকে কলার কাঁদি (Banana bunch) অত্যন্ত যত্নের সাথে সংগ্রহ করতে হবে। দু'টি বাঁশের খুঁটি দ্বারা আড়াআড়িভাবে তৈরি স্ট্রাকচার এর সাহায্যে কলা গাছকে ঠেকানা দিতে হবে এবং ঠেকনার নিচ থেকে কাডকে কেটে ফেলতে হবে যাতে করে কলার কাঁদিসহ গাছের উপরের অংশ আলতোভাবে নিচে নেমে আসে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কলার কাঁদিটি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে না আসে। আবার দুইজন শ্রমিক থাকলে একজনে কলার কাঁদির কয়েক ফিট নিচে কাডটিকে নিচের দিক থেকে কাটবে যাতে করে কাঁদিটি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসে এবং অপরজন কাঁদিটিকে ধরবে। পরে সম্পূর্ণ কাঁদিটি গাছ থেকে কেটে পৃথক করে কলার পাতার উপর রাখতে হবে যাতে মাটির সংস্পর্শে না আসে।

মাঠে কলা হ্যান্ডলিংয়ের সময় অবশ্যই করণীয় বিষয়সমূহ: বাগানের মাটি হলো রোগ জীবাণুর অন্যতম উৎস। কাজেই সংগ্রহকৃত কলা যাতে কোনভাবেই মাটির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কর্তিত কাঁদিকে পরিষ্কার মোটা কাপড় কিংবা কলার পাতার উপর রাখা যেতে পারে। সংগ্রহের পর কলাকে কোনভাবেই রোদ্রে রাখা যাবে না। এতে কলা থেকে পানি বের হয়ে গিয়ে ওজন কমে যাবে, গুণগতমান কমবে, ইথিলিন উৎপাদন বেড়ে গিয়ে ফলের সংগ্রহোত্তর জীবনকাল কমে যাবে। এজন্য সংগ্রহের পর পরই কলাকে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে যেমন, তাঁবু বা গাছের ছায়ায় রাখতে হবে। মাঠ থেকে সম্পূর্ণ কাঁদি কালেকশন সেন্টার কিংবা স্থানীয় বাজারে পরিবহনের সময় বাহনের উপর অবশ্যই নরম কুশন (যেমন-ফোম) ব্যবহার করতে হবে যাতে কলার গায়ে কোন চাপ বা আঁচড় না লাগে। তবে গাছ থেকে সংগ্রহের পর পরই মাঠেই কাঁদি থেকে কলার ফানা বা ছড়াগুলো (banana hand) কেটে হ্যান্ডলিং করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কাঁদি থেকে ফানাগুলো আলাদা করার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন কলার কষ (Latex) কোনভাবেই ফলের গায়ে না লাগে। কারণ এতে কলার গায়ে দাগ লেগে যাবে, যা ফলের বাজারমূল্য কমিয়ে দিবে।

প্যাকহাউজে কলার সংগ্রহোত্তর কার্যক্রম

গাছ থেকে কলা সংগ্রহের পর বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে যেসব কার্যক্রম সম্পাদন করা হয় সেগুলিকেই সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা বলা হয়। এই কাজগুলি সরাসরি মাঠে কিংবা কালেকশন পয়েন্টে অথবা প্যাকহাউজে সম্পাদন করা যেতে পারে।

কাঁদি থেকে কলার ছড়া পৃথকীকরণ: এই প্রক্রিয়ায় একটি ধারালো ও জীবণুমুক্ত কাচি বা চাকু দিয়ে কলার কাঁদি থেকে ছড়া বা ফানাগুলোকে কেটে আলাদা করতে হবে। এ কাজ করার সময় হাতে গ্লাভস এবং গায়ে এপ্রোন পরে নিতে হবে যাতে কষ না লাগে।

কলা ধৌতকরণ: ধৌতকরণের মাধ্যমে কলার খোসার উপরের ধূলা-ময়লা দূর হয়ে যায় এবং ফানার কর্তিত তলের কষ জমাট বেঁধে যায়। ফলে কলার খোসার উপর কষের দাগ পড়ে না। বিশেষ করে বড় বড় হোটেল, সুপার মার্কেট ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কলা ধৌতকরণ আবশ্যিক। বড় চৌবাচ্চায় ১% ফিটকিরি মিশ্রিত পানিতে কলা ধৌত করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

কলার সার্টিং ও থ্রেডিং: কলার সংগ্রহোত্তর কার্যক্রমের মধ্যে সার্টিং ও থ্রেডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সার্টিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত: ফ্রুটিপূর্ণ, বিকৃত, রোগ-পোকায় আক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত কলাগুলোকে আলাদা করা হয়। অন্যদিকে থ্রেডিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেতা যেমন, হোটেল, সুপার মল কিংবা রপ্তানি বাজারের চাহিদা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ফলকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত: ফলের পরিপক্বতার পর্যায়, আকার-আকৃতি, বর্ণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে থ্রেডিং করা হয়। থ্রেডিং এর সময় ছোট কলাগুলোকে বড়গুলো থেকে আলাদা করা হয় যাতে থ্রেডিংকৃত কলাগুলো একই সাথে পাকানো যায়, যা ফলের পরিবহন ও বাজারজাতকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কলার প্যাকেজিং: কলার খোসা তুলনামূলকভাবে নরম ও অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়ায় অল্প আঘাতেই এতে দাগ পড়ে যায়, যাতে কলার গুণগত মান ও বাজার মূল্য কমে যায়। এজন্য পরিবহন এবং পরবর্তীতে বাজারজাতকরণের সময় কলার গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে উত্তমরূপে কলা প্যাকেজিং করা আবশ্যিক। প্যাকেজিং এর মূল উদ্দেশ্য হলো পণ্যকে বাহিরের আঘাত থেকে সুরক্ষা দেয়া, উপযুক্ত পরিমাণ পণ্যকে ধারণ করা যা একজন কর্মী সহজেই উঠানামা করতে পারে এবং পরিবহন, হ্যান্ডলিং ও বিতরণের কাজ সহজ হয়।

কলা পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ: অনুন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, রাফ হ্যান্ডলিং এবং দেরিতে পরিবহনের কারণে উল্লেখযোগ্য হারে কলার পরিমাণগত ও গুণগত মানের ক্ষতি হয়ে থাকে। পরিবহন যানের উপর কখনই অতিরিক্ত কলা সাজানো যাবে না। এতে কলার উপর দাগ পড়ে এমনকি চাপ খাওয়ার দরুণ কলা নষ্ট হয়ে যায়। কোনভাবেই খোলা ট্রাকে প্যাকেট বিহীন কলা অবস্থায় গাদাগাদি করে সাজিয়ে পরিবহন করা যাবে না। কারণ এতে কলার গায়ে দাগ পড়ে এবং ভিতরে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। যার ফলে পাকার আগেই কলা নরম হয়ে যায় এবং তার গুণগতমান কমে যায়।

এজন্য অন্যান্য ফল ও সবজির ন্যায় কলাকেও ভালভাবে প্যাকেটজাত করে পরিবহন ও বাজারজাত করতে হবে। বাজার থেকে স্থানীয়ভাবে এবং দেশের অভ্যন্তরে দূরবর্তী পাইকারি বাজারে পরিবহনের ক্ষেত্রে কলা প্যাকেজিংয়ের সর্বোত্তম কন্টেইনার হলো প্লাস্টিক ক্রেট। এক্ষেত্রে প্লাস্টিক ক্রেটের ভিতরে পাতলা ও বড় পলিথিনের শীট বিছিয়ে তার মধ্যে কলার ফানা বা ছড়াগুলো স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রতি দুই স্তরের মাঝখানে একটি করে পাতলা ফোম শীট ব্যবহার করতে হবে যা কলাকে কমপ্রেশন ও বাহিরের আঘাতজনিত ক্ষত থেকে রক্ষা করবে।

তবে বিদেশে রপ্তানির জন্য উন্নতমানের করুগেটেড ফাইবার বোর্ড কার্টন (CFB) ব্যবহার করতে হবে, যাতে সেটি ফলের ওজনকে ভালভাবে ধারণ করতে পারে। CFB কার্টন যথেষ্ট শক্ত হতে হবে যাতে আর্দ্র অবস্থায়ও সহজে নষ্ট না হয়। প্রতি কার্টনে ১৩-১৪ কেজি কলা প্যাকেট করা যাবে।

কলা সংরক্ষণ: প্যাকহাউজে কিংবা পাইকারি বাজারে কখনও কখনও সাময়িকভাবে প্যাকেটসহ কলা সংরক্ষণের প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য কলাগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন ষ্টোর রুমে রাখতে হবে। কলা সংরক্ষণের জন্য অনুমোদিত তাপমাত্রা হলো ১৩-১৫° সে: এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০%। এই কন্ডিশনে পরিপক্ব সবুজ কলা সংরক্ষণ করলে ২০-২৫ দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে।

লেবু

লেবু ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি জনপ্রিয় ফল। টক জাতীয় লেবুর মধ্যে প্রধানত দুই প্রজাতির লেবু বাংলাদেশে চাষ হয়, পাতি লেবু (*Citrus limon*) এবং কাগজী লেবু (*C. aurantifolia*)। এরা Rutaceae পরিবারের অন্তর্গত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। সারা দেশে লেবুর চাষ হলেও মৌলভীবাজার, সিলেট, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, চট্টগ্রাম, রংপুর, পাবনা, রাজশাহী, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় সর্বাধিক পরিমাণ লেবু উৎপন্ন হয়। এছাড়াও ঢাকার নিকটে ধামরাইয়ের বাইশাকান্দা ইউনিয়নে প্রচুর পরিমাণে লেবু উৎপন্ন হয়। পরিসংখ্যান মোতাবেক বাংলাদেশের শতকরা ৯৩ জন লোক ভিটামিন 'সি' এর অভাবে ভুগছে। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দৈনিক গড়ে ৩০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' খাওয়া দরকার। লেবু কম বেশি সারা বছর উৎপাদিত হয় বিধায় সারাবছর মানুষের ভিটামিন 'সি' র সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গরমের দিনে লেবুর 'সরবত' একটি তৃপ্তিদায়ক পানীয়। লেবু বাংলাদেশে একটি সম্ভাবনাময় রপ্তানিযোগ্য ফসল বিধায় এর বাণিজ্যিক চাষাবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ বিদ্যমান। বর্তমানে সীমিত আকারে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশ থেকে লেবু রপ্তানি হয় এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতেও লেবু রপ্তানির সম্ভাবনা রয়েছে।

জলবায়ু ও মাটি

লেবু হালকা দো-আঁশ ও নিকাশ সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ী ও সমতল উভয় এলাকাতেই লেবু জন্মে। লেবু সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। তবে অতিরিক্ত আর্দ্র জলবায়ু লেবুর জন্য ক্ষতিকর। আর্দ্র পরিবেশে লেবুতে নানা রকম রোগ সৃষ্টি হয় ও পোকা মাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। সাধারণভাবে ২৫° থেকে ৩০° সে. তাপমাত্রায় এদের দৈনিক বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়, ১৩° সে., এর নিচে এবং ৪০° সে. এর উপরে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

জাত

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের লেবু উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে এলাচিলেবু, পাতিলেবু, কলম্বোলেবু, সিডলেসলেবু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লেবুর ৫টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বারি লেবু-১: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)-০১/১৮। বছরে দু'বার ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও ছড়ানো। প্রধান মৌসুমে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে গাছে ফুল আসে এবং আগষ্ট মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছে প্রতি বছরে ১৫০টি ফল হয়। ফল ডিম্বাকৃতির, ফলের বহিঃত্বক অমসৃণ। ফলের গড় ওজন ২৬০ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, অত্যন্ত রসালো, টক এবং এলাচ গন্ধযুক্ত। ফলে রসের পরিমাণ ২৫%, রসে ৫.৩% এসিড ও ৩২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। ফলের খোসা পুরো, কম তিতা ও ভক্ষণযোগ্য। প্রতিটি ফলে গড়ে ১০৫টি বীজ থাকে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৫ টন। দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি লেবু-২: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)১২০/১৮। সারা বছর ফল উৎপাদকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও ছড়ানো। প্রধান মৌসুমে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ প্রতি বছরে ১৮৬ টি ফল হয়। ফল গোলাকৃতির, ফলের বহিঃত্বক মসৃণ। ফলের গড় ওজন ৮০ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক। ফলে রসের পরিমাণ ৩২.৬%, রসে ৭.২% এসিড ও ৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। প্রতিটি ফলে গড়ে ৪৪টি বীজ থাকে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১২ টন। দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি লেবু-৩: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)-০৩/১৮। বছরে দু'বার ফল উৎপাদকারী উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত। গাছ ছোট ও খাড়া প্রকৃতির। প্রধান মৌসুমে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে গাছে ফুল আসে এবং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ

করা যায়। গাছ প্রতি বছরে ২১০ টি ফল হয়। ফল গোলাকৃতির, বহিঃত্বক খুব মসৃণ, গড় ওজন ৫৫ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক। ফলে রসের পরিমাণ ৩৮%, রসে ৬.৮% এসিড ও ৬২ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। প্রতিটি ফলে গড়ে ২০টি বীজ থাকে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১০ টন। দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি লেবু-৪: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)-১০/১৮, তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৮ খ্রি। সারা বছর ফলনশীল ও স্বল্পকালীন (১০-১৫ দিন) জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত। ফল গোলাকার মাঝারী আকৃতির ও প্রতি ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম। ফল দেখতে হালকা সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ৫.৩৫%। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১২ টি খন্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যপোযোগী অংশ ৭০%। পাঁচ বছর বয়সী গাছে গড় ফলের সংখ্যা ৯০০-১২০০ টি এবং ফলন ৭৫-৯৫ কেজি (১০৪ টন/হেক্টর)।

বারি লেবু-৫: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)-১৩/১৮, তারিখঃ ১৯.০৮.২০১৮ খ্রি। উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী। গাছটির পাতা তুলনামূলকভাবে বড় ও ঝোপালো। ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (প্রতি ফলের গড় ওজন ২৬৮ গ্রাম) এবং থোককারে ধরে। ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ৭.০৭%। ফলের অভ্যন্তরে ১১-১২ টি খন্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যপোযোগী অংশ প্রায় ৮১.৮৭%। পাঁচ বছর বয়সী গাছে গড় ফলের সংখ্যা ৭৫-৯০ টি এবং ফলন ৬০-৭০ কেজি (২৬.০৯ টন/হেক্টর)।

বারি লেবু-৬: নিবন্ধন নং-০৪(০৭)-১৭/২২। নিয়মিত ফলদানকারী গাছ এবং সারা বছর ফসল সংগ্রহ করা যায়। গাছের গড় উচ্চতা ২.২ মিটার, মধ্যম আকারের ফল, গড় ওজন ১৬৩.৮ গ্রাম। বহিরাবণ মসৃণ, ফলের স্বাদ হালকা টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি ও সুস্বাদু। ফলের অভ্যন্তরে ১৩- ১৪টি খণ্ড বিদ্যমান।

পুষ্টিমান

লেবু একটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল এবং এটি বিভিন্ন ঔষধিগুণে ভরপুর। প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপোযোগী ফলে ৮৮.৪ ভাগ জলীয় অংশ, ০.৬ গ্রাম খনিজ লবণ, ১.৭ গ্রাম আঁশ, ০.৩ গ্রাম আমিষ, ০.৭ গ্রাম চর্বি, ১০ গ্রাম শর্করা, ৪০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২.৩ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.০৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-২, ৪৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি ও ৪৭ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

বংশবিস্তার

যৌন (বীজ) ও অযৌন (জোড় কলম ও শাখা কর্তন) উভয় উপায়ে লেবুর বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বীজের চারায় ফল আসতে দেরী হয়। লেবুর সবচেয়ে সহজ ও বহুল ব্যবহৃত বংশবিস্তারের মাধ্যম হচ্ছে স্টেম কাটিং বা শাখা কলম। এছাড়া জোড় কলম ও গুটি কলমের মাধ্যমেও লেবুর বংশ বিস্তার করা যায়।

উৎপাদন কলাকৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরি: রোদযুক্ত সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি অথবা পুকুর, রাস্তা বা পাহাড়ের ঢাল লেবু চাষের জন্য উত্তম। বাণিজ্যিক ভাবে চাষ করতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের অবস্থান বুঝে আগাছা পরিষ্কার করার পর নির্দিষ্ট দূরত্বে শুধু গর্ত করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সমতল ভূমির মতো জমি চাষ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

মাদা তৈরি: চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ২.৫ মি. × ২.৫ মি. বা ৩ মি. × ৩ মি. দূরত্বে ৬০ সেমি × ৬০ সেমি × ৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম

নিরাপদ সারজি ও ফল উৎপাদন

টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। এই হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১৬০০ টি চারা দরকার হয়।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের সময়: লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি ভাবে লাইন বা সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়া ভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিত ভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ /বছর)
	ইউরিয়া	টি এস পি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড	
০-১	২৭১	৩৭৫	১৫০	১১২	২৪	১২	২৪
২-৪	৩২৬	৪৫০	৪০০	১৬৮	২৪	১২	২৪
৫-৭	৫৪৩	৬০০	৫০০	২৮০	৩৮	২৯	৩৮
৮-১০	৬৫১	৮০০	৫৬০	৪৪৮	৪৮	৩৫	৪৮
>১০	৭৬০	১০০০	৬৪০	৪৪৮	৪৮	৪৭	৪৮

উৎস: Fertilizer Recommendation Guide 2024, BARC

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবিং পদ্ধতি অনুসরণ করে সার হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (মে মাস), দ্বিতীয় কিস্তি সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে এবং তৃতীয় কিস্তি ফেব্রুয়ারি মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পানি ও সেচ নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ঝরনা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যিক। এ জন্য খরা মৌসুমে লেবু বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক (Water sucker) শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সুর্যালোক পায়না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাইকরে দিতে হবে। শীতকাল ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তৃত স্থানে বোর্ডো পেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

রোগ বালাই ও প্রতিকার

ডাইব্যাক: বিভিন্ন কারণে এ রোগ হয়ে থাকে যেমন, খাদ্যোপাদানের অভাব, রোগ-জীবাণুর আক্রমণ, ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যা ও বাগানের জন্য ভুল জায়গা নির্বাচন করা। প্রাথমিকভাবে গাছটির বৃদ্ধি থেমে যায়। আক্রান্ত গাছের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ডাল পালাগুলো শুকিয়ে যায়। পাতা ঝরে যায় এবং কচি ডাল আগা থেকে শুকিয়ে মরে যেতে থাকে।

প্রতিকার: সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বোর্দোপেস্ট লাগানো ভাল। আক্রান্ত গাছে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব (০.২%) অথবা বোর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করতে হবে।

গ্যামোসিস: ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। সাধারণত গাছের গোড়ায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। এ রোগের আক্রমণে গাছের কাণ্ড, ডাল বাদামি রংয়ের হয়ে যায় ও ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হতে দেখা যায়। মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল কর্তনজনিত কারণে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

প্রতিকার: আক্রান্ত স্থান ছুরি দ্বারা চেছে বোর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দেয়া। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ও সেচের পানি গাছের কাণ্ড স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখা ভাল।

কাংকার: এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা, শাখা ও ফলে ধূসর বা বাদামি রংয়ের গুটি বসন্তের মত দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতায় গুটি বসন্তের মত দাগের চারদিকে হলুদ রিং থাকে। লিফ মাইনার পোকের দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়।

প্রতিকার: আক্রান্ত ডগা ও শাখা ছাঁটাই করতে হবে এবং কাটা অংশে বোর্দোপেস্ট (১০%) এর প্রলেপ দিতে হবে। প্রতি মাসে বোর্দোমিশ্রণ (১%) স্প্রে করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম একতারা ৫ এসজি অথবা ১ মিলি সুমিথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করে ক্ষত সৃষ্টিকারী লিফ মাইনার পোকা দমন করতে হবে।

অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

পাতার ছোট সুড়ঙ্গকারী পোকা (Citrus leafminer): এ পোকের ক্ষুদ্র কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায় ও অবশেষে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা: গাছে নতুন পাতা গজানোর সময় রগর/রক্সিয়ন/পরফেকথিয়ন ৪০ ইসি ২ মিলি হাতে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা সুমিথিয়ন ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২ বার স্প্রে করতে হবে।

লেবুর প্রজাপতি পোকা: পূর্ণাঙ্গ পোকা কালো হলুদ রঙের এক ধরনের প্রজাপতি বিশেষ। পূর্ণাঙ্গ পোকা গাছের ক্ষতি করে না। এদের কীড়াগুলোই গাছের ক্ষতি করে থাকে। পূর্ণাঙ্গ পোকা পাতার নিচের দিকে ডিম পাড়ে, ডিম ফুটে কীড়া বের হয়। কীড়াগুলি পাতা খেতে শুরু করে এবং গাছের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। আক্রমণের তীব্রতা বেড়ে গেলে গাছ পাতাবিহীন হয়ে পড়ে, গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়। এ পোকের কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে, এ জন্য গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়।

দমন ব্যবস্থা: ডিম ও কিড়ায়ুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। ক্লোরোপাইরিফস ও সাইপারমেথ্রিয়ন (নাইট্রো) ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়।

ফল সংগ্রহ

সারা বছরই লেবু উৎপন্ন হয় তবে লেবু গাছে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই-আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি ফল আহরণ করা যায়। ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং গাঢ় সবুজ থেকে কিছুটা হালকা সবুজ বা উজ্জ্বল সবুজ হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে।

বাজারজাতকরণঃ

ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সার্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে পরক্ষির পাত্রে রাখা পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। এরপর নরম কাপড় বা টিস্যু দিয়ে ফলে ত্বক ভালোভাবে মুছে বাজারজাত করতে হবে।

মাল্টা

মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (*Citrus sinensis*) লেবু (Rutaceae) পরিবারভুক্ত একটি উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। মাল্টা বাতাবিলেবু ও কমলার প্রাকৃতিক সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপন্ন একটি প্রজাতি। কমলার সাথে এর মূল পার্থক্য হল কমলার খোসা টিলা এবং সহজেই ছাড়ানো যায়, কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত (টাইট) এবং ছাড়ানো কষ্টকর। সিট্রাস ফসলের মধ্যে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সিট্রাস ফলের দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাল্টা। ভিয়েতনাম, উত্তর পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ চীন মাল্টার আদি উৎপত্তি স্থান। মাল্টা একটি ছোট, অগভীর-শিকড় বিশিষ্ট চিরহরিৎ গুল্ম বা গাছ যার উচ্চতা প্রায় ৬-১৩ মিটার এবং কাঁটায়ুক্ত। বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অবউষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় চাষাবাদ হচ্ছে। তবে অবউষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় যেখানে ঋতুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে সেখানে ভালো হয়। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় পাহাড়ী এলাকাসহ দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই এটি বিস্তার লাভ করেছে। প্রতিবছর দেশে প্রচুর পরিমাণে মাল্টা আমদানি হয়। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করা এবং দেশের চাহিদা পূরণ করে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। বাংলাদেশে সতেজ ফল হিসেবে মাল্টা খাওয়া হয়। তবে বিশ্বের শতকরা ৯০ ভাগ অরেঞ্জ জুস মাল্টা থেকে তৈরি করা হয়। মাল্টা থেকে জ্যাম, জেলি, মারমালাড তৈরি করা যায়। পাল্প পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ফলের খোসা থেকে পেকটিন, প্রসাধনী ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় তেল প্রস্তুত করা যায়।

পুষ্টিমান

মাল্টা একটি সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর ফল, যা ভিটামিন, মিনারেলস এবং চর্বিবিহীন ক্যালোরি সহ বিভিন্ন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। মাল্টা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রত্যহ ৭৫-৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' খাওয়া প্রয়োজন। মাল্টার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ৮০-৯০ গ্রাম পানি, ০.৭-১.৩ গ্রাম আমিষ, ০.১-০.৩ গ্রাম চর্বি,

১২.০-১২.৭ গ্রাম শর্করা, ০.৫ গ্রাম আঁশ, ০.৫-০.৭ গ্রাম ছাই, ২০০ আন্তর্জাতিক একক ভিটামিন 'এ', ৪৫-৬১ মিলি গ্রাম ভিটামিন 'সি', ০.৫-২.০ গ্রাম সিট্রিক এসিড এবং ২০০ কিলোজুল খাদ্যশক্তি বিদ্যমান।

জলবায়ু ও মাটি

কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল বিশিষ্ট শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমন্ডলের উচ্চ আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাল্টার ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। বাতাসের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতপ্রবণ এলাকায় মাল্টা ফলের খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্ন মানের হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকাকার উপদ্রব বেশি হয়। মাল্টা গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মাণেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হালকা দোঁ-আশ থেকে বেলে দোঁ-আশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মাল্টা জন্মে, তবে ৫.৫-৬.৫ অম্ল-ক্ষরত্ব (pH) মাল্টার জন্য ভাল। মাল্টা জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চতার মাত্রা ও লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

জাত

বাংলাদেশের বাজারে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সবুজ ও কমলা বর্ণের মাল্টা ব্যাপক হারে বিক্রী হতে দেখা যায়। সাধারণত বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষকৃত জাতের মধ্যে বিস্তার ভিন্নতা চোখে পড়ে। মাল্টা একটি বিদেশী ফল এবং অনেকে বিভিন্ন ভাবে বিদেশ থেকে মাল্টার জনপ্রিয় জাতসমূহ দেশে এনে চাষাবাদের চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মাল্টা-১' ও 'বারি মাল্টা-২' নামে মাল্টার দুইটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। উক্ত জাত দুটির পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। জাত দুটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হল:

বারি মাল্টা-১: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০০৪ সালে উদ্ভাবিত জাতটির নিবন্ধন নং-০৪(২০)-০১/২০০৪। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাট, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছে ফুল আসে এবং অক্টোবর মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির গড় ওজন ১৫০ গ্রাম। ফলের দৈর্ঘ্য ৭ সেমি এবং প্রস্থ ৫ সেমি। পাক ফলের রং হলুদাভ সবুজ। ফলের পুষ্প প্রাপ্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরো ও শাসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, সুস্বাদু ও খেতে মিষ্টি (ব্রিক্রমান ৭.৮%)। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭২.৯৫%। গাছ প্রতি ৩০০-৪০০ টি ফল ধরে। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বারি মাল্টা-২: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮ সালে উদ্ভাবিত জাতটির নিবন্ধন নং-০৪(২০)-০৯/১৮। উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী জাতটির ফল উপবৃত্তাকার, তুলনামূলকভাবে বড় ও উপরিভাগ মসৃণ; প্রতি ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১ টি খন্ড বিদ্যমান থাকে। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭২.৯৫%। খোসা উজ্জল হলুদ, রসালো, সুস্বাদু ও খেতে মিষ্টি (ব্রিক্রমান ৭.৮%)। গড় ফলন ৪০ কজি। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ১৫ মে. টন। দেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

বংশবিস্তার

বীজ ও কলমের মাধ্যমে মাল্টার বংশবিস্তার করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নাসরীতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বীজের চারায় মাতৃগাণ্ডণ ঠিক থাকলেও আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ায় বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। এছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম: গ্রাফটিং এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রুটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাঁটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাজিখত মাতৃগাছ হতে সায়েন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মাল্টার গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়েন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্রুফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মাল্টার কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়েনের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়েনের চোখ ফুটে কুশি বের হয়। কলম হতে একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

উৎপাদন কলাকৌশল

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বাগানের সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে সমান করে নিতে হবে। এর পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে। আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মে-আগস্ট (মধ্য বৈশাখ-মধ্য ভাদ্র) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম। পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে। তবে অধিক বর্ষা ও অধিক শীতে চারা রোপণ না করাই ভালো।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৪ মিটার × ৪ মিটার দূরত্বে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত খনন করতে হবে। গর্ত খনন করে খননকৃত গর্ত ৪/৫ দিন উন্মুক্ত রাখতে হবে। এতে গর্তের মাটি ভালোভাবে রোদে শুকাবে এবং রোদের তাপে জীবাণুসমূহ মারা যাবে ও অনেক বিষাক্ত পদার্থ অপসারিত হবে। গর্ত খননের ৪/৫ দিন পর প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পঁচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার, ১০০ গ্রাম জিপসাম, ২৫ গ্রাম জিংক সালফেট, ৪০ গ্রাম বোরিক এসিড এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমত পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়তে হবে। বয়স ভেদে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল :

গাছের বয়স (বছর)	রাসায়নিক সার (গ্রাম/গাছ/বছর)						জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টি এস পি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট	বোরিক এসিড	
রোপনের পূর্বে (গর্তে)	-	৩০০	২৫০	১০০	২৫	৪০	২০
০-১	২৭১	২০০	১৫০	১১২	২৪	১২	১০
২-৪	৪৩৪	২৫০	১৮০	১৪০	৩৮	১২	১৫
৫-৭	৫৪৩	৩৭৫	২৮০	২২৪	৪৮	২৯	২০
৮-১০	৬৯৪	৫০০	৩৫০	২৮০	৫৭	২৯	৩০
১১-১৫	৭৬০	৭৫০	৪৫০	২৮০	৭১	৪৭	৩৫
>১৫	১০৪২	১০০০	৬০০	৩৩৬	৭১	৪৭	৪০

প্রতি বছর মার্চ (মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র), বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ মে (মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ) এবং বর্ষার পর অর্থাৎ সেপ্টেম্বর (মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল। জিপসাম ও জিংক সালফেট বছরে একবার প্রয়োগ করলেই চলবে।

আগাছা দমন ও মালচ প্রয়োগ: বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। গাছের গোড়ায় আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করতে হবে। মাল্টা গাছের ফাইব্রাস মূলগুলো মাটির উপরিস্তরে বেশি থাকে বিধায় বৃষ্টির সময় নিড়ানী না দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে আগাছা পরিষ্কার করা ভালো। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেটে গাছকে নিদিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। ভূমি থেকে কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বোর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া পানি তেউড় বা water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং: বারি মাল্টা-১ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু

করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ষ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকাকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্বতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অব্যক্তি পোকা মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

রোগবালাই ও পোকামাকড়

ডাম্পিং অফ রোগ (Damping off): মাল্টার নার্সারীর জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পঁচে যায় এবং চারা মরে যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

প্রতিকার: বীজ বপনের আগে বীজতলা পঁচা খৈল (৬০ গ্রাম খৈল প্রতি বর্গ মিটার মাটিতে) দিয়ে শোধন করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে এথোসিন দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। তাপ রাসায়নিক বা সূর্যের আলোর সাহায্যে বীজতলার মাটি শোধন করা যায়। বীজতলার উপরে ভালোভাবে খড়, কাঠের গুড়া বা ধানের তুষ বিছিয়ে দিয়ে তাতে আগুন দিলে সেই আগুনের তাপে বীজতলার মাটি জীবানুমুক্ত হয়। বীজ বপনের পূর্বে উক্ত ছাই বীজতলার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবেনা এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। রোগ দেখামাত্র রিডোমিল গোল্ড ০.২% হারে প্রয়োগ করতে হবে।

গামোসিস (Gummosis): ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। সাধারণত গাছের গোড়ায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। রোগাক্রান্ত গাছের কান্ড ও ডাল বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হতে থাকে। আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ডাল উপর দিকে থেকে মরতে থাকে। কান্ড বা ডালের সম্পূর্ণ বাকল রিং আকারে নষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়। মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল কর্তনজনিত কারণে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

প্রতিকার: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড়/রুট স্টক যেমন- রংপুর লাইম, রাফ লেমন, ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন, কাটা জামির ব্যবহার করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা এবং গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। মাটি সঁয়াত সঁয়াতে হতে না দেয়া এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত পানি সেচ না দেয়া। আক্রান্ত স্থান ছুরি দ্বারা চেছে বোর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দেয়া।

ডাইব্যাক (Die-back): লেবু জাতীয় ফল গাছের একটি অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন কারণে এ রোগ হয়ে থাকে যেমন, খাদ্যোপাদানের অভাব, রোগ-জীবাণুর আক্রমণ, ত্রুটিপূর্ণ পরিচর্যা ও বাগানের জন্য ভুল জায়গা নির্বাচন করা। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

প্রতিকার: সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। মরা ডাল ২.৫ সেমি সুস্থ অংশসহ কেটে কর্তিত অংশে বোর্দোপেস্ট লাগানো। গাছে বছরে দু'একবার কুপ্রাভিট-৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা।

গ্রীনিং রোগ (Greening): গ্রীনিং লেবু জাতীয় ফলের গাছের একটি মারাত্মক রোগ। সাইলিডবাগ নামক পোকা এ রোগ ছড়ায়। এ রোগে কমলা ও মাল্টা গাছ তুলনামূলকভাবে বেশি আক্রান্ত হয়। গ্রীনিং নামটি ফলের সাথে সংশ্লিষ্ট। ফল পরিপক্ব হওয়া পর্যায়েও সবুজ থাকে হলুদ বা কমলা রং ধারণ করে না। তবে ফলের যে অংশে

সরাসরি অধিক সময়ব্যাপী রোদ লাগে সেই অংশই শুধু হলুদ রং ধারণ করে, বাকি অংশ সবুজ থাকে। ফলের মুখের দিকে সমান না হয়ে তেছড়া হয়। ফল মাঝামাঝি লম্বাভাবে কাটার পর মাঝের অংশ সোজা না হয়ে বাঁকা দেখায়। রোগাক্রান্ত ফলের রস তিতা হয়। ফলের চামড়া মোটা ও ফাঁপা হয়ে থাকে। ফল গাছ থেকে সংগ্রহের আগেই ঝরে যায়। গাছের পানি পরিবহনকারী টিস্যু দিয়ে পানি গাছের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত না হওয়ার ফলে মাটিতে পানি সরবরাহ থাকলেও গাছে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয়। পাতা ছোট ও পাতার শিরার মাঝে হলুদ হয়।



প্রতিকার: গ্রীনিং আক্রান্ত মাতৃগাছ থেকে সায়ন সংগ্রহ না করা। বাগানে গ্রীনিং রোগমুক্ত চারা রোপন করা। মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এ রোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।



লিফ মাইনার (Leaf miner): লিফ মাইনার মাল্টার অন্যতম মারাত্মক পোকা। সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গাছে নতুন পাতা গজালে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এ পোকার কিড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচের সবুজ অংশ খেয়ে আকা-বাঁকা সুড়ঙ্গের মত সৃষ্টি করে। পরবর্তী কালে গাছের পাতার কিনারার দিক মুড়ে পুত্তলীতে পরিণত হয়। আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত পাতায় ক্যান্সার রোগ হয়। গাছ দুর্বল হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। শ্রাবণ-কার্তিক মাসে এ পোকার আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়।



প্রতিকার: পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আঁঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়। হলুদ রঙ্গের বয়ামের বাইরের অংশে পোড়া মবিলের প্রলেপ দিয়ে এ ফাঁদ তৈরি করা যায়। কচি পাতা দেখা দিলে এডমায়ার ২০০ এসএল ০.২৫ মিলি বা কিনালাক্স ২৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরোপাইরিফস ও সাইপারমেথ্রিয়ন (নাইট্রো) ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করতে হয়।

ফলের মাছি পোকা (Fruit fly): পূর্ণাঙ্গ পোকা সাধারণত আধা পাকা ফলের ত্বকের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কিড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত ফলে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মে ও ফল পঁচে ঝরে পড়ে। এ পোকার আক্রমণে কৃষক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফুট ব্যাগিং করেও এ পোকার হাত থেকে মাল্টাকে রক্ষা করা যায়।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির কম পক্ষে ২/৩ ফুট গভীরে পুতে ফেলতে হবে। ফল পরিপক্ব হওয়ার সাথে সাথে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ দ্বারা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ পোকা মারা যেতে পারে। আগস্ট মাস থেকে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত বাগানে ১০ মিটার অন্তর এ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

সাইলিড বাগ: এ পোকাকার নিম্ফ ও পূর্ণ বয়স্ক পোকা কুঁড়ি ও কচি পাতার রস শোষন করার ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়, নিম্ফ সাদা মধু নিঃসরণ করার ফলে সুটি মোল্ড রোগ হয়। এই পোকা গ্রীনিং রোগের বাহক হিসাবে কাজ করে।

প্রতিকার: এজাডিরেক্টিন (বায়োনিম প্রাস ১ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে কঁচি পাতায় এডমায়ার ২০০ এসএল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

মাকড়: এরা লেবু জাতীয় ফলের কঁচি পাতা ও ফলে আক্রমণ করে। এদের আক্রমণে পাতার নিচের দিক বাদামী বর্ণ ধারণ করে। পাতা কুঁকড়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়। এ পোকাকার আক্রমণে ফলের উপরিভাগ কালো বাদামী রং ও খসখসে হয়ে যায়। এতে করে ফলের বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার: বছরে কমপক্ষে ২-৩ বার অতিরিক্ত ডালপালা ছেঁটে ফেলা বা ফ্রনিং করা। আক্রমণের প্রথম দিকে আক্রান্ত পাতা/ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মাকড়নাশক ভার্টিম্যাক ৫ ১.৫ মিলি এবং সালফোট্র ২.০ গ্রাম একান্তরভাবে ১.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে একবার গাছে ফুল আসার সময় এবং আরেকবার ফল মার্বেল আকার হওয়ার পর স্প্রে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা

ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ফলের গাচ সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা -১ সেক্টেম্বর অক্টোবর মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ব ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো প্রয়োজনে হ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

আনারস

বাংলাদেশে আনারস (*Ananas comosus*) অন্যতম একটি প্রধান, সুস্বাদু ও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন ফল। দেশের পাহাড়ি এবং উঁচু অঞ্চলের উর্বর লাল মাটিতে আনারসের প্রচুর ফলন হয়। সুস্বাদু ও রসালো আনারস প্রধানত টাঙ্গাইলের মধুপুর এবং পার্বত্য অঞ্চল (যেমন: রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ও শ্রীমঙ্গল) থেকে আসে। মূলত জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে এর প্রধান মৌসুম হলেও বর্তমানে সারা বছরই ফলন পাওয়া যায়। টাঙ্গাইলের ‘মধুপুরের আনারস’ ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পুষ্টিমান: আনারস একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু এবং রসালো ফল যা ভিটামিন, খনিজ উপাদান এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। প্রতি ১০০ গ্রাম পাকা আনারসে ১৩.১২ গ্রাম শর্করা, ৯.৮৫ গ্রাম চিনি, ১.৪ গ্রাম খাদ্য আঁশ, ০.১২ গ্রাম চর্বি, ০.৫৪ গ্রাম প্রোটিন এবং ২০৯ কিলোজুল (৫০ কিলোক্যালরি) খাদ্যশক্তি বিদ্যমান।

জলবায়ু ও মাটি (Climate and soil)

আনারস গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফল হলেও অবউষ্ণ এলাকাতেও এর চাষ করা যায়। ১৫.৫-৩২.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আনারস ভাল জন্মে, তবে সবচেয়ে উপযুক্ত তাপমাত্রা ২১-২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। কম তাপমাত্রায় এর গুণগত মান ভাল হলেও তাপমাত্রা খুব বেশি কমে গেলে আনারসের জন্য ক্ষতিকর। প্রখর সূর্যালোক এবং সম্পূর্ণ ছায়া আনারস চাষের জন্য ক্ষতিকর। বার্ষিক ৭৫ সেমি গড় বৃষ্টিপাত আনারস চাষের জন্য উত্তম, তবে ৫১-৫৫ সেমি. বৃষ্টিপাত হলেও আনারস জন্মানো যায়। তবে প্রবল বায়ুপ্রবাহ এলাকায় এ ফল চাষ না করাই ভাল। সুনিষ্কাশিত বেলে ও দো-আঁশ মাটি আনারস চাষের জন্য উত্তম।

জমি নির্বাচন (Site selection)

নিরাপদ পদ্ধতিতে বাণিজ্যিকভাবে আনারস উৎপাদনের জন্য জমি নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গুণগত মানসম্পন্ন আনারস উৎপাদনের সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় জলবায়ু, জমির প্রকৃতি, মাটির গুণাগুণ, পানির সহজলভ্যতা ও নিষ্কাশন সুবিধা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর। প্রধান রাস্তার পার্শ্ব যেখানে ধূলাবালির প্রাদুর্ভাব বেশি এবং কলকারখানা আশপাশের এলাকা যেখান থেকে কালো ধোঁয়া এবং গরম বাতাস বের হয় সেসব এলাকায় আনারস চাষ করা উচিত নয়।

জাত নির্বাচন (Selection of variety)

বাণিজ্যিকভাবে আনারস উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জাতের চাহিদা বেশি, গুণগত মান ভালো, বাজারমূল্য বেশি এবং বিশ্ববাজারে চাহিদা ও বেশি এমন জাত নির্বাচন করতে হবে। বাংলাদেশে আনারসের অনুমোদিত জাত না থাকলেও হানিকুইন, জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল, জলডুবি এবং এমডি-২ অন্যতম। হানিকুইন এবং এমডি-২ জাতের আনারসের গুণগত মান ভাল হওয়ায় বিশ্ববাজারে এদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বলে নতুন বাগান স্থাপনে এ জাতগুলো নির্বাচন করা যেতে পারে।

বংশ বিস্তার (Propagation)

আনারস সাধারণত গ্রাউন্ড সাকার (পুরাতন গাছের গোড়া সংলগ্ন ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়), স্টেম সাকার (বয়স্ক পাতার কক্ষ থেকে বের হয়), স্লিপ (ফলের বোটা থেকে বের হয়), স্টাম্প (পুরনো বা বয়স্ক গাছের কাণ্ড) এবং ক্রাউনের (ফলের মাথার অংশ) মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা গেলেও গ্রাউন্ড সাকার ও স্টেম সাকার সর্বোত্তম।



সাকার নির্বাচন এবং শোধন (Selection and treatment of suckers)

আনারস উৎপাদনের জন্য একই আকারের (২৫০-৩০০ গ্রাম) সাকার নির্বাচন করা উত্তম। চারা লাগানোর ৭ দিন পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সিকিউর/ব্যাভিস্টিন এবং ২ মিলি ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে সম্পূর্ণ সাকার চুবিয়ে শোধন করতে হবে যাতে মাঠে রোগ ও পোকাকার উপদ্রব কম হয়।

রোপণের উপযুক্ত সময় (Optimum time of planting)

সারা বছরই আনারস রোপণ করা গেলেও সেপ্টেম্বর এবং এপ্রিল মাস আনারস রোপণের সর্বোত্তম সময়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ (Land preparation and planting)

আনারসের জন্য উপযুক্ত জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে ৯০ সেমি প্রশস্ত বেড করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে কারণ আনারস দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। চারা রোপণের জন্য একপার্শ্ব চোখা একটি বাঁশের সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১০ সেমি গভীরতার গর্ত তৈরি করা হয়। উক্ত গর্তে আনারসের চারা বসিয়ে পাশের মাটি হালকা চাপ



বেড তৈরি এবং পলিথিন মালচ বিছানো

দিয়ে চারা লাগানো হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের বিপরীতে আড়াআড়ি লাইন করে শুধু চারা লাগানোর জায়গাটিকে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এতে ভূমিক্ষয় কম হয় ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়। চারা

নিরোপদ সসবজি ও ফল উৎপাদন

রোপণের সময় চারার দৈর্ঘ্য ৩০ সেমি পরিমাণ রেখে পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের চারা রোপণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন: একক এবং জোড় সারি পদ্ধতি। একক সারি পদ্ধতিতে ৭৫ সেমি পরপর সারি করে প্রতি সারিতে ঘন করে অর্থাৎ ২৫ সেমি দূরত্বে চারা লাগাতে হয়। এ পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি প্রায় ৭৩ হাজার চারা রোপণ করা যায়। একক সারি পদ্ধতিতে চারা ঘন করে লাগানো হয় বলে আগাছার বৃদ্ধি কম হয়, মাটিতে সূর্যালোক না পড়ায় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে এবং ঘন বিন্যাসের কারণে প্রতিটি গাছ খাড়া অবস্থায় থাকে।



বেডে চারা রোপণ

জোড় সারি পদ্ধতিতে ৬০ সেমি দূরত্বে ৯০ সেমি চওড়া বেড তৈরি করে প্রতি বেডে ৬০ সেমি দূরত্বে জোড় সারি তৈরি করা হয় এবং সারির মধ্যে চারা থেকে চারার দূরত্ব ২৫-৩৫ সেমি থাকে।

মাল্টিং ব্যবহার (Use of mulching)

বর্তমান সময়ে আনারস উৎপাদনে কালো পলিথিন মাল্টিং ব্যবহৃত হচ্ছে। কালো পলিথিন মাল্টিং ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি মাটির আর্দ্রতাকে ও ধরে রাখা সম্ভব। মাল্টিং পেপার ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সিলভার আবৃত পার্শ্ব ওপরের দিকে থাকে।

আগাছা দমন (Weed management)

বর্ষাকালে আগাছা প্রকট আকার ধারণ করে। ভালো ফলন পাওয়ার জন্য চারা লাগানোর পর থেকে আনারসের ফল সংগ্রহের সময় পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। সাধারণভাবে দা/হাসুয়া/নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

মুকুট ব্যবস্থাপনা (Crown management)

আনারসের ফলে মুকুট থাকা আবশ্যিক। কিন্তু বৃহৎ মুকুট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফুল আসার ৬৫-৭৫ দিন পর মুকুটের কেন্দ্রীয় মেরিস্টেম লোহার তৈরি অগারের সাহায্যে অপসারণ করা হলে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত না করে মুকুট ছোট রাখা যায়।

সারের মাত্রা (Amount of Fertilizer)

আনারসের ভাল ফলন পেতে হলে সঠিক পরিমাণ সার সঠিক সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। আনারস চাষের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

সার	পরিমাণ (গ্রাম/গাছ)
পচা গোবর	২৯০-৩১০
ইউরিয়া	৩০-৩৬
টিএসপি	১০-১৫
এমওপি	২৫-৩৫
জিপসাম	১০-১৫

উৎসঃ Krishi Projukti Hatboi, 2014.

সার প্রয়োগ পদ্ধতি (Method of fertilizer application)

সবটুকু গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে এক মাস পরপর ইউরিয়া ও পটাশ সার পাঁচ কিস্তিতে প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ি ঢালু জমিতে গাছের গোড়ায় পেগিং বা ছোট গর্ত করে সার দেওয়া ভালো। পলিথিন মাল্চ ব্যবহার করলে সারিতে ২ চারা অন্তর অন্তর চোঁখা বাশের খুঁটি দিয়ে তৈরি গর্তে সার প্রয়োগ করতে হবে।



পলিথিন মাল্চ ব্যবহারে সার প্রয়োগ

ক্ষতিকর পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা

আনারসের মিলিবাগ/ছাতরা পোকা (Pineapple mealybug)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Dysmicoccus brevipes* (Cockerell)

ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage)

- ❖ সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়।
- ❖ এই পোকার নিষ্প ও পূর্ণাঙ্গ পোকা প্রাথমিক অবস্থায় কচি পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং রস শোষণের সময় পাতায় মধুরস ত্যাগ করে যার ওপর সুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে। পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে যাতে সালোকসংশ্লেষণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।
- ❖ এদের আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলন কমে যায়।
- ❖ সাধারণত কচি পাতায়, কচি ডগায়, বয়স্ক পাতায় ও ফলে এদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।



মিলিবাগ/ছাতরা পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা (Control measure)

সাকার লাগানোর পূর্বে কীটনাশক (ম্যালাথিয়ন ২ মিলি/লিটার) দ্রবণের মধ্যে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

- ❖ আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে আগুনে পুড়ে ধ্বংস করতে হবে।
- ❖ বাগানে বা তার আশেপাশে থাকা বিকল্প পোষক (Alternate host) ধ্বংস করতে হবে।
- ❖ আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক পটাশিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড (ফাইটোক্রিন) ৮-১০ মিলি/লি. পানি হারে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ❖ আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আনারসের স্কেল পোকা (Scale insects)

বৈজ্ঞানিক নাম: *Diaspis bromeliae* (Kerner)

ক্ষতির প্রকৃতি (Nature of damage)

- ✿ স্কেল পোকা সাধারণত পাতার নীচে এবং মধ্যশিরা ও পার্শ্বীয় শিরার উভয় পাশে দেখতে পাওয়া যায়।
- ✿ এদের কচি কুশির মধ্যে লুকানো অবস্থায় দেখা যায়।
- ✿ কুশি, পাতা, কাণ্ড ও ফল থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা ও নিম্ফ রস চুষে খায় ফলে আক্রান্ত পাতা, কুশি ও ফল হলুদ রং ধারণ করে এবং বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।
- ✿ এরা মধু নিঃসৃত করে ফলে স্যুটি মোল্ড নামক ছত্রাক জন্মায়।



স্কেল পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা (Control measure)

- ✿ সতর্কতার সাথে সাকার নির্বাচন করতে হবে যেন স্কেলমুক্ত হয়।
- ✿ নিয়মিত নার্সারি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- ✿ স্কেল পোকা দেখামাত্র আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।
- ✿ অধিক আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- ✿ পিঁপড়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কারণ এরা স্কেল পোকা স্থানান্তরে সহায়তা করে এবং শত্রু পোকা থেকে স্কেলকে রক্ষা করে।
- ✿ বাগান ও এর আশপাশ এলাকা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- ✿ পরজীবী বোলতা, পরভোজী পোকা সংরক্ষণ এবং নিয়মিত মুক্তায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ শুধুমাত্র রাসায়নিক কীটনাশক দ্বারা এই পোকা দমন করা অত্যন্ত কষ্টকর।
- ✿ আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে দমন সম্ভব হলেও প্রতিষ্ঠিত স্কেল কীটনাশক দ্বারা দমন করা যায় না।
- ✿ জৈব বালাইনাশক পটাশিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড (ফাইটোক্রিন) ৮-১০ মিলি/লি. হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রধান প্রধান রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

হার্ট রট (Heart rot)

রোগের কারণ (Causes of disease)

Phytophthora parasitica নামক ছত্রাক এবং *Dickeya zeae* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ (Symptoms)

- ✿ প্রথমে কাণ্ডের কেন্দ্রীয় পাতার গোড়ায় পচন দেখা যায় এবং দুর্গন্ধ বের হয়।
- ✿ পাতা লালচে বাদামি রং ধারণ করে।
- ✿ আক্রান্ত পাতার গোড়া গাঢ় বাদামি থেকে কালো রং ধারণ করে।
- ✿ আক্রান্ত গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে যা পাতা মোড়ানোর মত দেখায়।
- ✿ আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে কুঁচকে যায়।
- ✿ রোগাক্রান্ত গাছের কুশির পাতা টানলে সহজেই খুলে আসে।



ব্যাকটেরিয়াল হার্ট রট



ফাইটোপথোরা হার্ট রট

দমন ব্যবস্থাপনা (Control measure)

- ❖ সুস্থ বাগান থেকে চারা বা সাকার সংগ্রহ করতে হবে।
- ❖ আনারস চাষের জন্য উঁচু, পানি জমে থাকে না এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভাল এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- ❖ একই জমিতে বার বার আনারস চাষ করা যাবে না।
- ❖ চারা রোপণের সময় ট্রাইকোডার্মা কম্পোস্ট সার হেক্টর প্রতি ২.৫ টন হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- ❖ ব্যাকটেরিয়াল হার্ট রট সংক্রমণ এড়াতে রোগাক্রান্ত গাছ অপসারণ করতে হবে।
- ❖ ফাইটোপথোরা হার্ট রট দমনের জন্য রোপণের পূর্বে চারার গোড়া বোর্দোমিশ্রণে চুবিয়ে নিতে হবে।
- ❖ চারা লাগানোর পূর্বে কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউডিজি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে দিলে এ রোগের সম্ভাবনা কমে যায়।
- ❖ গাছে রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে মেটালেক্সিল + মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: রিডোমিল গোল্ড) অথবা ম্যানকোজেব + ফেনামিডন গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: সিকিউর ৬০০ ডব্লিউডিজি) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার আনারস গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

ডিপ আই/ব্ল্যাক আই (Deep eye/black eye)

রোগের কারণ (Causes of disease)

Penicillium funiculosum নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ দেখা দেয়। ফুল আসার ৪-৫ সপ্তাহ পরে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে।

রোগের লক্ষণ (Symptoms)

- ❖ এই ছত্রাকের কারণে ফুটলেটের প্রাচীরের টিস্যু শক্ত বাদামি হয়ে যায় এবং কখনো কখনো ফলের ভিতরে ছড়িয়ে পড়ে।
- ❖ ফলের আকার সংকুচিত হয়ে যায় এবং কিছুটা বেঁকে যায়।



ডিপ আই/ব্ল্যাক আই রোগের লক্ষণ রট

দমন ব্যবস্থাপনা (Control measure)

- ❖ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে বর্দোমিক্সার অথবা কপার গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: কুপ্রাভিট প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত ফল পচা (Bacterial fruit rot/heart rot)

রোগের কারণ (Causes of disease)

Erwinia chrysanthemi/Dickeya sp.
নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ (Symptoms)

- ❖ ইহা আনারসের গুদামজাত রোগ।
- ❖ ফল তোলায় সময় বা পরিবহনে আঘাতপ্রাপ্ত হলে রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়।



আনারসের ব্যাকটেরিয়াল ফল পঁচা রোগের লক্ষণ রট

নির্যাপদ সুরক্ষা ও ফল উৎপাদন

- ✿ আক্রান্ত ফল কাটলে ভিতরে বিবর্ণ দেখায়।
- ✿ পচন লাগা ফলে তীব্র দুর্গন্ধ হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা (Control measure)

- ✿ ফল তোলায় সময় বা পরিবহনে যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয়।
- ✿ গুদামে বা লটে ফলের পচন দেখামাত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ✿ ফল গুদামজাত করার আগে গুদাম জীবাণুমুক্ত করতে হবে।

সানবার্ন ব্যবস্থাপনা (Sunburn management)



সানবার্ন ও তার ব্যবস্থাপনা

সানবার্নের লক্ষণ

প্রখর সূর্যালোকে আনারসের খোসা ধূসর বর্ণ ধারণ করে বিধায় আনারসের বাজারমূল্য কমে যায়।

সানবার্নের প্রতিকার

ফল আসার পর গাছের ওপর শুকনা কলাপাতা অথবা খড় হালকা করে বিছিয়ে দিলে বাড়ন্ত ফল প্রখর সূর্যালোক থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া ফলের মাথায় গোলাকৃতির মোটা কাগজ অথবা ফোম নেটিং করেও ফলকে সানবার্ন থেকে রক্ষা করা যায়।

ফলন (Yield)

আনারসের ফলন মাটির উৎপাদন ক্ষমতা, বাগানের অবস্থান, রোপন দূরত্ব, আবহাওয়া, বাগান ব্যবস্থাপনা, জাত ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। জাতভেদে আনারসের ফলন ৩০-৪০ টন/হেক্টর।

ফসল সংগ্রহ এবং সংগ্রহভোর অন্যান্য বিষয়সমূহ (Crop Harvesting and Others Postharvest Management)

আনারস সংগ্রহ (Harvest of pineapple): সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং জুন থেকে আগস্ট মাসে আনারস পাকে। আনারস একটি নন-ক্লাইমেট্রিক ফল তাই সম্পূর্ণ পরিপক্ব হওয়ার পর ফল আহরণ করা উচিত। প্রতিটি ফলের অর্ধেক অংশ যখন হলুদ বা কমলা বর্ণ ধারণ করার পাশাপাশি চোখগুলো সমতল হবে তখন ফল সংগ্রহ করতে হবে (Deka and Sharma, 2005)।

গাছ থেকে আনারস সংগ্রহের কৌশলসমূহ

- ✿ সকাল বেলা কিংবা বিকালে যখন তাপমাত্রা কম থাকে তখন ফল গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করতে হবে।
- ✿ বৃষ্টির পর ফলের গায়ে পানি শুকানোর পর ফল সংগ্রহ করতে হবে। একান্ত প্রয়োজন হলে ফল সংগ্রহের পর পরই হাই-স্পিড ফ্যানের বাতাসে ফলের গায়ে পানি অবশ্যই শুকিয়ে নিতে হবে।

- ✿ সংগ্রহের সময় ফলের গায়ে যেন কোন আঘাত না লাগে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ✿ সংগৃহীত ফল কোনভাবেই মাটির উপর রাখা যাবে না। এগুলোকে প্লাস্টিক ক্রেট বা প্লাস্টিকের বালতির মধ্যে কাগজ কিংবা পাতলা ফোম বিছিয়ে তার উপর রাখতে হবে।
- ✿ ধারালো চাকু দ্বারা দুই সেন্টিমিটার বোঁটা সমান্তরালভাবে কেটে ফল সংগ্রহ করতে হবে। কোনভাবেই হাত দিয়ে ফল ভাঙ্গা যাবে না।
- ✿ সংগৃহীত ফল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- ✿ সংগ্রহের সময় এবং পরবর্তীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ক্রাউনের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত বা মুড়িয়ে না যায়।

বাছাইকরণ এবং গ্রেডিং (Sorting and grading): সংগৃহীত আনারস সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের সুবিধার্থে বাছাইকরণ একান্ত প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রোদে পোড়া (Sunspot) ক্ষত, চাপ খাওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত ক্রাউনসম্পন্ন, আঘাতপ্রাপ্ত, রোগাক্রান্ত, পোকাকার দ্বারা আক্রান্ত এবং বেশি পাকা ফল পৃথক করে রাখতে হবে কারণ এসব ফল খুব তাড়াতাড়ি পচে যায়। এছাড়া বিকৃত-আকৃতির বা অপরিপক্ক ফল আলাদা করতে হবে। ফল বাছাই করার পর সাইজ অনুযায়ী গ্রেডিং করতে হবে।

ধৌতকরণ (washing): বাছাইকরণের পর ফলগুলো পরিষ্কার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে। পানির সাথে স্যানিটাইজার হিসাবে ১৫০-২০০ পিপিএম সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিবহন (Transportation): আনারস পরিবহনে নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। যানবাহনে আনারস উঠানো, নামানো এবং পরিবহনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন ফলের গায়ে আঘাত না লাগে। এক্ষেত্রে প্লাস্টিক ক্রেটে ফলগুলি সাজিয়ে পরিবহন করা যেতে পারে। পরিবহনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ঝাঁকির কারণে আনারস চাপ খেয়ে থেতলে না যায় বা ক্ষত সৃষ্টি না হয়। ক্ষত তৈরী হলে পরবর্তীতে সেই স্থানের পাল্ল বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং খণ্ডিয়ার অনুপোয়ুক্ত হয়ে যায়। পরিবহনে বেশি সময় নষ্ট না করাই ভাল, কারণ তাতে ফল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিবহন করার সময় আচ্ছাদন দেয়ার পাশাপাশি তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত। স্থানের তুলনায় অতিরিক্ত আনারস পরিবহন করলে নীচের ফলে বেশি চাপ পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়ী/ভ্যান এবং পাত্র জীবাণুমুক্ত ও পরিষ্কার-পরিছন্ন হতে হবে। আনারস পরিবহনের সময় অন্য কোন ফল বা সবজির সাথে না মেশানোই উত্তম।

সংরক্ষণ (Storage): ফলের উপরে মোমের আবরণ: সাধারণত রপ্তানির ক্ষেত্রে শেফ লাইফ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ফলের উপর মোমের আবরণ প্রয়োগ করা হয়। এক্ষেত্রে খাবারযোগ্য মোম (Edibel wax) যেমন, Starfresh-45 মোমের দ্রবণ যাতে ১০০০ পিপিএম থায়াবেনডাজল মিশ্রিত থাকে তাতে ফলকে ডুবিয়ে নিতে হবে। মোমের আবরণ দেয়ার পূর্বে আনারসের গায়ের পানি অবশ্যই ফ্যানের বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। মোমের কোটিং ভালভাবে শুকানোর পর আনারসকে প্যাকেজিং করতে হবে।

প্যাকেজিং (Packaging): আনারসের সংরক্ষণকাল বাড়ানো ও ক্রাউনের সংযোগস্থানকে ইনফেকশনের হাত থেকে রক্ষার জন্য ক্রাউনসহ আনারস প্যাকেট করতে হবে। দেশের ভিতরে বাজারজাতকরণের জন্য প্লাস্টিক ক্রেটে আনারস স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। প্রতি দুই সারির মাঝখানে পাতলা ফোমের লাইনার ব্যবহার করতে হবে। এতে পরিবহনের সময় সৃষ্ট ঝাঁকুনিতে ঘর্ষণজনিত ক্ষত থেকে ফল রক্ষা পাবে।

অন্যদিকে বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নতমানের করুগেটেড ফাইবার বোর্ড (CFB) কার্টন ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতি বক্সে ৪-৬ টি করে ফল প্যাকেটের ভিতর ক্রাউন উপরের দিকে রেখে খাড়াভাবে অথবা আড়াআড়িভাবে (Horizontally) প্যাকেজিং করা যেতে পারে।

আনারস সংরক্ষণ (Storage): আনারস সংরক্ষণের অনুমোদিত তাপমাত্রা ৮-১২ °সেলসিয়াস। তবে সর্বোচ্চ শেখ লাইফের জন্য আনারসকে ৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ৯০-৯৫% আর্দ্রতায় সংরক্ষণ করতে হবে এবং বাজারে পরিবহনের সময় একই তাপমাত্রায় ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। এই অবস্থায় সংরক্ষণ করলে ১/৪ অংশে রং ধরা আনারস মোটামুটি ২০-২১ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। অন্যদিকে স্বাভাবিক কক্ষ তাপমাত্রায় (৩০-৩২° সেলসিয়াস) ফল সংরক্ষণ করলে এদের জীবনকাল ৩-৫ দিনেই শেষ হয়ে যায়। আনারসকে কোনভাবেই ৮° সেলসিয়াস এর নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে না। এতে চিলিং ইনজুরি দেখা দিবে। ফলের ভিতরে বাদামী বর্ণধারণ, কিংবা শাঁস কালচে বর্ণ ধারণ করা চিলিং ইনজুরির লক্ষণ।

বাজারজাতকরণ (Marketing): আনারস বাজারজাতকরণের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় নেয়া উচিত। যেমন: বাজারজাতকরণের জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেন সহজেই ক্রেতাদের নজরে আসে। পচা ফল দেখা মাত্রই আলাদা করে সুস্থ ফলকে পচার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। বাজারের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে আকার (ছোট, মাঝারি ও বড়), আকৃতি, বর্ণ ও পরিপক্বতার ওপর ভিত্তি করে পুনঃগ্রেডিং করে বাজারজাত করতে হবে। দিন শেষে অবিক্রিত ফলগুলো বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার (Use of Plant Growth Regulator): কৃত্রিমভাবে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ করে শতভাগ গাছে একসাথে ফুল আনা সম্ভব। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী এক কেজি অথবা অর্ধ কেজি ওজনের ফল উৎপাদন করা আবশ্যিক। চারার বয়স ৯ মাস বা ২২ পাতা পর্যায়ে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ করা হলে ফলের ওজন অর্ধ কেজি পর্যন্ত হয়। আবার চারার বয়স ১৩ মাস বা ২৮ পাতা পর্যায়ে প্রয়োগ করলে ফলের ওজন ১ কেজি পর্যন্ত হয়। আনারস চারা রোপণের ৯ মাস বয়স থেকে শুরু করে ১৩ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতিমাসে বৃষ্টিহীন দিনে ইথ্রেল (ইথেফোন এর দ্রবণ যার এমআরএল ২.০ মিগ্রা/কেজি) ৫০০ পিপিএম দ্রবণ (৩৯% বাণিজ্যিক উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রতি লিটার পানিতে ১.২৮ মিলি অথবা ৮০% বাণিজ্যিক উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রতি লিটার পানিতে ০.৬২ মিলি) প্রতি গাছে ৫০ মিলি হারে সকাল বেলায় গাছের কাণ্ডে ঢেলে দিতে হবে। উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগের ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। সারা বছর আনারস পেতে হলে জমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতি মাসেই এক একটি ব্লকে আনারস চারা রোপণ করতে হয় অথবা এক বার রোপণ করে ৩-৪ টি ব্লকে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিমাসে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগ করা যেতে পারে। ব্যবহারের সময় হাতে গ্লাভস, মুখে মাস্ক এবং চোখে চশমা ব্যবহার করতে হবে। ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগের ২০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসে এবং ৫-৬ মাস পর ফল আহরণ করা যায়। ফল সংগ্রহের পূর্বে ফল পাকানোর কাজে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা যাবে না।

বছরব্যাপী আনারস উৎপাদনে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক ব্যবহার ও আনারস সংগ্রহের সময়সূচীর ছক

চারা রোপণের সময়	উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রয়োগের সময়	আনারস সংগ্রহের সময়
সেপ্টেম্বর	জুন	ডিসেম্বর
	জুলাই	জানুয়ারি
	আগস্ট	ফেব্রুয়ারি
	সেপ্টেম্বর	মার্চ
	অক্টোবর	এপ্রিল
	নভেম্বর	মে
এপ্রিল	মার্চ	সেপ্টেম্বর
	এপ্রিল	অক্টোবর
	মে	নভেম্বর

পেয়ারা

ড. মো. শরফ উদ্দিন

পেয়ারা (*Psidium guajava*) বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ফল দেয় এবং চাষের জন্য বেশি জায়গায় প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে পেয়ারা বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আবাদ হচ্ছে এবং প্রতি বছর চাষাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ১৮৪৫০ হেক্টর জমিতে ২৫৭৯৮৫ মে. টন পেয়ারা উৎপাদিত হয়েছে (বিবিএস, ২০২৫)। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক জেলায় পেয়ারার বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেলাগুলো হলো; রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুমিল্লা, বরগুনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, যশোর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও সুনামগঞ্জ। অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হওয়ায় অন্যান্য জেলাগুলোতেও পেয়ারার চাষাবাদ দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

পুষ্টিমান ও ব্যবহার

পেয়ারা ভিটামিন 'সি' এর একটি প্রধান উৎস। প্রত্যেক একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের ৭৫-৯০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' খাওয়া দরকার। বাংলাদেশে শতকরা ৯১ জন লোক ভিটামিন 'সি' এর অভাবে ভুগছে। ভিটামিন 'সি' সহ অন্যান্য পুষ্টিমানের বিবেচনায় পেয়ারা আপেল ও কমলার চেয়ে উৎকৃষ্ট। প্রতি ১০০ গ্রাম আপেল, কমলা এবং পেয়ারার খাদ্যোপযোগী অংশে যথাক্রমে ৪, ৪০ এবং ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়। নিচের ছকে আপেল ও কমলার সাথে পেয়ারার পুষ্টিমান তুলনা করে দেখান হলো:

(প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে)

খাদ্যোপাদান	আপেল	কমলা	পেয়ারা
পানি (গ্রাম)	৮১	৮৯.৪	৮২.৪
খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	০.৩	০.১	০.৬
আঁশ (গ্রাম)	১.০	০.৩	৫.২
ক্যালরি (কি. ক্যাল.)	৭৬	৪৩	৭৬
আমিষ (গ্রাম)	০.৪	০.৭	১.৪
শর্করা (গ্রাম)	১৮.১	৯.৭	১৫.২
ক্যালসিয়াম (মি.গ্রা)	২০	২২	২০
লৌহ (মি.গ্রা)	-	-	১০০
ভিটামিন 'সি' (মি.গ্রা)	৪	৪০	২১০

টাতকা পেয়ারা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও পেয়ারায় যথেষ্ট পরিমাণে পেকটিন থাকায় খুব সহজেই ফল থেকে জেলী তৈরি করা যায়। পেয়ারা থেকে উৎকৃষ্ট মানের জ্যাম ও জেলী উৎপন্ন হয়।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় বীজ বোডের মাধ্যমে ১৯৮৪ সালে “কাজী পেয়ারা”, ১৯৯৬ সালে “বারি পেয়ারা-২”, ২০০৪ সালে “বারি পেয়ারা-৩” ও ২০১৭ সালে “বারি পেয়ারা-৪ (বীজবিহীন)” নামে চারটি উন্নত জাত মুক্তায়িত করেছে। জাতগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও উৎপাদন কলাকৌশল নিম্নে দেওয়া হলো-

কাজী পেয়ারা

বছরে দু'বার ফল প্রদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল উপবৃত্তাকার, বোটার দিকে সামান্য সরু, গড় ওজন ৪৪৫ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে কচকচে সামান্য টক ভাবাপন্ন মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৮%) ও অল্প বীজ সমৃদ্ধ। গাছ প্রতি বছরে গড়ে ৬০ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২৮ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ জাতটি এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

বারি পেয়ারা-২: সারা বছর ফল প্রদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত, গাছ খর্বাকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফল গোলাকার, গড় ওজন ২৫০ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১০%) ও কচকচে। বীজের পরিমাণ অল্প ও নরম। গাছ প্রতি বছরে গড়ে ৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।

বারি পেয়ারা-৩: বছরে একবার ফল প্রদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মধ্যমাকৃতি ও মধ্যম ঝোপালো জাত। ফল উপবৃত্তাকার, গড় ওজন ১৭৫ গ্রাম, শাঁস গোলাপি, নরম, অল্প মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৯%)। শাঁসে পেক্টিনের পরিমাণ বেশি থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য উত্তম জাত। গাছ প্রতি বছরে গড়ে ১৮ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২০-২২ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা গেলেও পাহাড়ি এলাকায় বেশি জনপ্রিয়। এ্যানথ্রাকনোজ ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

বারি পেয়ারা-৪: উচ্চ ফলনশীল ও বীজবিহীন জাত, গাছ খর্বাকৃতির এবং অমৌসুমে ফল প্রদানকারী জাত। ফলের গড় ওজন ২৮৪ গ্রাম, শাঁস সাদা, খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৯.৫%) ও কচকচে এবং দীর্ঘ সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন। গাছ প্রতিবছরে গড়ে ৬০-৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৩২ টন। দেশের সর্বত্র চাষ করা যায়। ঢলে পড়া রোগের প্রতিরোধী জাত।

জলবায়ু ও মাটি

পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। তবে বিষুবরেখা থেকে শুরু করে উপ-নিরক্ষীয় অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্রই এর চাষ করা হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মিটার উচ্চতার ভূমিতেও পেয়ারা জন্মে। ২৩ - ২৮° সে. তাপমাত্রা পেয়ারা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তবে পরিণত গাছ ৪৫° সে. তাপমাত্রায়ও বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু হিমাক্ষের নিচে গাছ মারা যায়। বছরে ১৪০-১৫০ সেমি. বৃষ্টিপাত পেয়ারার জন্য উপযোগী। প্রায় সব রকমের মাটিতেই পেয়ারার চাষ করা যায়, তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভাল জন্মে।

বংশ বিস্তার

বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা সবচেয়ে সহজ। বীজের গাছে মাতৃগাছের গুণ হুবহু বজায় থাকে না এবং ফল অনেক সময় নিম্নমানের হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করলে সে গাছের পেয়ারা মাতৃগাছের পেয়ারার মতো হয়। তাই অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করাই উত্তম। অঙ্গজ পদ্ধতির মধ্যে গুটিকলমই বহুল প্রচলিত তবে বর্তমানে জোড়কলমের মাধ্যমে উৎকৃষ্টমানের পেয়ারার কলম তৈরী করা হচ্ছে।

গুটিকলম: জুন-আগস্ট মাস গুটিকলম করার উপযুক্ত সময়। কলম বাঁধার জন্য ৩/৪ বছরের সুস্থ সবল গাছের পেসিলের মত মোটা ডাল বেছে নিয়ে ডালটির অগ্রভাগ হতে নীচের দিকে ৩০-৪০ সে. মি. জায়গা ছেড়ে দিয়ে ৪-৫ সে. মি. পরিমাণ স্থানের বাকল কেটে খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে তুলে ফেলতে হবে। এরপর পাঁচ গোবর ও মাটি ১ : ১ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে কাটা স্থানের চারদিক ১.৩-২.৫ সে.মি. পুরু করে লাগিয়ে পলিথিন কাগজ দিয়ে ভালভাবে বেঁধে দিতে হয়। গুটি কলম বাঁধার ৩০-৪৫ দিনের মধ্যেই শিকড় বের হয়। শিকড় বাদামী রং ধারণ করার পর যেখানে গুটি বাঁধা হয় তার নীচে ডালটিকে কেটে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর পাতা ফেলে দিয়ে কয়েকদিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে দিতে হয়। এর পর গুটি কলমগুলো যত্ন সহকারে ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ বা মাটির টবে লাগাতে হবে এবং মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে। সঠিক যত্ন নিলে ১৫-২০ দিনের মধ্যেই গুটি কলমে নতুন পাতা ও শিকড় গজাতে শুরু করবে। কলমগুলো এ অবস্থায় ৬ মাস যত্ন নিলে লাগানোর উপযোগী হবে।

জোড় কলম: পেয়ারার প্রায় সব উন্নত জাত ঢলে পড়া (Wilt) রোগের প্রতি সংবেদনশীল। রোগটি মাটি বাহিত বিধায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ বা পরিচর্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। রোগ প্রতিরোধী রুটস্টকের উপর কলম করার মাধ্যমে রোগটি সহজেই প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়া কলমকৃত গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ক্ষমতাও বেশী। পলি পেয়ারা ও এল-৪৯ (Lucknow-49) জাতের পেয়ারা রুটস্টক হিসেবে উত্তম। এক বছর বয়স্ক রুটস্টকের উপর ৮-৯ মাস বয়স্ক উপজোড় (Scion) ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্লেফট গ্রাফটিং করা হ'লে সফলতা ও কলমের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়।

উৎপাদন কলাকৌশল

গর্ত তৈরি, সার প্রয়োগ ও চারা/কলম রোপণ: এক বছর বয়সের চারা বা কলম সাধারণত ৪-৬ মিটার দূরে দূরে লাগানো হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পেয়ারার চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই পেয়ারার চারা/কলম রোপণ করা চলে। চারা লাগাবার জন্য ৬০ × ৬০ × ৪৫ সে. মি. আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পাঁচ গোবর অথবা আবর্জনা পাঁচ সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সংগে ভাল করে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি পুনরায় ওলট-পালট করে এর ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারাটি লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা: নিচের ছকে বিভিন্ন বয়সের গাছের গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেখান হ'ল।

জৈব ও রাসায়নিক সার	গাছের বয়স		
	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬ বছর বা তদুর্ধ্ব
পচা গোবর কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০-৪৫
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০-১০০	১৫০-২০০	২৫০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	১৫	২০
বোরিক এসিড (গ্রাম)	১২	২০	২৫

রোপণের পূর্বে প্রয়োগের জন্য সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের বয়স অনুযায়ী প্রতি বছর জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সমান দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার গাছের গোড়ায় না দিয়ে গোড়া থেকে ২-৪ ফুট দূরে অথবা যতদূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তবে এ দূরত্ব গাছের বয়স বৃদ্ধি ও সাথে সাথে বাড়তে থাকে।

সেচ ব্যবস্থাপনা: পেয়ারার চারা রোপণের সময় যদি গর্তের মাটি শুকনো থাকে তাহলে চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে কিছু পানি দিতে হবে। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় পেয়ারা গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি সেচের প্রয়োজন। ফলন্ত গাছে শুরু মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে বড় আকারের ফল ও বেশি ফলন পাওয়া যাবে। গোড়ায় পানি জমে গেলে ও ঠিকমত নিষ্কাশন না হলে গাছ মরে যেতে পারে।

আগাছা দমন: পেয়ারা বাগান সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষার শুরুতে এবং শেষে বাগানে চাষ দিয়ে বা কুদলিয়ে আগাছা দমন করা যায়।

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

অঙ্গ/শাখা ছাঁটাইকরণ: অঙ্গ ছাঁটাই বলতে মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলাকে বুঝায়। রোপণকৃত চারা বা কলমের সুন্দর কাঠামো দেওয়ার নিমিত্তে মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত কাণ্ডে শাখা রাখা যাবেনা এবং এর উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি ডাল রেখে গোড়ার দিকের সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ডাল নুয়ে দেয়া: পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এজন্য খাড়া ডাল ওজন বেধে অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল ছাঁটাইকরণ: কাজী পেয়ারা ও বারি পেয়ারা-২ এর গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে এবং ফল আকারে বেশ বড় হওয়ায় গাছের পক্ষে সব ফল ধরে রাখা করা সম্ভব হয়না। এতে ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফল ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ৫০-৬০% ফল ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল ছাঁটাই করে প্রায় সারাবছর গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফল ব্যাগিং (Fruit bagging): পেয়ারা ৪৫-৫০ দিন অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকা, পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং আকর্ষণীয় রঙের হয়। ব্যাগিং বাদামী কাগজ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করলে সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগেনা বিধায় ফলের কোষ বিভাজন বেশি হয় এবং ফল



আকারে বড় হয়। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মি.লি. হারে টিল্ট ২৫০ ইসি এবং কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১.০ গ্রাম হাও একত্রে মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফল শুকিয়ে গেলে ব্যাগিং শুরু করতে হবে।

পোকা-মাকড় এবং রোগবালাই ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit borer)

ক্ষতির প্রকৃতি

- ✿ পোকাক কীড়া পেয়ারা ছোট থাকা অবস্থায় ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে ও ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে।
- ✿ ক্ষতিগ্রস্ত ফল অল্পদিনের মধ্যেই ঝরে যায়। পাহাড়ি এলাকায় এ পোকাক আক্রমণ বেশি দেখা যায়।



ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত পেয়ারা



কীড়া



পূর্ণাঙ্গ পোকা

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ অর্থাৎ আক্রান্ত ফল পোকাসহ সংগ্রহ করে মাটির ১ ফুট গভীরে পুতে ফেলতে হবে অথবা আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে।
- ✿ ফল মার্বেল আকৃতির হলে কাপড়, কাগজ বা পলিথিন দিয়ে ব্যাগিং করলে শতকরা ১০০ ভাগ ফল এই পোকাক আক্রমণ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।
- ✿ জৈব বালাইনাশক সিলাস্ট্রাস এংগুলেটাস (বায়ো-চমক ১% EW) ২.৫ মিলি/লি. পানি হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ✿ আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক স্পিনোস্যাড (ট্রেসার ৪৫ SC) ০.৪ মিলি/লি. পানি হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছি: *Aleurodicus rhoioperculatus* Martin (Hemiptera: Aleyrodidae)

ক্ষতির প্রকৃতি

- ✿ পেয়ারার সাদা মাছি শুরু মৌসুমে মার্চ-মে মাসে কোন কারণে দীর্ঘদিন ক্ষরা হলে এই পোকাক প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।
- ✿ পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতা শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে।

নিরাপদ সর্বাঙ্গি ও ফল উৎপাদন

- ✿ রস শোষণের সময় পাতায় মধুরস ত্যাগ করে এবং সেই মধুর ওপরই শুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে ও পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ মারাত্মক ভাবে ব্যহত হয়।
- ✿ আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলন কমে যায়।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে এবং বাগানে বা তার আশেপাশে থাকা বিকল্প পোষক ধ্বংস করতে হবে।
- ✿ হলুদ রঙের আঠালো ফাঁদ চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পরে ১৫-২০ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। ভাল কার্যকারিতার জন্য আঠালো ফাঁদ প্রতি সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করে পুনরায় মোবিলের প্রলেপ দিতে হবে এবং ২ মাস অন্তর রং করতে হবে।
- ✿ জৈব বালাইনাশক যেমন ডি-লিমোনিন (বায়োক্লিন) ৫% এসএল অথবা সোডিয়াম লরিল ইথার সালফেট (ফিজিমাইট) ১০% (১মিলি/লি. পানি) আক্রান্ত পাতায় ৭-১০ দিন অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক ফিজিমাইট বা বায়োক্লিন (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে) এবং এসিটামিপ্রিড গ্রুপভুক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক যেমন: তুন্দ্রা ২০ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে ১৫ দিন অন্তর অন্তর আক্রান্ত পাতায় ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মিলিবাগ: *Maconellicoccus hirsutus* (Hemiptera: Pseudococcidae)

ক্ষতির প্রকৃতি

- ✿ সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়।
- ✿ নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ পোকা প্রাথমিক অবস্থায় কচি পাতার রস চুষে খায়।



- ❖ রস শোষণের সময় পাতায় মধুরস ত্যাগ করে এবং সেই মধুর ওপরই গুটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে ও পাতা কাল বর্ণ ধারণ করে ফলে সালোকসংশ্লেষণ মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়।
- ❖ সাধারণত কচি পাতায়, কচি ডগায়, বয়স্ক পাতায় ও ফলে এদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে হবে এবং বাগানে বা তার আশেপাশে থাকা বিকল্প পোষক ধ্বংস করতে হবে।
- ❖ আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক পটাশিয়াম সল্ট অব ফ্যাটি এসিড (ফাইটোফ্লিন) ৮-১০ মিলি/লি. পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ❖ সর্বশেষ উপায় হিসাবে এসিটামিপ্রিড গ্রুপভুক্ত রাসায়নিক বালাইনাশক যেমন তুন্দ্রা ২০ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ১০ দিন অন্তর আক্রান্ত পাতায় ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারার মাছি পোকা: *Bactrocera dorsalis* (Diptera: Tephritidae)

ক্ষতির প্রকৃতি

- ❖ পেয়ারা যখন কাঁচা অবস্থায় হতে পরিপক্বতা লাভ করে ঠিক তখনই কীড়া মাছি পোকা তার শক্ত এবং ধারালো ডিম পাড়ার অঙ্গ ফলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে ডিম পাড়ে।



মাছি পোকা আক্রান্ত পেয়ারা

- ❖ পোকাকার কীড়া বা ম্যাগটগুলি ফলের শাঁসের মধ্যে থাকে ও শাঁস খায়।
- ❖ আক্রান্ত পাকা পেয়ারা কাটলে তার মধ্যে অসংখ্য কীড়া বা ম্যাগোট দেখা যায়।
- ❖ আক্রান্ত পেয়ারা সহজেই পঁচে যায় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ পোকাক্রান্ত পেয়ারা সংগ্রহপূর্বক মাটিতে গভীর গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ❖ মাছি পোকাকার আক্রমণ থেকে পেয়ারা রক্ষা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো সম্পূর্ণ পরিপক্ব হওয়ার আগে সবুজ অবস্থায় গাছ থেকে পেয়ারা তুলে ফেলা।
- ❖ পেয়ারার আকৃতি মার্বেলের মত হওয়ার পর ছিদ্রযুক্ত স্বচ্ছ পলিথিন বা সাদা কাগজের ব্যাগ দিয়ে ব্যাগিং করে দিতে হবে।
- ❖ মিথাইল ইউজিনল নামক সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ ১০-১২ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে।

পেয়ারার প্রধান প্রধান রোগ ও দমন ব্যবস্থাপনা

পেয়ারার ফোষ্কা বা এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

রোগের কারণ

- ✿ *Colletotrichum gloeosporioides* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।



এ্যানথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত ফল

- ✿ গাছের পরিত্যক্ত শাখা প্রশাখা, ফল এবং পাতায় এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বর্ষাকালে ব্যাপক আকারে বীজকণা (কনিডিয়া) উৎপন্ন করে। বাতাস এবং বৃষ্টির মাধ্যমে এ সব বীজকণা দ্রুত বিস্তার লাভ করে নতুন নতুন আক্রমণের সূচনা করে।
- ✿ মাটিতে পটাসিয়ামের অভাব হলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

লক্ষণ

- ✿ রোগের জীবাণু পেয়ারা গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, কুঁড়ি ও ফলে আক্রমণ করে থাকে।
- ✿ কচি ফলের ওপর বাদামি রঙের ছোট ছোট দাগ পড়ে যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।
- ✿ ফল বৃদ্ধির সাথে সাথে দাগ বাড়তে থাকে এবং ফোষ্কা ধরণের বড় কালো ক্ষতের সৃষ্টি করে।
- ✿ আক্রান্ত ফল পরিপক্ব হলে শাঁস শক্ত হয়ে যায়।
- ✿ কোন কোন সময় ফলের ত্বক ফেটে যায়।
- ✿ সংগ্রহোত্তর পেয়ারা আক্রান্ত হলে তাড়াতাড়ি পঁচে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ গাছের নিচে ঝরে পড়া ফল এবং পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ✿ মাটিতে পটাসিয়ামের অভাব থাকলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। তাই প্রতি গাছে ৫০ গ্রাম পটাসিয়াম সালফেট মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।
- ✿ গাছে ফল ধরার পর কচি অবস্থায় কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (নোইন ৫০ WP) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা প্রোপিকোনাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ EC) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে গাছের পাতা ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে গাছে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তবে প্রোপিকোনাজোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক ব্যবহারের ৭ দিন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যাবে না।
- ✿ বড় পেয়ারায় রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ব্যাগিং করতে হবে অথবা রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: নোইন ৫০ WP) প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার গাছের পাতা, ডালপালা ও ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- ✿ পেয়ারার সংগ্রহের পর রোগের সংক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ফল সংগ্রহের ৭-১০ দিন পূর্বে কার্বেনডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: নোইন ৫০ WP) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে একবার স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারার আগা মরা রোগ (Die back of Guava)

রোগের কারণ

- ✿ *Colletotrichum psidii* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।
- ✿ রোগের জীবাণু মরা ডাল বা পুরাতন পাতায় অবস্থান করে।
- ✿ বর্ষাকালে রোগের বীজকণার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে।
- ✿ বাতাসের মাধ্যমে বীজকণা (কনিডিয়া) বিস্তার লাভ করে নতুন পাতা ও ডগায় আক্রমণ করে।
- ✿ উচ্চ তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা ৮০% উর্ধ্বে এবং বৃষ্টিপাত এ রোগের আক্রমণ ও বিস্তারে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।



লক্ষণ

- ✿ রোগের জীবাণু প্রথমে কচি পাতায় আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতা বাদামি এবং পাতার কিনারা মুড়িয়ে যায়।
- ✿ পাতাটি দ্রুত শুকিয়ে মারা যায়।
- ✿ আক্রমণ পাতা থেকে কুড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডগার অগ্রভাগ মেরে ফেলে।
- ✿ মরা ডগা নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ফলে দূর থেকে আগামরা রোগের লক্ষণ বোঝা যায়।
- ✿ আক্রান্ত ডগাটির কোষ বিবর্ণ হয়ে ওঠে।
- ✿ ডগাটি লম্বালম্বিভাবে চিড়লে পরিবহন কলায় (Vascular tissue) লম্বা গাঢ় বর্ণের দাগ দেখা যায়।
- ✿ প্রাথমিক অবস্থায় রোগ দমন না করলে রোগ সমস্ত ডালে ছড়িয়ে পড়ে।
- ✿ আক্রমণ বেশি হলে গাছ মারা যেতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ গাছে ইউরিয়াসহ প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে পানি সরবরাহ করলে রোগের আক্রমণ কমে যাবে।
- ✿ আক্রান্ত ডগা কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং কাটা অংশে বোর্দোপেস্ট (প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন) অথবা আলকাতরা লাগাতে হবে।
- ✿ কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: সানভিট ৫০ WP বা সালকব্র ৫০ WP) প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম অথবা প্রোপিকোনাভোল গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমনঃ টিল্ট ২৫০ EC) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারার কাল বা গুটি মোন্ড রোগ (Sooty mould of Guava)

রোগের কারণ

- ✿ *Capnodium mangiferae* এবং *Meliola mangiferae* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

নিরাপদ সসজ্জি ও ফল উৎপাদন

- ❖ রোগের বীজকণা (কনিডিয়া) বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে।
- ❖ মিলিবাগ এবং স্কেল (বা আঁশ) পোকা পেয়ারা গাছের ডগায় আক্রমণ করে রস শোষণ করে খায়।
- ❖ পোকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত রস শোষণ করে এবং মধু জাতীয় এক প্রকার আঠালো পদার্থ (যা হানিডিউ নামে পরিচিত) নিঃসরণ করে। উক্ত হানিডিউ পাতার ওপর পতিত হয় যার উপর ছত্রাকের বীজকণা জন্মায় এবং কালো আবরণের সৃষ্টি করে। হানিডিউ ছাড়া এ রোগ জন্মাতে পারে না।



লক্ষণ

- ❖ ঝুল রোগের আক্রমণে পাতার ওপর কালো আবরণ পড়ে।
- ❖ এই কালো আবরণ হচ্ছে ছত্রাকের দেহ ও বীজকণার সমষ্টি।
- ❖ মিলিবাগ এবং স্কেল পোকা পেয়ারা গাছের ডগায় থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রস শোষণ করে খায় এবং মধু জাতীয় এক প্রকার আঠাল পদার্থ (যা হানিডিউ নামে পরিচিত) নিঃসরণ করে। উক্ত হানিডিউ পাতার ওপর পতিত হয় যার উপর ছত্রাকের বীজকণা (কনিডিয়া) জন্মায় এবং কালো আবরণের সৃষ্টি করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ❖ পেয়ারার বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আগাছা মুক্ত ও খোলামেলা অবস্থায় রাখতে হবে।
- ❖ প্রতিটি পেয়ারা কাগজ (ব্রাউন পেপার) বা পলিথিন ব্যাগ দ্বারা মুড়িয়ে দিয়ে পেয়ারাকে পোকাকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।
- ❖ পেয়ারা বাগানে স্টেবল ব্লিচিং পাউডার দ্রবণ (১০০ গ্রাম স্টেবল ব্লিচিং পাউডার + ১০০ গ্রাম বরিক এসিড + ৪.৫ লিটার পানি) গাছে স্প্রে করতে হবে।
- ❖ গাছে মিলিবাগ বা স্কেল পোকাকার আক্রমণ থাকলে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক (যেমন- রিপকর্ড ১০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হারে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।
- ❖ আক্রান্ত পাতা/ডাল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং ছত্রাক দমনের জন্য গাছে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- থিওভিট ৮০ WG বা কুমুলাস DF) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারার ঢলে পড়া রোগ (Wilt of guava)

রোগের কারণ

- ❖ *Fusarium oxysporum f. sp. psidii* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।
- ❖ রোগের জীবাণু মাটিতে থাকে অর্থাৎ রোগটি মাটি বাহিত।
- ❖ আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে উচ্চ মাত্রায় বৃষ্টিপাত হলে ও গাছের গোড়ায় পানি জমে থাকলে এবং তাপমাত্রা ২৩-৩২ ডিগ্রী সেলসিয়াম হলে রোগের প্রকোপ বেশি ঘটে।
- ❖ গাছের মূল কোন কারণে ক্ষত হলে রোগ জীবাণু সেখান দিয়ে প্রবেশ করে।

লক্ষণ

- ❖ যে কোন বয়সের গাছ এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।
- ❖ জীবাণু প্রথমে শিকড়ের চতুর্দিকে আক্রমণ করে এবং অশ্রয় নেয়।
- ❖ পরবর্তীতে জীবাণু শিকড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে।
- ❖ পেয়ারার ডালের শীর্ষদেশের পাতা হলুদ ও বাদামি হয়ে ওঠে।
- ❖ গাছের শাখা প্রশাখা আগা থেকে শুকিয়ে যেতে শুরু করে।
- ❖ ছোট গাছে রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে তবে গাছ বড় হতে থাকলে রোগের তীব্রতা কমে।
- ❖ জীবাণুর মাইসেলিয়াম পরিবহন কলায় প্রবেশ করে ব্যাপকভাবে বংশ বৃদ্ধি করলে গাছের খাদ্য ও পানি গ্রহণ দারুণভাবে ব্যহত হয়।
- ❖ পানি ও খাদ্যের অভাবে গাছ দ্রুত মারা যায়।
- ❖ আক্রান্ত গাছের শিকড় বা কাণ্ড লম্বালম্বিভাবে কাটলে এর মধ্যকার পরিবহন কলাসমূহ গাঢ় রংয়ের দেখা যায়।
- ❖ একটা করে ডাল মারা যাওয়ার পরে আরেকটা ডাল মারা যায়।
- ❖ এইভাবে আক্রান্ত হওয়ার পর গাছ মরে যেতে অনেক দিন সময় লাগে।



পেয়ারার ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ।

দমন ব্যবস্থাপনা

জমি নির্বাচন, জমি তৈরিকরণ ও চারা রোপণ

- ❖ রোগটি মাটি বাহিত তাই এর দমন ব্যবস্থা বেশ কষ্টকর।
- ❖ মৃত গাছ তুলে আগুনে পুড়ে ফেলতে হবে।
- ❖ পেয়ারা চাষে এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এবং মাটি স্যাঁতস্যাঁতে না থাকে বিশেষ করে গাছের গোড়ার মাটি উচু করে দিতে হবে।
- ❖ চারা লাগানোর পূর্বে জমি উত্তমরূপে চাষ দিয়ে প্রখর রোদে ফেলে রাখতে হবে যাতে মাটিতে বিদ্যমান রোগজীবানুর বংশ কমানো যায়।
- ❖ চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ১ কেজি হারে নিমের খৈল/সরিষার খৈল মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিয়ে ভালভাবে পচাতে হবে অথবা ৮-১০ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২-৩ কেজি হারে ট্রাইকো-কম্পোস্ট/ট্রাইকো-ভার্মি-কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- ❖ পেয়ারার বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

চারা রোপণের পর করণীয়

- ❖ চারা লাগানোর পর প্রতি বৎসর বর্ষার আগে ১ বার এবং বর্ষার পর ১ বার প্রতি গাছের গোড়ায় ১ কেজি হারে ট্রাইকো-কম্পোস্ট/ট্রাইকো-ভার্মি-কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। অথবা

নিরাপদ সারঞ্জি ও ফল উৎপাদন

- ✿ চারা লাগানোর পর প্রতি বৎসর বর্ষার আগে ২ বার এবং বর্ষার পর ২-৩ বার ১০-১৫ দিন অন্তর কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: অটোস্টিন ৫০ WDG) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ও গোড়ার আশেপাশের মাটি ভাল ভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।
- ✿ গাছের মূল যেন ক্ষত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ✿ সদ্যাক্রান্ত গাছের গোড়ায় কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: অটোস্টিন ৫০ WDG) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ৪-৫ বার গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করে গোড়ার আশেপাশের মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

পেয়ারার স্টেম ক্যাংকার রোগ (Stem canker of Guava)

রোগের কারণ

- ✿ *Physalospora psidii* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।
- ✿ আক্রান্ত অংশে বাকলের নীচে তন্তুতে ছত্রাক বেঁচে থাকে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় স্পোর উৎপন্ন করে নতুন গাছকে আক্রমণ করে।

লক্ষণ

- ✿ ছত্রাক ডালপালাকে আক্রমণ করে।
- ✿ আক্রান্ত ডালে ফাটল দেখা দেয় এবং কাণ্ড বরাবর দাগ পড়তে থাকে।
- ✿ কাণ্ডের তন্তু মরে যায়।
- ✿ কাণ্ডে খাদ্য সঞ্চালন ব্যাহত ঘটে এবং ডাল নুয়ে পড়ে।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ আক্রান্ত গাছের ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়ে ফেলতে হবে এবং কাটা অংশে বোর্দোপেস্ট অথবা আলকাতরা লাগাতে হবে।
- ✿ কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন: সানভিট ৫০ ডবিউপি বা সালকব্র ৫০ ডবিউপি) প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ৩-৫ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

পেয়ারার দাদ রোগ (Scab of guava)

রোগের কারণ

- ✿ *Elsinoe sp.* ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।
- ✿ বৃষ্টির ঝাপটায় কনিডিয়া গাছের পাতা, ডাল ও ফলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আর্দ্র স্থানে আক্রমণ করে। আক্রমণের জন্য উপযোগী তাপমাত্রা ১৬-২৩° সেন্টিগ্রেড।
- ✿ অতিরিক্ত শিশির, কুয়াশা এবং আর্দ্রতা রোগ বিস্তারের জন্য খুবই অনুকূল।

রোগের লক্ষণ

- ✿ পাতায়, কচি ডালে ও ফলে এ রোগ হয়।
- ✿ কচি পাতার ওপর ছোট ছোট ফিকে কমলা রঙের দাগ পড়ে।
- ✿ রোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে দাগ আঁচিলের ন্যায় উঁচু হয়ে উঠে।
- ✿ অতিরিক্ত রোগাক্রান্ত পাতা অত্যাধিক মাত্রায় কুঁচকে যায় ও বিকৃত হয়ে যায়।
- ✿ রোগের ব্যাপক প্রসার ঘটলে ফলে ককেহ্র ন্যায় খসখসে হয়ে বিশী দেখায়।
- ✿ রোগাক্রান্ত ফলের ওপর উঁচু উঁচু গাঢ় বাদামি রঙের দাগ দেখা যায়।
- ✿ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত ফল শক্ত হয় ও পরিপক্ব হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে।
- ✿ ফলের বাজার মূল্য কমে যায়।



দমন ব্যবস্থাপনা

- ✿ বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ✿ রোগমুক্ত বীজতলার চারা ব্যবহার করতে হবে।
- ✿ গাছ থেকে আক্রান্ত পাতা, ডালপালা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।
- ✿ কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমনঃ সানভিট ৫০)

ফলের পরিপক্বতা ও সংগ্রহ

পেয়ারা পরিপক্ব হলে গাড় সবুজ রঙ পরিবর্তন করে আস্তে আস্তে হালকা সবুজ বা হলদে সবুজ রঙে পরিবর্তন হয়। পরিপক্ব পেয়ারা বাঁটা বা দু-একটা পাতাসহ কেটে বাজারে আনা হলে একে সজীব মনে হয় এবং ফলের গুণগতমান বজায় থাকে। প্রথর রোদ বা বৃষ্টির সময় পেয়ারা সংগ্রহ করা ঠিক নয়। পেয়ারা সংগ্রহের পর কোন অবস্থায় মাটিতে রাখা যাবে না।



পরিবহন

পেয়ারা গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর যথাক্রমে সার্টিং ও গ্রেডিং করার পর প্লাস্টিকের ক্রেটে সাজিয়ে পরিবহন করা হয়। পরিবহনের সময় অতিরিক্ত তাপে পেয়ারা যেন নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কম তাপমাত্রায় রাতে পেয়ারার পরিবহন করতে হবে। পেয়ারা পরিবহনের সময় প্লাস্টিক ক্রেটের উপরে বসা উচিৎ নয় অথবা অন্য কোন ভারী জিনিস রেখে পরিবহন করা ঠিক নয়।

বাজারজাতকরণ ও সংরক্ষণ

পাইকারী ও খুচরা বাজারে পেয়ারা বাজারজাত করা হয়। পাইকারী বাজারে বিক্রয়ের পর এগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে পরিবহন হয়। এরপর খুচরা বাজারে বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা বা ভোক্তাদেও হাতে পৌঁছায়। পেয়ারা গাছ তেকে সংগ্রহের পর কম তাপমাত্রায় (২২-২৫°সেলসিয়াস) সংরক্ষণ করা উত্তম। এ তাপমাত্রায় পেয়ারা ওজন হ্রাস কম হয়। পেয়ারা ফল সাধারণত ৮-১৪° সেং তাপমাত্রায় ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন

সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল আসার ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করা যায়। পেয়ারা পাকার সময় হলে সবুজ হতে রং বদলিয়ে আস্তে আস্তে হলদে সবুজে পরিনত হয়। এটাই পেয়ারা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। পেয়ারা কোন সময়েই বেশী পাকতে দেওয়া উচিত নয়, এতে স্বাদ কমে যায়। গাছের বয়স, মৌসুম, জাত, মাটি ও পরিচর্যা অনুযায়ী ফলন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। জাতভেদে গাছ প্রতি বছরে গড়ে ৩০-৬৫ কেজি ফল হয়। হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২৫-৩৫ টন।

কুল

ড. মো. শরফ উদ্দিন

কুল (*Ziziphus mauritiana*) বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। কুলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি বিদ্যমান। শীতকালে দেশীয় ফলের অপ্রতুলতার সময় এদেশে ফলের চাহিদা পূরণে কুল বিশেষ ভূমিকা রাখে। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও শুকিয়ে সংরক্ষণ, আচার তৈরি ও ব্যঞ্জন রান্নায় টকের উৎস হিসেবে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বাংলাদেশে সাধারণত বসত-বাড়ি, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়েই এর চাষ হয়ে থাকে। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় কুলের বাণিজ্যিক চাষ শুরু হয়েছে এবং বেশ কিছু এলাকায় এটি একটি লাভজনক ফসল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এদেশে ২০২৩-২৪ মৌসুমে ৮৫৫০ হেক্টর জমিতে ১০০৮১৯ মে. টন কুল উৎপাদিত হয়েছে (বিবিএস, ২০২৫)। কুল গাছে লাক্ষা নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা পালন করে গালা (lac) তৈরি করা হয়। রাজশাহী অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে গালা উৎপন্ন হয়।

পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী পাকা কুলে ৭৩.২ গ্রাম জলীয় অংশ, ১.০ গ্রাম খনিজ, ২.৯ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম চর্বি, ২৩.৮ গ্রাম শর্করা, ১১.০ মি.গ্রা. ক্যালসিয়াম, ১.৮ মি.গ্রা. লৌহ, ০.০২ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-১, ০.০৫ মি.গ্রা. ভিটামিন বি-২, ৫১ মি.গ্রা. ভিটামিন সি ও ১০৪ কিলোক্যালরী খাদ্যশক্তি রয়েছে।

কুল চাষের সুবিধা

- ❖ তুলনামূলকভাবে কুল চাষে যত্ন, পরিচর্যা ও খরচ কম।
- ❖ কুল গাছ খরা সহিষ্ণু এবং স্বল্প উর্বরতা সম্পন্ন মাটি ও প্রতিকূল আবহাওয়ায়ও সফলভাবে চাষ করা যায়।
- ❖ অনুন্নত জাতকে খুব সহজেই উন্নত জাতে রূপান্তর করা যায় এবং খুব সহজে এক গাছে একাধিক জাতের কুড়ি সংযোজন করা যায়।
- ❖ ডাল ছাঁটাই করে প্রচুর জ্বালানী পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনে গাছের আকার সীমিত রাখা যায়।
- ❖ তুলনামূলকভাবে এতে রোগবালাই ও অনিষ্টকারী পোকামাকড়ের উপদ্রব কম।
- ❖ কুলের লবণাক্ততা সহ্য ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশি।
- ❖ সারা দেশেই চাষাবাদ করা যায়।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি কুল-১, বারি কুল-২, বারি কুল-৩, বারি কুল-৪ ও বারি কুল-৫ নামে পাঁচটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি কুল-১: উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী জাতটি ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসে এবং ফেব্রুয়ারির শেষার্ধে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল মাঝারী (গড় ওজন ২৩ গ্রাম), হলুদাভ সবুজ বর্ণের ও দু'প্রান্ত সফ। খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্‌মান ১৩%) ও কণ্ঠিভাব বিহীন। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২%। ফলন ১০-১৫ টন/হেক্টর। রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষ উপযোগী।

বারি কুল-২: উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাতটিও ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসে এবং ফেব্রুয়ারির

নিরাপদ স্নায়ু ও ফল উৎপাদন

শেষার্ধে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল মাঝারী (গড় ওজন ৩৪ গ্রাম), বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১% ও খেতে সুস্বাদু (ব্রিক্রমান ১১.৫%) ও কণ্ঠিভাব বিহীন। হেক্টর প্রতি ফলন ১৮-২০ টন। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি কুল-৩: উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছ খাটো, মোটামুটি খাড়া। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে বড় (গড় ওজন ৭৫ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% ও শাস কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্রমান ১৪%) ও কণ্ঠিভাব বিহীন। হেক্টর প্রতি ফলন ২২-২৫ টন। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি কুল-৪: উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাতটি ২০১৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছ খাটো, মোটামুটি খাড়া। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে মাঝারী (গড় ওজন ৩৬ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% ও শাস কচকচে, খুব মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্রমান ১৫%) ও কণ্ঠিভাব বিহীন। হেক্টর প্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি কুল-৫: টক কুলের উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্ত করা হয়। গাছ খাটো ও মোটামুটি খাড়া। আগস্টের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে গাছে ফুল আসে এবং ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফল আহরণ শুরু হয়। ফল আকারে ছোট (গড় ওজন ১৬ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৪% ও শাস রসালো, টক (ব্রিক্রমান ১৮%) আচার তৈরীর জন্য উত্তম। হেক্টর প্রতি ফলন ১৫-১৬ টন। দেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

জলবায়ু ও মাটি

উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কুল চাষের জন্য উত্তম। তবে কুলের পরিবেশিক উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায়ও সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিকশিত বেলে দাঁ-আঁশ থেকে দাঁ-আঁশ মাটি কুল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী তবে সব ধরনের মাটিতেই কুলের চাষ করা যায়। অন্যান্য প্রধান ফল ও ফসলের জন্য উপযোগী নয় এমন অনুর্বর জমিতে এমনকি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে কুলের চাষ করা সম্ভব।

বংশবিস্তার ও জাত পরিবর্তন

যৌন (বীজ) এবং অযৌন (কলম) উভয় পদ্ধতিতেই কুলের বংশবিস্তার করা যায়। যৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা হলে মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকেনা বিধায় কলমের মাধ্যমে বংশবিস্তার করাই উত্তম।

ফাটল কলম: ফাটল (Cleft) কলম করার জন্য বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হয়। সংরক্ষণ করা হলে অংকুরোদগম ক্ষমতা বিনষ্ট হয় বিধায় সংগ্রহের পরপরই কুলের বীজ বপণ করতে হবে। কুলের চারার স্থানান্তর জনিত মৃত্যু হার কমানোর জন্য সরাসরি পলিব্যাগে বীজ বপণ করা উত্তম। পলিব্যাগের আকার কমপক্ষে ২০ সে. মি. ১৫ সে. মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৩-১৫ মাস বয়সের চারা (আদিজোড়) ডগার দিক থেকে কচি অংশ বাদ দিয়ে ৪-৬ মাস বয়সের ডাল (উপজোড়) ফাটল পদ্ধতিতে সংযোজন করা হয়। মে-জুন মাস কুলের কলম করার উপযুক্ত সময়। ডাল সংযোজনের পর পলিথিনের কাগজ দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এতে ভেতরের আর্দ্রতা বৃদ্ধির ফলে নতুন কুঁড়ি বের হওয়া ত্বরান্বিত হবে। ডাল সংযোজনের ২৫-৩০ দিন পর নতুন পাতা ও কুঁড়ি বের হলে পলিথিনের ঢাকনা খুলে দিতে হবে। কলমের চারায় নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে এবং আদিজোড় থেকে উৎপাদিত সমস্ত কুঁড়ি ভেঙ্গে দিতে হবে। কলম করার পরবর্তী বছরে তা রোপণের উপযোগী হয়।

অনুন্নত কুল গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর: গ্রামাঞ্চলে এবং মফস্বল শহরগুলোতে প্রায় প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায়, রাস্তার ধারে, পুকুর পাড়ে এবং আনাচে-কানাচে অসংখ্য অনুন্নত কুলগাছ দেখতে পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই স্বল্প উৎপাদনশীল এবং ফলের গুণগত মানও ভাল নয়। বাড়ি এর মাধ্যমে এসব অনুন্নত কুল গাছকে সহজেই উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। রূপান্তরিত গাছ থেকে পরবর্তী মৌসুমেই উন্নত জাতের কুল আহরণ করা যায়। এ পদ্ধতিতে একই গাছে একাধিক জাতের সমাবেশ ঘটানোও বিচিত্র নয়। বাড়ি এর মাধ্যমে অনুন্নত কুল গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তরিত করতে হলে উভয় গাছকেই ফল আহরণের পর ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাইয়ের ৪০-৪৫ দিন পর নির্বাচিত নতুন গজানো ডালে তালি কলম (Patch budding) পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কুঁড়ি সংযোজন করতে হবে। বাড়িকৃত ডালগুলো ছাড়া অন্যান্য ডাল কেটে ফেলতে হবে। কুঁড়ি সংযোজনের ১০-২৫ দিন পর ঐ কুঁড়ি থেকে নতুন কুশি বের হলে ডালের উপরের অংশ এবং সংযোজিত কুঁড়ি ছাড়া অন্যান্য কুঁড়ি থেকে গজানো শাখা কেটে ফেলতে হবে। সংযোজিত কুঁড়ি থেকে গজানো শাখায় পরবর্তী মৌসুমে পর্যাপ্ত কুল ধরে। এই পদ্ধতিতে একটি গাছকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে উন্নত জাতে রূপান্তর করা যায়। আবার ইচ্ছা করলে একই গাছে একাধিক জাতের কুঁড়িও সংযোজন করা যায়। এতে একই গাছ থেকে দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন জাতের কুল আহরণ করা যাবে। আমাদের দেশে সাধারণভাবে এপ্রিল-মে মাস কুঁড়ি সংযোজনের উপযুক্ত সময়।

উৎপাদন কৌশল

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে $1 \times 1 \times 1$ মি. আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে।

রোপণের সময়: জুন-সেপ্টেম্বর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে ওলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা নিম্নরূপ:

গাছের বয়স	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ/বছর					
	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)	বোরিক এসিড (গ্রাম)
ভিত্তি প্রয়োগ	৫	-	৩০০	২৫০	৫৬	-
০-১	২	৩০৪	২৫০	২৫০	৮৪	-
২-৪ বছর	২.৫	৬৯৪	৫০০	৬০০	১১২	২৯
৫-৭ বছর	৩	৮৬৮	৮০০	৮০০	১৪০	২৯
৮-১০ বছর	৪	১০৮৫	১০০০	১১০০	১৬৮	২৯
১১-১৫ বছর	৪	১১৯৪	১২৫০	১২০০	২২৪	৫৯
১৬-২০ বছর	৫	১৩৪৫	১৪০০	১৩০০	২২৪	৫৯
২০ তদুর্ধ্ব	৫	১৬২৮	১৭৫০	১৫০০	২৮০	৫৯

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ভিত্তি প্রয়োগের সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার মাদায়/গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। গাছের বয়স অনুযায়ী ছকে উল্লেখিত সার সমান তিন কিস্তিতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ; মে-জুন এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে ও পাহাড়ের ঢালে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে/পেগিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর এবং ডালপালা বিস্তৃতির উপর। সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১/২ হাত দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত (গাছের ক্যানোপি পর্যন্ত) সার প্রয়োগ করা হয়।

পানি সেচ ও পরিচর্যা: শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সেচ দিলে ফলের গুণগত মান ও ফলন বৃদ্ধি পায়। চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

ডালপালা ছাঁটাই: নতুন রোপণকৃত বা কলমকৃত গাছে আদিজোড় হাতে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা উচিত নয়। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫ টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। কুল গাছে সাধারণত চলতি বছরের নতুন গজানো প্রশাখায় ভাল ফল



ধরে। এজন্য প্রতিবছর ফল আহরণের পরপরই ডাল ছাঁটাই আবশ্যিক। চারা রোপণের বা কুঁড়ি সংযোজনের পর ৩/৪ বছর মধ্যম ছাঁটাই অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রশাখা এবং শাখার মাথার দিক থেকে ৫০-৬০ সে.মি. পরিমাণ ছাঁটাই করাই যথেষ্ট। গাছ কাঙ্ক্ষিত আকারে আসার পর এক বছর বয়সী ডাল গোড়ার দিকে ২০-৩০ সে.মি. পরিমাণ রেখে সম্পূর্ণ ডালটাই ছেঁটে দিতে হবে। এছাড়া মরা, দুর্বল, রোগাক্রান্ত এবং এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ডালও ছেঁটে দিতে হবে।

রোগবালাই, পোকা-মাকড় ও অন্যান্য সমস্যা এবং তাদের প্রতিকার

পাউডারি মিলডিউ: সাধারণত কার্তিক মাসে এ রোগের উপদ্রব লক্ষ্য করা যায়। এ রোগের আক্রমণ হলে প্রথমে পাতার নিচে সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায় যা পরবর্তী সময়ে কাল বা বাদামী রং ধারণ করে। আন্তে আন্তে এ রোগ ফুল ও ফলে বিস্তার লাভ করে। এতে ফুল এবং ফল বাদামী রং ধারণ করে এবং বারে পরে। ফলের পরিপক্ক অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ হলে ফল ফেটে যায়।

প্রতিকার: বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছে ফুল আসার সময় প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম থিওভিট বা কুমুলাস মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার পাতার নিচের দিক ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফল পচা: ফলের নিম্ন প্রান্তে হালকা ধূসর-বাদামী দাগ দেখা দেয়। অনেক সময় ফলের গায়ে গাঢ়-বাদামী বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণে ফলে ভিটামিন সি এর পরিমাণ কমে যায় এবং ক্ষতিকারক আফলা টক্সিন উৎপন্ন হয়।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটির অনেক গভীরে পুতে ফেলতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫/ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা: স্ত্রী পোকা ছিদ্র করে পরিপক্ব হতে থাকা ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ২-৫ দিনের মধ্যে কীড়া বের হয় এবং ভিতরের শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে যায় এবং ঝরে পরে।

প্রতিকার: আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির অনেক গভীরে পুতে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গ্রীষ্মকালে জমিতে চাষ দিয়ে লুকানো পুত্তলী উন্মুক্ত করে দিতে হবে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মি.লি. রিপকর্ড বা সিন্থুশ অথবা ০.৫ মি.লি. ডেসিস মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লিফ চেফার: এটি বিটল জাতীয় পোকা। বর্ষা মৌসুমে এ পোকাকার আক্রমণ বেশী হয়। বয়স্ক পোকা রাতে কচিপাতা খেয়ে ব্যাপক ক্ষতি করতে পারে।

প্রতিকার: সুমিআলফা/সুমিথিয়ন প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. হারে মিশিয়ে গাছের পাতায় প্রতি ১০ দিন অন্তর দুই স্প্রে করতে হবে। এছাড়া গাছের আশে পাশের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং ক্লোরপাইরিফস জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

ফলের গা খসখসে হওয়া: বোরনের অভাবজনিত কারণে ফলের গায়ে দাদেরমত খসখসে দাগ সৃষ্টি হয়। এতে ফলের উজ্জলতা ও বাজারমূল্য হ্রাস পায়।

প্রতিকার: ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফলন: জাতভেদে হেক্টর প্রতি ফলন ২০-৩০ টন।

ফল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ

সঠিকভাবে পরিপক্ব অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অপরিপক্ব ফল আহরণ করা হলে তা কখনই কাজিখত ও মানসম্পন্ন হয় না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম এবং মলিন বর্ণের হয়ে যায়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুণ কমে যায় এবং ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাজিখত অবস্থায় পৌছবে তখনই ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠান্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী। গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করার পর যথাক্রমে সার্টিং ও গ্রেডিং করার পর প্লাস্টিকের ট্রেট অথবা কাগজের কার্টনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ করা হলে ফলের সংগ্রহভ্রমের ক্ষতি কম হয় ও গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

ড্রাগনফল

ড. মো. শরফ উদ্দিন

ড্রাগন ফল (*Hylocereus sp.*) এক ধরনের ফণীমনসা (ক্যাক্টাস) প্রজাতির ফল। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত মধ্য আমেরিকার প্রসিদ্ধ একটি ফল। ভিয়েতনামে এ ফল সর্বাধিক বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয়। বর্তমানে এ ফলটি দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ চীন, মেক্সিকো, ইসরাইল, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বাংলাদেশেও চাষ করা হচ্ছে। ড্রাগন ফল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর দেখতে ডিম্বাকার ও বাইরের আবরণ লাল, হলুদ এবং গোলাপী রঙের হয়ে থাকে, কাটলে ভেতরটা দেখতে লাল বা সাদা রঙের। ফলের মধ্যে কালজিরার মতো ছোট ছোট নরম বীজ থাকে। নরম শাঁস ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত গোলাপি বর্ণের এই ফল খেতে বেশ সুস্বাদু। গাছ ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার লম্বা হয়। ড্রাগন ফলের গাছ লতানো ইউফোরবিয়া গোত্রের গাছের মত কিন্তু এর কোন পাতা নেই। ড্রাগন ফল গাছে শুধুমাত্র রাতে ফুল ফোটে। ফুল লম্বাটে সাদা ও হলুদ রঙের হয়। ফুল স্বপরাগায়িত বা পরপরগায়িত উভয় প্রকার হয়ে থাকে। মাছি, মৌমাছি ও পোকা-মাকড় এর পরাগায়ণ ত্বরান্বিত করে এবং কৃত্রিম পরাগায়নও করা যেতে পারে। ফুল থেকে ডিম্বাকার ফল গঠিত হয়।

উৎপত্তি ও বিস্তার: ড্রাগন ফল মূলতঃ আমেরিকার একটি প্রসিদ্ধ ফল, যা বর্তমানে আমাদের দেশেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু ড্রাগন ফল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। বন্যামুক্ত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ড্রাগন ফলের চাষ করা যায়। বর্তমানে ঢাকা, নাটোর, গাজীপুর, পাবনা, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, বগুড়া, চট্টগ্রাম, নরসিংদী, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বাণিজ্যিকভাবে ড্রাগন ফলের বাগান স্থাপিত হয়েছে এবং দেশের অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে।



ড্রাগন ফুল

পুষ্টিগুণ: ড্রাগন ফলের প্রতি ১০০ গ্রামের মধ্যে খাদ্যোপযোগী অংশের পরিমাণ ৫৫-৮৫ গ্রাম। খাদ্যোপযোগী অংশের প্রতি ১০০ গ্রামে নিম্নোক্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়-

পুষ্টি উপাদান	পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ	পুষ্টি উপাদান	পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ
পানি	: ৮০-৯০ গ্রাম	আয়রন	: ০.৩-০.৭ মিলিগ্রাম
শর্করা	: ৯-১৪ গ্রাম	ফসফরাস	: ১৬-৩৫ মিলিগ্রাম
প্রোটিন	: ০.১৫-০.৯০ গ্রাম	ভিটামিন সি	: ৪-২৫ মিলিগ্রাম
আঁশ	: ০.৩৩-০.৯০ গ্রাম	বিটা ক্যারোটিন	: ৫-১৫ মিলিগ্রাম
খাদ্যশক্তি	: ৩৫-৫০ গ্রাম	ভিটামিন বি ১ (নায়াসিন)	: ০.২-০.৪৫ মিলিগ্রাম
চর্বি	: ০.১০-০.৬ গ্রাম	ভিটামিন বি ২ (রিবোফ্লাভিন)	: ০.২-০.৪ মিলিগ্রাম
ক্যালসিয়াম	: ৬.১০ গ্রাম	ভিটামিন বি ৩ (নিকোটিনিক এসিড)	: ০.২-০.৪ মিলিগ্রাম

জাত পরিচিতি

ড্রাগনফল সাধারণতঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে টক স্বাদযুক্ত এবং মিষ্টি স্বাদযুক্ত। মূলতঃ এই মিষ্টি স্বাদযুক্ত ড্রাগন ফলই বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। মিষ্টি স্বাদযুক্ত ড্রাগন ফল আবার তিন প্রজাতির হয়ে থাকে—

- ১। গোলাপি ড্রাগন ফল বা পিটাইয়া (*Hylocereus undatus*) : এই জাতের ফলের খোসার রং লাল এবং শাঁস সাদা। এই প্রজাতির ফলই বেশি দেখা যায়।
- ২। কোস্টারিকা ড্রাগন ফল (*Hylocereus costaricensis*) : এই জাতের ফলের খোসা ও শাঁস উভয়েরই রং লাল। (উদাহরণঃ বারি ড্রাগন ফল-১)।
- ৩। হলুদ রঙের ড্রাগন ফল (*Hylocereus megalanthus*) : এই জাতের ফলের খোসার রং হলুদ এবং শাঁস সাদা।



গোলাপি ড্রাগন ফল বা পিটাইয়া



কোস্টারিকা ড্রাগন ফল



হলুদ রঙের ড্রাগন ফল

বারি ড্রাগনফল-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী জাত। লাল রঙের এন্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ২০১৪ সালে অবমুক্ত করা হয়।



বারি ড্রাগন ফল-১

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ✿ ফলের শাঁস গাঢ় গোলাপী রঙের, রসালো এবং খাদ্যোপযোগী অংশের পরিমাণ প্রায় ৮১%।
- ✿ প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম, ফলের স্বাদ অত্যন্ত মিষ্টি (টিএসএস-৮১%)।
- ✿ বীজ খুব ছোট ও নরম।
- ✿ প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ১২.০৬ মাইক্রোগ্রাম বেটা ক্যারোটিন এবং ৪১.২৭ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে।
- ✿ এ জাতের ড্রাগনফল রোপণের পরবর্তী ১-১.৫ বছরের মধ্যেই ফল ধারণ করতে পারে। ১-১.৫ বছর বয়স্ক গাছ হতে প্রায় ৩-৫ টি ফল পাওয়া গেলেও পূর্ণ বয়স্ক গাছ হতে বছরে প্রায় ২০-১০০ টি ফল সংগ্রহ করা যায়।
- ✿ একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় ফলন ১৩ কেজি/গাছ এবং ৬০ টন/হেক্টর।
- ✿ নিয়মিত পরিচর্যা করলে বারি ড্রাগন ফল-১ এর বাগান থেকে অন্ততঃ ২৫ বছর পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

মাটি ও জলবায়ু

অন্যান্য ক্যাকটাস প্রজাতি মরুভূমিতে জন্মালেও ড্রাগনফল হলো পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার ফল। এই ফলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বাৎসরিক ৫০০-১৫০০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন হয়। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে ফুল ঝরা ও ফলে পঁচন দেখা দিতে পারে। ড্রাগনফল প্রচুর আলো পছন্দ করে এবং উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মায়। ভালো ফলনের জন্য ২৫-৩৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। বেলে থেকে এঁটেল প্রায় সব ধরনের মাটিতেই ড্রাগন ফল চাষ করা গেলেও সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটিতে গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। ড্রাগনফল গাছ মোটেও জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায়, পানি জমে না এমন উঁচু জমিতে এ ফলটি চাষ করা উচিত। ড্রাগন ফলের জন্য আদর্শ অম্ল-ক্ষারত্ব (pH) হলো ৫.৫- ৬.৫।

উৎপাদন কলাকৌশল

বংশ বিস্তার ও চারা রোপণঃ

- ✿ অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে ড্রাগনফলের বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ দিয়ে সহজেই এ ফলের বংশ বিস্তার করা গেলেও এতে ফল ধরতে ৫ থেকে ৭ বছর সময় লাগে এবং উৎপাদিত ফলে ছবছ মাতৃগুণগুণ বজায় থাকে না।
- ✿ সে জন্য কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিং এর সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি আসে এবং ছবছ মাতৃগুণগুণ বজায় থাকে।
- ✿ সারা বছরই কাটিং করা যায় তবে ফসল সংগ্রহের শেষে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস কাটিং করার উপযুক্ত সময়। কাটিং থেকে উৎপাদিত গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে।
- ✿ টিস্যু কালচারের মাধ্যমেও চারা উৎপাদন করা যায়, তবে এ চারায় ফল আসতে দীর্ঘ সময় লাগে।
- ✿ সাধারণত ছয় থেকে এক বছর বয়স্ক গাছ সবুজ শাখার ১৫ থেকে ৩০ সে. মি. লম্বা খন্ড কাটিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়, তবে ৩০ সে. মি. লম্বা শাখা কাটিং উত্তম। প্রায় ৩০ থেকে ৪৫ দিন পরে কাটিং এর গোড়া থেকে শিকড় এবং উপরের প্রান্ত থেকে নতুন কুশি বেরিয়ে আসে। তখন কাটিংকৃত চারাগুলি মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হয়। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনে ২০ থেকে ৩০ সে. মি. লম্বা কাটিং সরাসরি মূল জমিতেও লাগানো যায়।



কাটিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত চারা



টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা

জমি নির্বাচন ও তৈরি

ড্রাগনফল চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারি উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে যেখানে প্রচুর আলো-বাতাস আছে। নির্বাচিত জমি পরপর কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

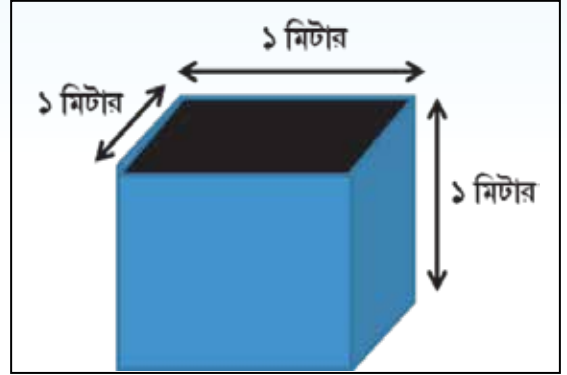
রোপণ পদ্ধতি ও সময়

সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভূজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের পর অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। এপ্রিল থেকে অক্টোবর ড্রাগন ফলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

খুঁটি ও মাদা তৈরি

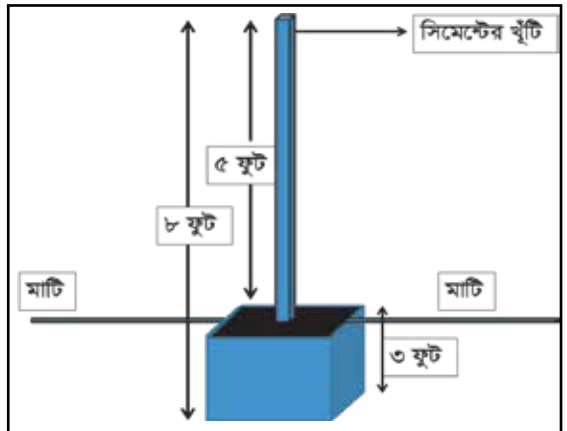
খুঁটি ও মাদা তৈরিতে যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে সেগুলো হলো-

- ❖ ড্রাগন ফল চাষের ক্ষেত্রে সিমেন্টের খুঁটি ব্যবহার করা একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা না হলে পূর্ণ বয়স্ক গাছের ডালপালা ব্যবস্থাপনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।



মাদার আকার

- ❖ খুঁটির দৈর্ঘ্য কমপক্ষে ২.৫ মিটার (প্রায় ৮ ফুট) হতে হবে এবং গর্তের ঠিক মাঝ বরাবর এমন ভাবে পুঁতে দিতে হবে যাতে করে মাটির উপরে ১.৫-১.৭৫ মিটার (প্রায় ৫ ফুট) অবশিষ্ট থাকে। চিত্রঃ খুঁটির আকার ও মাদায় খুঁটি স্থাপন



খুঁটির আকার ও মাদায় খুঁটি স্থাপন

- ❖ মাদা তৈরির ক্ষেত্রে ১.০ মি. x ১.০ মি. x ১.০ মি. আকারের গর্ত করে গর্তের মাটি উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে।
- ❖ অতপরঃ গর্তের ঠিক মাঝ বরাবর সিমেন্টের খুঁটি পুঁতে দিতে হবে এবং গর্তের মাটির সাথে প্রতি গর্তে ১৫-২৫ কেজি পঁচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১০০ গ্রাম জিপসাম, ১৫ গ্রাম জিংক সালফেট ও ২৫ গ্রাম বরিক এসিড সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে কমপক্ষে ২০-২৫ দিন রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে হালকা পানি সেচ দিতে হবে।

- ✿ সাধারণতঃ ২-২.৫ মিটার (প্রায় ৮ ফুট) লম্বা কংক্রিটের খুঁটির উপরের অংশে রড দিয়ে তৈরি সাইকেল বা মটর সাইকেলের টায়ারের মাপে কাঠামোতে টায়ার পরিয়ে উপযুক্ত বাউনী তৈরি করা যায়

চারা রোপণ ও পরিচর্যা:

- ✿ গর্ত ভরাট করার ২০-২৫ দিন পর প্রতিটি খুঁটির চার পাশে ১ টি করে চারা সোজাভাবে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালোভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✿ খুঁটি থেকে খুঁটি এবং লাইন থেকে লাইন উভয় ক্ষেত্রেই ২.৫ মি. (প্রায় ৮ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখা উত্তম।



ড্রাগনফল বাগান

- ✿ চারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে নারিকেলের রশি (কাতা) দিয়ে কাড খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। যাতে করে গাছ বড় হলে কাড থেকে শিকড় বেড় হয়ে খুঁটিকে সহজে আকড়ে ধরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। গাছের ডগা টায়ারের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে চতুর্দিকে বুলিয়ে দিতে হবে। এইরূপ বুলন্ত ডগায় বিশেষ হরমোনের পর্যাপ্ততার কারণে ফল ধারণ ক্ষমতা বেশি হয়।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা:

সার ব্যবস্থাপনা: ড্রাগনফল গাছের আশানুরূপ বৃদ্ধি ও ফলন পেতে হলে নিয়মিত সার প্রয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি। এই গাছে যেহেতু কোন পাতা থাকেনা শুধু কাড থাকে তাই এর স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে প্রচুর পুষ্টির প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে প্রাথমিক অবস্থায় (১-২ বছর পর্যন্ত) নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বিভিন্ন পর্যায়ে কি পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১-২ বছর বয়স পর্যন্ত: চারা রোপণের পর থেকে ১-২ বছর বয়স পর্যন্ত গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ না হলে পরবর্তীতে গাছের ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং ফল আসতেও অনেক সময় লাগে। গবেষণায় দেখা যায়, এই সময় প্রতি মাসে সার প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে ভালো হয়। এক্ষেত্রে, প্রতি মাসে ৫০ গ্রাম করে ইউরিয়া এবং এমওপি সার এবং প্রতি দুইমাস অন্তর ৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২ কেজি করে জৈব সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।

পরিপক্ব অথবা ফল ধারণকারী গাছের জন্য (২ বছর এর উর্ধ্বে)

- ✿ প্রতি বছর সর্বশেষ ফল সংগ্রহের পর সাধারণত অক্টোবর-নভেম্বর মাসে প্রতিটি পিলারে ২০-২৫ কেজি করে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতি ৪ মাস অন্তর ৫-৮ কেজি জৈব সার প্রতি পিলারে প্রয়োগ করলে আরও অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব।
- ✿ রাসায়নিক সার প্রয়োগের সময় ও পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

সময়	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
	২ বছরের বেশি	২ বছরের বেশি	২ বছরের বেশি
অক্টোবর মাসের শুরুতে	৪৭০	১০৮০	-
ডিসেম্বর মাসের শুরুতে	৩৫০	৭২০	৯০
এপ্রিল মাসের শেষে	১১৫	১৪৪০	২৪০
জুন মাসের শেষে	২৩৫	৩৬০	২৭০

আগাছা দমন

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে নিড়ানী বা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা হালকাভাবে চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। আগাছা দমনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

ড্রাগনফল গাছ ক্যাকটাস সাকুলেন্ট জাতীয় উদ্ভিদ হওয়ায় এটি অনেকটা খরা সহনশীল তাই সাধারণত বেশি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে গাছের সঠিক বৃদ্ধি এবং আশানুরূপ ফলনের জন্য মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ফুলের কুড়ি আসার সময় এবং ফলন্ত অবস্থায় নিয়মিত সেচ প্রদান ভালো ফলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সার প্রয়োগের পর পর হালকা সেচ প্রদান অত্যন্ত জরুরি। ফুল আসার ৪-৬ সপ্তাহ পূর্বে পানির পীড়ন দিলে ফুল ফোটা ত্বরান্বিত হয়। ড্রাগনফল গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, তাই বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে থাকে সেজন্য নিষ্কাশনের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ফ্রনিং ও ট্রেনিং

- ❖ গাছ খুঁটির মাচায় উঠার পূর্ব পর্যন্ত পার্শ্ব শাখা কেটে ফেলতে হবে।
- ❖ তিন বছর পর থেকে ফল সংগ্রহের পর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে মাচার উপরের অতিরিক্ত শাখা কেটে পাতলা করে দিতে হবে।
- ❖ একটি গাছ ৩ বছরে প্রায় ১৩০ টি পর্যন্ত শাখা প্রশাখা উৎপন্ন করতে পারে।
- ❖ বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সাধারণতঃ কাটিং এর চারা রোপণের ১২-১৮ মাস পর ফল আসে। পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দেয়ার জন্য ফল ধারণের পূর্ব পর্যন্ত গাছ প্রতি ৩-৪ টি শাখা রাখা যেতে পারে।
- ❖ ফল সংগ্রহের পর প্রধান শাখার প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারি শাখা রাখা যেতে পারে। প্রতি বছর ৩/৪ বছর বয়স্ক ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা কেটে দিতে হবে।



ড্রাগনফল গাছে ফ্রনিং ও ট্রেনিং

- ✿ ট্রেনিং ও থ্রেনিং করার পর রোগবালাই এর আক্রমণ রোধ করার জন্য কাটা স্থানে অবশ্যই উপযুক্ত ছত্রাকনাশক যেমন কুপ্রাভিট ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা বোর্দো পেস্ট (১০০ গ্রাম তুঁত, ১০০ গ্রাম চুন ও ১ লিটার পানি) ব্রাশ দিয়ে কাটা স্থানে লাগিয়ে দিতে হবে।

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

পরাগায়ন ও পরাগায়নের গুরুত্ব

পরাগায়ন পরিবেশগতভাবে বেঁচে থাকার একটি কার্যক্রম। পরাগায়ন ছাড়া সমস্ত সৃষ্টি জগতের বেঁচে থাকা কল্পনাযুক্ত। পরাগায়নের মাধ্যমে উদ্ভিদ তার পরবর্তী বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখে। ড্রাগনফলে পরাগায়নের ফলে ফলের আকার বড় হয়, আকৃতি সুন্দর হয় এবং গাছ প্রতি ফলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা যায়, ফলের আকার এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ প্রতিটি ফলে তার বীজের সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। প্রতিটি ফলে বীজের সংখ্যা তার সুষ্ঠু পরাগায়নের উপর নির্ভরশীল। আবার প্রাকৃতিক পরাগায়নের চেয়ে কৃত্রিম পরাগায়নে (হাত দ্বারা) সফলতার হার বেশি হয় এবং ফলের গুণগতমানও বৃদ্ধি পায়।



ফুলের পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর

পরাগায়নের পদ্ধতি

ড্রাগন ফলে দুই ধরনের পরাগায়ন সম্পন্ন হয়ে থাকে; ১. স্ব-পরাগায়ন ২. পর-পরাগায়ন। সাধারণত স্ব-পরাগায়নই বেশি হয়ে থাকে। পর-পরাগায়ন অনেকটা জাতের উপর নির্ভর করে। তবে পর-পরাগায়নের চেয়ে কৃত্রিম পরাগায়নে ফলের আকার বড় হয়ে থাকে।

কৃত্রিম পরাগায়ন

কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের ফুল থেকে ফল উৎপাদন প্রায় শতভাগ নিশ্চিত করা যায়। এটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

১ম ধাপ: প্রথমে একটি চিকন রঙতুলি জীবাণুমুক্ত করণের জন্য ইথাইল অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবাতে হবে। এরপর তুলিটি নরম কাপড়ে মৃদুভাবে মুছতে হবে যাতে কোন অতিরিক্ত অ্যালকোহল এটিতে লেগে না থাকে।

২য় ধাপ: তারপর তুলিটি ফুলের মাঝখানে অবস্থিত হলুদ পরাগধানীতে লাগাতে হবে। এরপর তুলিটি



পর পরাগায়নে ব্যবহার উপযোগী রঙতুলি

বৃত্তাকারে মৃদুভাবে পরাগধানীর চতুর্দিকে এমনভাবে ঘুরাতে হবে যাতে করে ঝাঁকুনিতে যথেষ্ট পরিমাণে পরাগরেণু আলগা হয়। অতপরঃ এই আলগা পরাগরেণুগুলো প্রাকৃতিকভাবে পরাগধানীর মধ্যস্থলে অবস্থিত গর্ভকেশরের উপর পড়ে এবং পরাগায়ন সংঘটিত হয়। এতদসত্ত্বেও, পরাগায়ন নিশ্চিত করার জন্য পরাগরেণুসহ তুলিটি মৃদুভাবে গর্ভকেশরে কয়েকবার ছোঁয়ানো যেতে পারে। একবার পরাগরেণু গর্ভকেশরে পৌঁছলেই পরাগায়ন নিশ্চিত হবে।

৩য় ধাপ: একটি ফুলে পরাগায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হলে তুলিটি সরিয়ে নিয়ে একইভাবে গাছের অন্য ফুলে পরাগায়ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। ড্রাগন ফল গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদনের জন্য একই কাজের পুনরাবৃত্তি অনবরতভাবে করে যেতে হবে।



তুলি দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন

পরাগায়নের সঠিক সময়: ড্রাগন ফল গাছের ফুল রাতে ফুটে এবং ভোর পর্যন্ত ফুটন্ত অবস্থায় থাকে। রাতের যেকোন সময় পরাগায়ন করা গেলেও রাত ১০ টা থেকে ১১ টার মধ্যে ফুল ফোটার সাথে সাথে হাত পরাগায়ন করা উত্তম।

সতর্কতা : ড্রাগন ফলের প্রতিটি গাছে পরাগায়ন কার্যক্রমের জন্য রঙতুলি টি প্রতিবার পরিশোধিত অ্যালকোহলের মধ্যে ডুবিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে। এভাবে পরাগায়নের ৩০-৪০ দিন পর ড্রাগন ফল খাবারের জন্য পরিপক্ব হয়।

অমৌসুমে ড্রাগন ফল উৎপাদন কৌশল

ড্রাগন ফল দীর্ঘ দিবসী উদ্ভিদ হওয়ার কারণে ফুল ও ফল উৎপাদনের জন্য দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টা বা তার বেশি হওয়া প্রয়োজন। যে কারণে, এপ্রিল মাসের শেষ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সাধারণত ড্রাগনফল গাছে ফুল ও ফল উৎপন্ন হয়। তবে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যখন দিনের দৈর্ঘ্য কম থাকে তখনও সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত থেকে বৈদ্যুতিক বাতির আলোর ব্যবস্থা করে কৃত্রিম উপায়ে দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ড্রাগনফল গাছে ফুল ও ফল উৎপাদন করা যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অনুযায়ী দেখা যায় যে, অক্টোবর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বিকাল ৪.০০ টা থেকে রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক ড্রাগন ফল গাছে বিভিন্ন তীব্রতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাতির



বৈদ্যুতিক বাতির আলোর সাহায্যে অমৌসুমে ড্রাগন ফল উৎপাদন

আলোর প্রয়োগ করা হলে, আলো প্রয়োগের ১২ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে গাছে অমৌসুমী ফুলের কুঁড়ি দেখা যায়, যা হতে ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফুল ফোটে এবং তার ২২-৩০ দিনের মধ্যে ফল আহরণ করা যায়। বৈদ্যুতিক বাতি হিসেবে ১০০ ওয়াট সাধারণ বাল্ব, ৩৫ ওয়াট সিএফএল (এনার্জি সেভিং) বাল্ব ও ২০ ওয়াট এলইডি বাল্ব কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি খুঁটিতে স্থাপিত ড্রাগন ফল গাছের চার কোনায় চারটি বৈদ্যুতিক বাল্ব মাটি হতে ১৩৫ সে. মি. থেকে ১৫০ সে. মি. উচ্চতায় এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সমগ্র গাছ চারদিক থেকে আলো পায়।

ড্রাগনফলের প্রধান রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

কান্ড ও ফল পচা রোগ: এই রোগে প্রথমে ক্ষত স্থানের পাশের অংশ হলুদ হয় এবং ধীরে ধীরে কান্ডের মধ্যে শক্ত অংশ বাদে সবটুকু পচে যায়।



কান্ড ও ফল পচা রোগ

প্রতিকার: আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলতে হবে এবং কর্তিত অংশে বোরদোপেস্ট (১০০ গ্রাম তুঁত + ১০০ গ্রাম চুন + ১ লিটার পানি) এর প্রলেপ দিতে হবে। আক্রান্ত গাছে ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এ্যানথ্রাকনোজ: সাধারণত ভেজা আবহাওয়ায় এই রোগ সংক্রমণের হার বেশি। লাল বাদামী গোলাকার রিং এর মত করে কান্ড পচতে শুরু করে। এই রোগ ফলেও সংক্রমিত হয়।

প্রতিকার: আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলে দিয়ে ম্যানকোজেব গ্রুপের যে কোন ছত্রাকনাশক যেমন ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ও অন্যান্য

ড্রাগন ফলে সাধারণতঃ ছোট ও বড় পিঁপড়া, জাব পোকা, শামুক ও বিটল পোকা ফুলের কুঁড়িতে আক্রমণের ক্ষেত্রে সেভিন ৮৫এসপি প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। অনেক সময় ফল পাকা অবস্থায় পাখিদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে বাগানের উপড়ে বাঁশের খুঁটির সাহায্যে নাইলন নেট ব্যবহার করে আক্রমণ রোধ করা যায়।



পাখি আক্রান্ত ড্রাগনফল

ড্রাগনফল সংগ্রহের পরিপক্বতা নির্দেশিকা

ড্রাগনফল নন-ক্লাইমেকটরিক জাতীয় ফল, তাই সংগ্রহ করার পর পরই এর পরিপক্ব হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য গুণগত মান ও সংবেদনশীল স্বাদ বজায় রাখতে ড্রাগনফল পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপক্ব হওয়ার পরই সংগ্রহ করা উচিত। কারণ আগাম সংগ্রহ করলে ফলের গুণগতমান অসম্পূর্ণ থাকে এবং মোট ফলনও কমে যায়। আবার অন্যদিকে দেরীতে সংগ্রহ করলে ফল ফেটে যেতে পারে, টিএসএস কমে যায়, ভক্ষণযোগ্য অংশের গুণগতমান নষ্ট

হয়ে যায় এবং ফল পাঁচে যেতে পারে। সুতরাং সংগ্রহোত্তর সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য ড্রাগনফলের পরিপক্বতা সম্পর্কিত সঠিক জ্ঞান রাখা অত্যন্ত জরুরী।

ড্রাগনফলের পরিপক্বতা নির্দেশক সম্পর্কিত ধারণাসমূহঃ

১. সাধারণত ফুল ফোটার ২৫-৩০ দিন পর ফলের গায়ের রঙ পরিবর্তন হওয়া শুরু করে
২. ফলের খোসার রঙ পরিবর্তনের ৩-৫ দিন আগেই ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশের রঙ পরিবর্তন হয়।
৩. অতপরঃ ৪-৫ দিনের মধ্যেই ফল সর্বোচ্চ রঙ ধারণ করে।
৪. ড্রাগনফলের পরিপক্বতা মূলত নির্ভর করে ফুল আসার পরবর্তী নির্দিষ্ট সময় এবং খোসার লাল রঙের তীব্রতার উপড়।
৫. ফলের পরিপক্বতার সাথে বিভিন্ন গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ভর করে, যেমন; ভক্ষণযোগ্য অংশ নরম হয়ে যাওয়া, টিএসএস বেড়ে যাওয়া, টাইট্রোটেল এসিডিটি কমে যাওয়া, ষ্টার্চ হাইড্রোলাইসিস এবং ফলের খোসা ও ভক্ষণযোগ্য অংশে লাল রঙের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি।
৬. স্থানীয় বাজারে বিক্রির ক্ষেত্রে সাধারণত ফুল আসার ৩৫-৩৮ দিন পর ফল সংগ্রহের জন্য পরিপক্ব হয়।
৭. দূরবর্তী বাজারে বিক্রির জন্য সাধারণত ফুল আসার ৩২-৩৪ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণ

ড্রাগনফল অবশ্যই উপরের নির্দেশনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিপক্ব অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহ পরবর্তী গ্রোডিং এর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কোন নির্দেশনা না থাকলেও, ড্রাগনফলের ক্ষেত্রে মূলত সাইজ এবং রঙের উপর নির্ভর করে গ্রোডিং করা হয়। সাইজের ক্ষেত্রে সাধারণত ড্রাগনফল কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়; অতিরিক্ত বড় (৫০০ গ্রাম এর বেশী), বড় (৩৮০-৫০০ গ্রাম), স্বাভাবিক (৩০০-৩৮০ গ্রাম), মাঝারি (২৬০-৩০০ গ্রাম) এবং ছোট (২৬০ গ্রামের নীচে)। ড্রাগনফল সংগ্রহের পর প্রতিটি ফল টিস্যু পেপার, সাদা কাগজ অথবা স্টাইরোফোম দ্বারা ভালোভাবে মুড়িয়ে সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং করে বাজারজাতকরণের জন্য পরিবহন করলে ফলের গুণগতমান ভালো থাকে। ফল সংগ্রহের পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৮-১০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ড্রাগনফলের আদর্শ সংরক্ষণ তাপমাত্রা হলো ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, এই অবস্থায় সর্বোচ্চ ১৪-১৫ দিন পর্যন্ত ড্রাগনফল সংরক্ষণ করা যায়। ড্রাগনফলের পাল্ল ডিপ ফ্রিজে বছরব্যাপী সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উক্ত পাল্ল দ্বারা শরবত, জ্যাম, জেলী ও জুস তৈরি করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

ড্রাগন ফল একটি নন-ক্লাইম্যাটেরিক ফল। সুতরাং ফলটি সঠিক পরিপক্বতায় সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণতঃ জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ৬-৭ টি ধাপে ফল সংগ্রহ করা হয়। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী বারি ড্রাগনফল-১ জাতের গাছ প্রতি ফলন ৩-৬ কেজি এবং প্রতি হেক্টরে ১৫-২০ টন। গাছের বয়স বৃদ্ধিও সাথে সাথে ফলনও বৃদ্ধি পায়।

চারা উৎপাদন

ফসল উৎপাদন

বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা

কৃষির মৌসুম ৩টি

০ রবি মৌসুম, ১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ বা কার্তিক-ফাল্গুন

০ খরফ-১ মৌসুম, ১৬ মার্চ-১৫ জুলাই বা চৈত্র-আষাঢ়

০ খরফ-২ মৌসুম, ১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবর বা শ্রাবণ-আশ্বিন

শস্য	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভেম্ব.	ডিসে.
আলু												
মিষ্টিআলু												
পানিকচু												
মুখিকচু												
মসুর												
ছোলা												
খেসারি												
মুগ (রবি)												
মুগ (খরফ)												
মাসকলাই												
মটর												
সয়াবিন (রবি)												
সয়াবিন (খরফ)												
সরিষা												
চীনাবাদাম (রবি)												
চীনাবাদাম (খরফ)												
তিল (রবি)												
তিল (খরফ)												
তিসি												
সূর্যমুখী (রবি)												
সূর্যমুখী (খরফ)												
আদা												
হলুদ												
পেঁয়াজ (রবি)												
পেঁয়াজ (খরফ)												
রসুন												
ধনিয়া												
মরিচ												
কালিজিরা												
ডাঁটা												
লালশাক												
পুঁইশাক												
পালংশাক												

রবি

খরফ - ১

খরফ - ২

রবি



Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com
www.bari.gov.bd



January/2026